রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনালোকে

স্বামী নির্লেপানন্দ

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ (ক)
আশ্বিন ১৩৬৩
প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২
মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ও
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬
প্রচ্ছদশিল্পী
চারু খান

রামকৃষ্ণের নবীন ঝাণ্ডাধারীকে প্রাচীনদের আশীষ

১৯২৪-২৭

সন্ন্যাসলাভ হইয়াছে জানিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তাঁর কৃপায় ভক্তিবিশ্বাস জ্ঞান নির্ভরতা প্রেম পবিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে—শিবানন্দ। "নমো নারায়ণায়" পরম স্নেহাস্পদেষু, আজই তোমার শুভসংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত। তোমার যোগপট্ট, নাম, তোমাকে কে পছন্দ করিয়া দিল? নির্লিপ্তানন্দ হইলে কিরূপ হইত? তোমার মনোরথ সফল হইল, এখন অভীষ্ট লাভ হোক; তোমাদেরই শ্রীঅখণ্ডানন্দ। My Dear, I am very glad you were initiated into the Supreme Blessed life of Pure Renunciation and Revivification and of the Highest Blessedness. May carry you on and on, to your and Universal Self-Realisation Joy and Peace. Hold fast to Thakur and Svamiji. My hearty Onward Ho! With good wishes and *asises*. Yours cordially Svami Bijnanananda. বিশেষ সুখী। ঠাকুর তোমার সার্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন ও তুমি আত্মনো মোক্ষায় এবং বহুজন হিতায় রত থাকিয়া নিজ জীবনকে ধন্য কর, ইহাই প্রার্থনা। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ শুভানুধ্যায়ী নির্মলানন্দ। এই লেড়া মাথা কাছাখোলা টিকিওয়ালাকে চিন্তে পারছো না, তুলসীরাম? আমাদের অমুক। ভাল লেখাপড়া শিখেছে। আবার সাধু হয়েছে। ১৯২৪···আমায় আর পেন্নাম কিসের? এখন তুমিও যা, আমিও তাই। শ্রীসারদানন্দ ১৯২৭···পেরকাশ যা বলেছে, আমিও তাই বলি, বাবা। ঠাকুর শেষদিন পর্যন্ত তোমার হাত ধ'রে থাকুন—যোগীনমা। খুব ভক্তি হোক, খুব ভক্তি হোক, খুব ভক্তি হোক—গোলাপ মা ১৯২৪।

দ্বিতীয় দফা

ছত্রিশ বৎসর পর গ্রন্থের দ্বিতীয় কলেবর। প্রথমটি আমাদের স্কুল সহপাঠী বদান্য বিজয়গোপাল গাংগুলি মহোদয় সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে ছাপাইয়া দেন। প্রায় গোটা বইটি ধারাবাহিক প্রথম 'বিশ্ববাণী' পত্রে বাহির হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দপন্থীর গ্রন্থটি একটি গাইড বুক, ম্যানুয়েল, লগবুক। পথের মাপ-জোপ খানাখন্দলের হদিশযুক্ত। লাতিন, ভাদিমেকম, পথের সাথী। দিক নির্ণয়ে কম্পাস কাঁটার কাজ করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আলো পাঁচ প্রকার। দীপ আলোক, অন্যান্য অগ্নির আলো, চান্দ্র আলো, সৌর আলো, চান্দ্র সৌর একাধারে। অবতারাদিতে ভক্তি-চন্দ্র জ্ঞান-সূর্য একাধারে।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আলো, মণির আলো। গা পোড়ে না। এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়। এই আলোতে আমাদের জন্ম জন্ম সঞ্চিত অজ্ঞান অন্ধকার অন্তরের গ্লানি ক্লেদরাশি দূরীভূত হোক্। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে ভক্তিপ্রেমে উভয়েই ভরপূর। তাঁদের নামে দুর্গা বলিয়া যাঁহারা জীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন, দিতেছেন এবং ভাবীকালে দিতে থাকিবেন তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য, সকলের শুভাশীষ প্রার্থনীয়। সাতচল্লিশ বৎসর এই পথের পথচারীর অভিজ্ঞতা এই কেতাবে বিধৃত।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যেন নবগঙ্গার মুক্তিপ্রবাহ। হলিউড হতে কিয়োটো, প্যারি হতে মরিসস্ দুনিয়াময় প্রবহমান। যে যে ঘাটে পারো ডুব দাও, ধন্য হও, পবিত্র হও, শীতল হও। আবার তাঁরা যেন বড় আগুন। এই আগুনের ফিনকিমাত্রও তাঁদের পৃথিবীজোড়া আশ্রিতবর্গের জীবনে জ্বলিয়া উঠুক। সত্যের হোমাগ্নি দিকে দিকে দেখা দিক। তবেই তাঁদের আসা এবং আশা, তাঁদের নাম নেওয়া সার্থক হবে।

ননীদত্ত তাঁর বইটি আমাদের দাতব্য করাতে বর্তমান ছাপাইকাজ সম্ভব হইল। দত্তের নিকট ঋণী। এই সংস্করণে স্বামীজীর স্মৃতি কথাগুলি বাদ দেওয়া হয় নাই, স্মৃতিসঞ্চয়নের পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন। দুই গ্রন্থের বিষয়বস্তু এক। কিছুটা পুনরাবৃত্তি হইবেই।

প্রণত

নির্লেপানন্দ

অখণ্ডানন্দ দিবস ১১।১০।৬৯

শ্রীরামকৃষ্ণ হবনম্ সংসদ্

৭৫ গোরক্ষবাসী রোড

কলিকাতা-২৮

যোগীনমাকে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও তাঁহার চিহ্নিত সন্ন্যাসি-গোষ্ঠীর সহিত আমাদের আত্মিক সম্বন্ধ-স্থাপনরূপ মহান আদর্শের তুমিই প্রেরণাদায়িনী। হে রামকৃষ্ণ-সারদাগত-প্রাণে, মহীয়সী নারী! তুমি ছিলে যোগসংসিদ্ধা, মহাতাপসী। জ্ঞানভক্তিময়ী, মহাবিদুষী—একাধারে ধ্যাননিমগ্না, কর্মনিপুণা।

তোমার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেন নিত্যকালের জন্য বর্তমান রহে। উহা আত্মোপলব্ধির পথে আমাদের সহায়কারী হইয়া যেন প্রতিটি মুহূর্তে মানবজীবন সার্থক করে।

প্রভুর দরবার-প্রবেশের তুমিই আমাদের অপরূপ দ্বার। তোমাকে সেইজন্যই—বার বার—নমস্কার। ঔপনিষদ ভাষায়—

ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম

প্রণত

২৫. ১২. ১৯৩৪ গ্রন্থকার

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনালোকে

চলার পথে

নমামি নাথং গুরুদেবদেবং
প্রিয়ং চিদানন্দ-মহাবতারং।
নিত্যং হি বিজ্ঞানমনন্তরূপং
পরাৎপরং শিবব্রহ্মস্বরূপং॥

প্রবাহে চলেছি। পথে পথে। আঁকে বাঁকে। ফিরে ঘুরে। ঘুরে ফিরে। রেহাই কারুর নেই। ক্ষিতি অপ্ তেজের—"থোড় বড়ি খাড়া"—"খাড়া বড়ি থোড়" দিয়েই যা কিছু বিষয়, ভোগ্যদ্রব্য চোখে দেখছি, নিজের ব'লে কোলে টেনে নিচ্ছি, হেয়-পরিত্যাজ্য ব'লে সরিয়ে ফেলে দিচ্ছি,—এ ভবরাজ্যের সবই ঐ উপাদানে সংগঠিত। কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত। একই ঘটনা, একই জিনিসকে দু'জনে দু'চোখে দেখছে, বুঝছে। আবার অনন্ত বাদ বিবাদ বিসম্বাদ তাই নিয়ে।

কবি বায়রনের বাল্য পঠদ্দশার সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়। স্কুলে ইন্‌সপেক্টার সাহেব এসে আদেশ করলেন, বর্ষার নদী সম্বন্ধে তোমরা সবাই কিছু কিছু লেখো। কিশোর স্ফুটনোন্মুখ কবি লিখলেন, "বর্ষার নদী সব লাল হ'য়ে ওঠে কেন জানো কি? নববধূ যেমন স্বামীর কাছে যেতে প্রথম সরম পান, তটিনী-বধূরও প্রাণেশ্বর প্রিয়তম মহাসমুদ্রের সাথে মিলতে গিয়ে তদবস্থা। —লাজে লাল!"

—আবার ঐ একই ঘটনাটি বিজ্ঞানীর চোখে আলাদা ব্যাখ্যা এনে দেবে। প্রেমিকের দৃষ্টি স্বতন্ত্র।

* * *

পটুয়া পট আঁকেন। ছবির লেখক ছবি লেখেন। কথার তুলি দিয়ে কবি কাব্য রচেন। সুরের রেশে রেশে স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে গায়ক গাহিতে গাহিতে মেতে ওঠেন্। বাজাতে বাজাতে বাদক আত্মহারা হন। আবার তর্কবিদ্যা, আন্বীক্ষিকীতে পটু যিনি, তাঁর কথাই হচ্ছে, খালি কেন? কেন? কেন? চিরন্তন এই প্রশ্নই তুলে যাওয়া। তাতেই তিনি রপ্ত।

ভাবুক বড় ব্যাজার—বিশেষ উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে বলছেন,—"আরে ভাই, কেন-মেন অতশত জানি না। বুঝি না। প্রেরণা আসছে। মূর্তি দিয়ে যাচ্ছি। সর্বরূপের যিনি আগার,—সেই রূপেশ বোঝেন। তিনিই রূপেশ্বর। তিনিই বিশ্ব-ঈশ্বর। এরি ভেতর তত্ত্ব কিছু ফুটছে কিনা, জানি না। আমার এত বুদ্ধি নেই। সৃষ্টিতেই আমার সব আনন্দ।"

কথা-দিয়ে যে রচনা রচা যায়, তাহার সম্বন্ধেও আমাদের এখানে ঐ শিল্পীর দৃষ্টি। শিল্পীর ভাব। ভেতরে এলে,—দিয়ে যেতেই হয়। যদি বল, সিদ্ধান্ত কি? তবে বলি,—যদি সিদ্ধান্ত একান্তই একটা খাড়া করতে হয়, তবে বলব,—মায়ারহিত, ভ্রমভ্রষ্ট, অদ্বয়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দৈকরস, অব্যয় একত্বেই সিদ্ধান্ত। আরও গভীর—বাক্য মন যেথায় গ'লে যায়। আর তা তো শেষ পর্যন্ত অতর্ক্য। অপ্রমেয়। মানবের ছটাকী বুদ্ধির চেন্ দিয়ে যা মাপা যায় না। ঝুটোপুটির বাহিরে। আর যা কিছু দ্বৈত প্রতিভাষ তাহারই ভেতর মতদ্বৈধ বেশী রকম। দ্বৈতরাজ্যে এমন কোন জিনিষ নেই, যেটা নিছক মন্দ। সেই জন্যই অনেক প্রসঙ্গে, বর্তমান গ্রন্থের ভেতর, আমরা বিভিন্ন দৃষ্টি বিভিন্ন বার্তা, বিভিন্ন বক্তব্য—যথাসম্ভব সূত্রিত করিয়াছি। সিদ্ধান্ত পাঠক-পাঠিকার। আরও কথা, সব জিনিষের 'ইতি' করতে পরম-গুরুর মানা আছে। দেখাও যায়, যে লেখা, যে মত, আজ লিখি বা বলি, কালকের নব আলোকে, তা' আবার বদ্‌লাতে হয়। সময় সময় মুছে ফেলতে হয়। আজ যে কর্মপদ্ধতি পাকা ব'লে বোধ হ'চ্ছে, কাল তাই-ই উল্‌টে গেল। নিজেরই অমনোনীত হ'ল।

হরেক রকমের সমস্যা। রামের পক্ষে যা সিদ্ধান্ত, শ্যামের পক্ষে তা' নয়। আবার বহুর ক্ষতি হবে ব'লে, একের পক্ষে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা সব সময় লেখা যায় না। লিখিলে অনর্থই ঘটিয়া থাকে, গুরুমুখে শুনিয়া লইতে হয়।

স্বরের ভেতর, শব্দরাজ্যে দাঁড়িয়েই 'অস্বরম্ অশব্দম্'-কে ধর্‌বার ছোঁবার চেষ্টা করতে হবে। খণ্ডের ভেতর জন্মেই অখণ্ডের জন্য হাতড়াতে হবে। প্রতি সৃষ্টির ভেতরেই বিরাটের, পূর্ণের, ভূমার ছায়া দিতে হবে। তাঁকে বা সেই অবস্থাকে যথাসাধ্য চিত্রিত, প্রতিফলিত, প্রতি-কল্পিত করবার দিকে লক্ষ্য থাকবে। তবেই শিল্পীর কাজ হবে। গণ্ডীতে চিরকাল বদ্ধ থাকলে, গণ্ডগোল হবে। Art must fumble for the Whole, once fixing on a part,

—however poor, must surpass the fragment and aspire to re-construct thereby the Ultimate Entire.

রে শিল্পী, অংশে রাখি বদ্ধ মন
চিত তাহে সমর্পণ!
মহাপূর্ণ হেতু—তোমা—
সন্ধানিতে হবে অনুখণ ॥

হউক ক্ষুদ্র,
হউক দরিদ্র,
হে কবি, খণ্ডেরে ধরি তুমি
দাও মোরে অখণ্ডের ছবি ॥

পাশ্চাত্যের নবযুগের কল্পনাদেবীর বরপুত্র, ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত গোষ্ঠীভূত, কবি রবার্ট ব্রাউনিংএর বাণী আমাদের সকলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, পৃথিবীর সর্বমানব-মানবীর জীবনের প্রতি কর্মে, ধ্যানে, ভক্তিতে, তপস্যায় সত্য হউক, সার্থক হউক, সফল হউক। রে আমার মন, অনন্ত সঙ্কল্প-বিকল্পের পুঁটুলি তুমি! অপূর্ণতা, অক্ষমতার মাঝেই সমাসীন হ'য়ে, তুমি অখণ্ডকে ধরবার ছোঁবার চেষ্টা করো। সীমাকে—ক্ষুদ্র, ছোট, অল্পকে শেষে অতিক্রম করতেই হবে। ছাড়ান নেই। পূর্ণতার মাঝে, পূর্ণছবির ভেতর নিজেকে ডুবাইতে হবে। ভুলাইতে হবে। ব্যর্থতায় বার বার পথ হারাইয়াই বা গেলে। "বাজি জিত" না-ই বা হইল!

*   *   *

মহাসমুদ্রের মত সীমাহীন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দজীবনই আমাদের সম্বল। অবলম্বন। আশ্রয়। নিক্তি। কষ্টিপাথর,—যাহা কিছু সবই। তাঁহাদের ভাব-সহায় করিয়াই আমরা যথাসাধ্য জীবনপথে চলিবার চেষ্টা করিতেছি হয়ত ভুল করেছি, করছি, করিব অনেক। কিন্তু, ভুল যা' কিছু তা আমাদেরই সংস্কার। কর্মের দোষ। আর যা' কিছু পূর্ণতা,—তা' তাঁরাই। বাংলায়—ভারতে, জগতে নব নব জাতি সংগঠনে তাঁদের আদর্শকে সামনে ধরিয়াই সমষ্টিগতভাবে আমাদের পথে আগুয়ান হইতে হইবে।

কোন মনুষ্য-রচনাই অভ্রান্ত, অপূর্ণতাবিহীন, অকাট্য হইতে পারে না। রচনা মানেই চেষ্টা। সুতরাং, তা'তে প্রমাদের এক মস্ত স্থান আছে।

সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন—সকলই তাহাতে চলিতে পারে। ইহা অকাট্য অপৌরুষেয় নির্ভুল বেদ নহে। মনুষ্যরচিত লৌকিক কথা। আপাততঃ অন্তরে যতদূর প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই আলোকে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কথা কহিব। আপনারা অনুমতি করুন। অবহিত হউন, শ্রদ্ধান্বিত হউন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেউলে দেওয়ালি-মহোৎসবের দামামা বেজেছে। কেউ বা 'ডে-লাইট' নিয়ে এসেছেন। কারুর হাতে বিজলী। কারুর মোমের বাতি, কারুর হাতে মৃণ্ময় প্রদীপ। বিজ্ঞ বলছেন, "ওহে জোনাকী! তুমি আর আলোর কি গরব করছো?" কিন্তু, জোনাকী তা' শোনে না। অল্প আলো নিয়েই সে চলেছে। গুটি গুটি যাবে। বলে "একবার চেয়ে চেয়ে দেখি। বাদ থাকবো না। ফাঁকে পড়বো না। দেবতা ত অন্তর বোঝেন, হ'লই বা মিটিমিটি আলো!" তর্কে কাজ নেই। যেটুকু আলো ভেতরে তিনি দিয়েছেন, তাই দরবারে তুমি নিয়ে চলো। এক পা এগোও। জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি, তিনি করুণা ক'রে আপনি একশো পা এগিয়ে এসে, সব অল্পতা নষ্ট ক'রে, লাখো গুণ তোমার পুঁজি বাড়িয়ে দেবেন। ইহা বিচিত্র অনির্বচনীয় সৃষ্টির লীলা-বিলসন। সাধের নরেন্দ্র রামকৃষ্ণ-পূজো সম্বন্ধে পত্রে লিখেছেন,—"যে তাঁর পূজো করবে, মুহূর্ত মধ্যে মহান্ হবে।"

পূজা পূর্ণাঙ্গ করতে হলে, কোটি উপচার, বহু বলি আবশ্যক। কাকে দিয়ে কি কাজ হবে, জানি না। উপচারের ছোট বড় আছে। তা' থাকলোই বা। সু-নিয়ামক তিনি। তাঁর রাজত্বে ছোটরও একটা স্থান, একটা নির্দিষ্ট সার্থকতা আছে। তুমি তোমার গীত গেয়ে যাও। সমঝদার, উদার, উৎসাহদাতা, বিচারক দোষ শুধরে নেবেন। খালি মনে মনে প্রার্থনা করো, "ওগো দেবতা! আমায় তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ ক'রে রেখো।" আবার দেউড়ীতেও প্রদীপের সার্থকতা আছে, ইহাও সত্য। মঠের দেউলেও আলো দরকার। গৃহপতির দরকার। যতির দরকার।

নবজাগ্রত রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ডস্টয়েভস্কি বলেছেন,—"বিশ্বজনীন মানবাত্মার ভাবের গোলা-ঘর আছে। আমাকে তোমাকে সেই ঘরে আমাদের সংগ্রহ, সঙ্কলন, সঞ্চয়ন, সম্প্রদান করতে হবে। রাশি বাড়াতে হবে। সভ্যতার সংগঠনে আমাদের কি বক্তব্য আছে, বলতে হবে নির্ভীকভাবে। তবেই, নিঝুম মানবাত্মার নব-উদ্বোধন, পুনরুত্থান সম্ভব হবে।" ডস্টয়েভস্কির বাণী এখনো জীবন্ত। "Adding my bundle to the granary of the

human Spirit ····Saying my word in civilization. ···Full personal freedom for the re-surrection of souls" ব্যক্তিগত পূর্ণ-স্বাতন্ত্র্যের কথাও এখানে আছে।

*　　　　　*　　　　　*

গণপতি-নামধারী বারোবছরের এক চমৎকার দাদা ছিল। ভায়া কাশীশ্বরের আস্তানায় যাবার আগে, জলখাবার পার্বণী ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া যাহা পুঁজি করিয়াছিলেন তাহা পাড়ার মা-কালীর ভোগে নিবেদন করিয়া যাত্রা করেন। সেই বিশ্বেশ্বরেরই সান্নিধ্যে—স্বপনের কাশীমুখে সংসারের পথে পথে সবাইকেই আমাদের যেতে হচ্ছে। "একই ঠাঁই, চলেছি ভাই, ভিন্ন পথে যদি।" পুঁজি যা পথে জমেছে, সেটা পরমাত্মার দেবতাপ্রতীকপূজায় লাগাইয়া দিবার সৌভাগ্য মিলিলে, দেবযাত্রী আমাদের পক্ষে মন্দ কি? এ ভাগ্য কার ঘটে?

রিক্তহস্তে, পারের লৌকিক সম্বল-বিহনেই—কিন্তু মস্ত পাথেয়, শ্রীগুরুর অলৌকিক আশীর্বাদ রতন মস্তকে ধারণ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে কর্মজ বেদনার ভারে হিয়া ভরাইয়া লইয়া, হে পথিক! তুমি এগিয়ে চলো, তোমার প্রাণাধীশের সান্নিধ্যে,—থেমো না। নবযুগের নবাচার্য বিবেকানন্দ মহারাজের বাণীতে দশদিক মুখরিত হইয়াছে,—সর্বত্রই আশা, আশা, পরম আশা, মহতী আশা। সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তির আশীর্বাদসিক্ত, শ্যামার প্রিয়দর্শন, সুন্দর, সেই পরমবালক ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাকাও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পৈশাচিক নিষ্ঠুর লীলায় রক্তাক্তকলেবর হে পাশ্চাত্য! শ্রীরামকৃষ্ণের উপর লক্ষ্য ফিরাও। দেখিবে ইনি দেশকাল ব্যবধান-বিহীন, অখিল অধ্যাত্মজগতের দুর্লভ মহীয়ান অধীশ্বর। অধ্যাত্মমহিমায় মহিমান্বিত। ভাস্বরোজ্জ্বল। অধ্যাত্ম-শক্তিতে শক্তিমান্। অধ্যাত্ম মাধুর্যে চৈতন্যময়। অধ্যাত্ম প্রাচুর্যে মধুময়। সবমতের সবপথের সত্য উপলব্ধির, রত্নাকরবিশেষ। অনাদি অনন্ত সাগর-সদৃশ। মানব-ঐতিহ্যে এরূপটি এই প্রথম। বিস্ময়কর—অতি অপূর্ব অলৌকিক অদৃষ্ট-পূর্ব দৃষ্টান্ত। অধ্যাত্ম মত হাতে নাতে সাধিয়া দেখাইবার জন্য—বাংলার নির্জন নিরালা পল্লীর নিভৃত প্রান্তরে, মাটি ও খড়ের একটি ছোট কুটিরের ঢেঁকিশালে—অপূর্ব সাধকের বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অপূর্ব অদ্ভুত উদ্ভব। বাহিরের বিদ্যায় একপ্রকার বিবর্জিত। সংযম-শ্রেষ্ঠ বিদ্যার খনি। তাই ধারণশক্তির অসাধারণ। অন্তরের আন্তরিকতা, আগ্রহ অপূর্ব। সাধনা-নিষ্ঠা অপূর্ব।

একাগ্রতা অপূর্ব। আর তন্ময়তাও অপূর্ব। তাই সবদিকে, সবপথে সিদ্ধিও মিলিল অপূর্ব। এখন অশরীরী। তথাপি প্রতিদিনেই প্রায় নব নব মানবের মনোঘটে, মনোমন্দিরে, হৃদয়-দেউলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পূজা সুসম্পন্ন হইতেছে। কে বুকঠুকিয়া বলিবে, শ্রীরামকৃষ্ণ মরিয়াছেন,—ইহলোকে নাই? তিনি অজর, তিনি অমর। তিনি শাশ্বত। তিনি সত্য। তিনি সনাতন। তিনি নিত্য।

বৈদিক যুগ হইতে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধাদি—মতের উদারতা আজ পর্যন্ত অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। নিঃসন্দেহ। সাধিয়া তাঁহারা দেখাইতে পারিতেন না, তাহা বলি না। হয়ত যুগ-প্রয়োজন ছিল না। এবার প্রয়োজন অধিক। তাই, একই অবতার-আত্মার প্রকাশও অধিক। প্রাচ্যগগনে নবারুণের রাগচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া, রবিকবি যুগভাবের সুন্দর ভাষা দিচ্ছেন—

"তোরা শুনিস্‌নে কি শুনিস্ নে তার পায়ের ধ্বনি—
সে যে আসে, আসে, আসে।

* * *

সে যে আসে, আসে, আসে।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐশী প্রেম—দৈবী সম্বন্ধ

প্রেমের অত্যদ্ভুত অভিনয়। তাঁহারই বালক। সন্তান। আবার তাঁহারই সখা। সংসার বিরাগী ভগবদনুরাগী শ্রীপরমহংস। নরেন্দ্রপ্রেমে বিশেষ বিহ্বল। আত্মহারা, আপনভোলা। কখনও কখনও উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিতেছেন। সচকিত, সদাই চঞ্চল। পাছে সে ধনে, "কানুধনে" হারাই হারাই। "হৃদয়রঞ্জনে না হেরে নয়নে, কেমনে পরাণ' বাঁধি—আমি সাধে কাঁদি।" বিচ্ছেদ অসহনীয়, বিচ্যুতি মর্মন্তুদ। প্রিয়তম প্রাণাধিকের সহিত বাঁধন অটুট, অচ্ছেদ্য। "অচলঃ ধ্রুবঃ"

›—এই যে ব্যাকুলতা—এটা অকারণ? কিম্বা সকারণ?—আবার তাহা হইলে কেমন সে কারণ?

*　　　*　　　*

"ওরে, তুই আয় রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না—ব'লে ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। ক্রমান্বয়ে ছমাস এমন হোয়েছিল। নরেন্দরের জন্য যেমন মন কেমন করেছিল, তার তুলনায়, অপরের জন্য কিছুই করেনি বল্লেও চলে।"

"এ-তো—দিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্যে কেমন কোরে কত দিন ধ'রে অপেক্ষা করছি, তাও কি একবার ভাবতে নেই?"

"নরেন্দর শুদ্ধ সত্ত্বগুণী। দেখেছি, সে অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন। আবার সাতঋষির শ্রেষ্ঠ ঋষি। ব্রহ্মে বিলীন। সদা সমাধিস্থ। একটি ছোট ছেলে কচি কচি হাত দুখানি তার গলায় জড়িয়ে ধরে' সোহাগের সঙ্গে বল্লে—আমি যাচ্ছি! তোমাকেও যেতে হবে। ঋষি নীরব। মৃদু মৃদু হাসলে। —নরেন্দরকে দেখেই বুঝেছিলুম, এ সেই। একমাত্র ও-ই জ্ঞানের অধিকারী। জ্ঞানসূর্য্য। ইদানীংএর নেতারা সব এর তুলনায় দীপশিখা।"

"জানি আমি প্রভো, তুমি সেই পুরাতন ঋষি। নররূপী নারায়ণ। জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ।" নরেন্দ্র-স্তবরত কর-কৃতাঞ্জলি ভক্তিবিহ্বল পরমহংস। লীলামূর্তিধারণে স্বীকার করাইবার জন্য ঐ দেববালক-বিগ্রহবেশে তিনিই কোমল করাঘাত করিতেছেন। "মানুষের কি সাধ্য যে টলাবে সেই স্বয়ম্ভূর আসন? দেবতার তপস্যাতে আসিল অবনীতে পতিত পাবন।" "উঠ বীর! আঁখি মেলি, ছাড়ো, ছাড়ো ধ্যান। চলো-চলি। ধরণী ডুবাল বুঝি অবিদ্যা কাম-কাঞ্চন।"

*　　　*　　　*

"আমার নরেন্দরের ভেতর এতটুকু মেকি নেই। বাজিয়ে দ্যাখো—টং টং করছে। ঈশ্বরকোটীদের ভেতরও এর মত কেউ নয়। কারুর দশ দল। কিম্বা কারুর বিশ। নরেন্দর সহস্রদল।"

"দ্যাখো নরেন্দরের জন্য প্রাণের ভেতরটা যেন গামছা নিংড়োবার মত জোরে মোচড় দিচ্ছে। এতো কাঁদলুম, কিন্তু সে ত এলো না। একবার দেখবার জন্যে প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে। 'মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাকৃতে পারি না'—বলিয়া বিষম কাঁদুনি!"

—এমনিধারা আর একটি প্রেমের হাট, সোনার বাংলার পুণ্যবাটে আর একদিন বসেছিল। নবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীচৈতন্যের রক্তোৎপল আঁখি হইতে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জন্য অবিরাম আপাত অকারণ উছল-উছল নয়ন জলধারা বহিয়াছিল। ইহার কাছে বাপমায়ের ভালবাসাও খাটো হইয়া যায়। কারণ তাহাও উচ্চ-ইতর উভয় শ্রেণী প্রাণীমাত্রের সাধারণ জীবধর্ম। স্নায়ু-রক্ত-মেদ-মজ্জায় আমেজ মাখানো। বিশেষত্ব-বিহীন। কিন্তু যে টানের কথা আমরা পাড়িয়াছি তাহার নিকট সংসারের সব টান তুচ্ছ। সতীর পতির উপর টান, প্রসূতির সন্তানের উপর টান এবং অসতীর অসতের দেহাভিমুখীন টান—এই তিন টানই তুচ্ছ। ক্ষুদ্র। অল্প। সাধারণ দৃষ্টিতে এই টান নূতন, সম্পূর্ণ অহৈতুকী। দৈবী সম্পদ। আবার, একদিক দিয়া পরম হৈতুক টান। কারণ সেটা বৃহৎ—মহৎ—ভূমা লইয়া ব্যাপার। থতাইলে, এই কারবারের লাভকারী—অতুল অলৌকিক ঐশ্বর্যের অধিকারী। এই টান যাহার হয় সেই-ই জানে। মনে মনে—মন জানে। অন্য জনে কি জানিবে?

*　　　*　　　*

"নরেন্দর আমার শ্বশুরঘর। ওর ভেতর যেটা আছে সেটা পুরুষ। আর এর ভেতরে (শ্রীরামকৃষ্ণের) যেটা আছে সেটা মাদি। এ রকম চোখ কি কখনও শুক্‌নো জ্ঞানীর হয়? ভেতরে জ্ঞানের সঙ্গে, মেয়েদের ভেতর যা বেশী দেখতে পাওয়া যায়, সেই ভক্তির ভাব, তোর ভেতরে যথেষ্ট রয়েছে। খালি পুরুষের ভাবগুলো যার ভেতরে থাকে, তার স্তনের বোঁটার চারিদিকে ভেলার দাগ (কৃষ্ণবর্ণ) থাকে না। মহাবীর অর্জুনের এই দাগ ছিলো। তোর আছে।"

"নরেন্দর আগে মাকে মান্‌তো না, কাল মেনেছে। সারারাত বুঁদ্ হোয়ে 'মা ত্বং হি তারা' গানখানা গেয়েছে। নরেন কালী মেনেছে। বেশ হোয়েছে—না? নরেন্দর মাকে মেনেছে—বেশ হোয়েছে।—কেমন?

"কোল্‌কেতার কায়েতের ছেলেটার জন্যে অতো মন কেমন করে কেন? আমার তবে হোলো কি? মা বল্লেন—তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস। তাই ভালবাসিস। যেদিন ওর ভেতর নারায়ণ দেখতে না পাবি সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।"

—হঠাৎ পট-পরিবর্তন। একমাসের অধিক কাল ঠাকুরের নরেন্দ্রের প্রতি একান্ত উদাসীন আচরণের একটি পর্ব সমাপ্ত। "আচ্ছা, আমি তো তোর সঙ্গে একটা কথাও কই না। তবে তুই এখানে কি করতে আসিস বল্ দেখি।"

"আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি ? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছে করে—তাই এসে থাকি।"

"আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা কোরে) দেখছিলাম। আদর যত্ন না পেলে তুই পালাস কি না। তোর মত আধারই এতটা অবজ্ঞা ও উদাসীন ভাব সহ্য করতে পারে। অপরে হোলে এতদিনে কোন্ কালে পালিয়ে যেতো। আর এদিক মাড়াতো না। মা জানিয়ে দিয়েছেন তোকে তাঁর অনেক কাজ করতে হবে।—ওরে বারো বছর অখণ্ড ব্রহ্মচার্য্য পালন কল্লে, মানুষের মেধানাড়ী খুলে যায়।"

* * *

—পরমহংসদেবের সহিত নরেন্দ্রনাথের এই মধুর দৈবী সম্বন্ধ কে বুঝিবে ? সাধারণ নরনারী· আমরা—আমাদের দেহের প্রতি রোমকূপে রোমকূপে কাম-কাঞ্চন বিষয়াসক্তি জড়াইয়া রহিয়াছে। পাটোয়ারী বুদ্ধির মগজ লইয়া আমরা কি বুঝিব ? উদ্ধৃত উক্তি হইতে নরেন্দ্রনাথের জীবনের অলৌকিক দিকের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে। আমরা উহা সব বুঝি বা না বুঝি। কাহাকেও কেহ কখন কথার দ্বারা এ তত্ত্ব বুঝাইতে পারিবে না। অপ্রমেয়ং অতর্ক্যং। বোঝে, প্রাণ বোঝে যার।

যুক্তির 'ইতি' মেলা কঠিন। তথাকথিত যুক্তিবাদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, অলৌকিক দৃষ্টি সমূলে উৎপাটিত করিয়া, মা গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা যায় না। জানি বটে অলৌকিক রাজ্য লইয়া জুয়াচোরে জুয়াচুরি যথেষ্ট করে। বিশ্বাস করা বা না করা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। আবার আজ যাহা বেশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে কালকের দৃষ্টিতে তাহা অতি দুর্বল যুক্তি বলিয়া সপ্রমাণ হয়। পরশু আবার অন্যরূপ প্রতিভাত হইবে। কতটা উপলব্ধি করিলে, ঐশী শক্তির মহিমা কতটুকু ভিতরে ধারণা হইলে, মানুষের যুক্তিবৃত্তির বিরতি হয়, তাহা বলা যায় না। ধন ও পাণ্ডিত্য মদে আবার এক অতিরিক্ত অহংভাব আসিয়া দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন করে। সেই জন্যই কি শ্রীঈশা বলিয়াছিলেন, স্বর্গরাজ্যে ধনীর প্রবেশ করা দুষ্কর ? দুঃসাধ্য ? একটা স্থচের ছেঁদার ভেতর দিয়ে বরং একটা উট গলে যাওয়া সহজ, কিন্তু ধনীর ও-রাজ্যে যাওয়া মুস্কিল। "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God" তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বসু বলরামের ন্যায় বিরল যে ধনী চোখে পড়ে—যিনি মদ বিবর্জিত,তাঁহার

কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। শ্রীভাগবতেও বিতণ্ডাশীল পণ্ডিতদের অনুভূতিরাজ্য দূরে থাকিয়া যায়, প্রবেশাধিকার থাকে না, একথা আছে। পাণ্ডিত্য ও সাধুত্ব—বিবেক-বৈরাগ্য—একসঙ্গে থাকিলে, সোনায় সোহাগা হয়। যেমন শঙ্করের ছিল। চৈতন্যের ছিল। নরেন্দ্রের ছিল। মোক্ষরূপ চরম ও চিরশান্তি-কামীকে শ্রীশঙ্কর বলিতেছেন—পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র-বিবাদ বর্জন কর।

"বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যাজ্যতাম্।" ঠাকুরও পরমাত্মদৃষ্টি হইতে বলিতেছেন,—"তখন পণ্ডিত-ফণ্ডিতগুলোকে খড়কুটো ব'লে বোধ হয়।"

অলৌকিক বিষয়ে বক্তার উক্তিই তাঁহার শক্তির অসাধারণত্বের শ্রেষ্ঠপ্রমাণ। বেদান্ত ইহাই বলিয়াছেন। "বেদাহমেতং পুরুষম্ মহান্তম্"—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি। উপনিষদের ঋষিরা নির্ভয়ে ঘোষণা করিয়াছেন। ঈশা বলিয়াছেন,—"আমি চাপরাশ পেয়ে কথা ব'ল্‌ছি।"—"I speak with Authority." শ্রীমহম্মদও সেই এক বিভু-পরমেশ্বরের চিহ্নিত বলিয়া আপনাকে তাঁর দূত, গোলাম বা রসুল-উল্লা আখ্যা দিয়াছেন। বিবেকানন্দ বল্‌ছেন,—যা' দিয়ে গেলাম—দাগা বুলিয়ে যা। রামকৃষ্ণদাসাবয়ং। ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কুর্মস্তারকচর্বণম্। আমরা কি যে-সে? আমরা রামকৃষ্ণের দাস। বলের জোরে তিন্‌টে ভুবন উল্‌টে দেবো। আর, আকাশের তারাগুলোকে কচ্‌মচ্ ক'রে চিবিয়ে খাবো!—এতে অবশ্য আলঙ্কারিক শব্দ-প্রয়োগ আছে, কিন্তু, কত বড় জোরের কথা! শ্রীশঙ্করাচার্য সটান্ বুক ফুলিয়ে বল্‌ছেন—কলাবত্র ভবাম্যহং। কলিতে একমাত্র আমিই জগদ্‌গুরু। শিষ্যকে পরমহংসদেব বলছেন,—আমি যেমন বলছি, সেই রকম যদি চলে যাস, তো সোজাসুজি (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছুবি। আর তা' না হ'লে, ঘুরে মর্‌বি। যার শেষ-জন্ম সে এখানে আস্‌বে। এখানকার ভাব নেবে। পার্থকে গুরুদেব বল্‌ছেন—আমার দয়াতে তরে যাবি। যজ্ঞ ক'রে তপ ক'রেও, তুই যেমন বিশ্ব-রূপ দেখলি, তা' কেউ দেখতে পায় না। তোকে করুণায় দেখা দিলুম। সত্যি, বল্‌ছি, তুই আমার প্রিয়। তোকে ভালবাসি। আবার একবার অভিমানের সুরে বলেছেন,—কথা না শুন্‌লে সর্বনাশ হবে। জাহান্নমে যাবি। কার কথা মেনে চলবার চেষ্টা কর্‌তে হবে, প্রশ্ন করায়, স্বামী সারদানন্দ একবার পরিষ্কার বলেছিলেন,—গুরুর কথা! যিনি জেনেছেন। পেয়েছেন।

তুমি আমি শুধু মুখে ফড়্‌ফড়্ ক'রে এরূপ কথা বললে, লোকে মান্‌বে না। কেবল কথায়—লম্বা-চওড়া বুলিতে, বড় একটা কেহ ভেজে না। ভেজেও নাই

এ পর্যন্ত। বলবে, স্পষ্ট সামনে দাঁড়িয়ে,—বুক ফুলিয়ে, ও সব লোক-ঠকানো পুরুতদের বুজ্‌রুকি থো করো। Theological nonsense! কিন্তু, পূর্বোক্ত মহাপুরুষদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে, জগৎ তাঁদের কথা মান্‌তে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঐশী-সত্তা—সংশয়বাদীর দৃষ্টি—ঠাকুর ও স্বামীজীর সার্বভৌমিকত্ব

যতক্ষণ যে রাজ্যে আছি, ততক্ষণ সে রাজ্যের দৃষ্টিকোণ ত্যাগ করবারও উপায় নেই। আমরা নাচার। নরেন্দ্রের শক্তি সর্ব-বাধা সত্ত্বেও আজ বিশেষ করিয়া বাংলার হাটে মাঠে, চত্বরে, পণ্ডিত-মহলে সর্বত্র সকলে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতেছে। তাঁহার অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাসী হওয়া, বা বিশ্বাসী হইয়া কাজে নামিতে পারা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই—কিন্তু, তাঁহার লোকোত্তর শক্তি আজ অবিসম্বাদী।

যাঁহাদের মনের গঠন-প্রবৃত্তি অলৌকিকতত্ত্বে অবিশ্বাস আনিয়া দিতেছে, তাঁহারা দেখিতেছেন—এই যুবক মাত্র উনচল্লিশ বৎসর দেহে থাকিয়া, মানুষকে বড় বিষম রকম,—কিন্তু বেশ পাকা স্থায়ীভাবে—মাতিয়ে গিয়েছেন। ক্ষণিকে সে ভাব উবিয়া গেল না। তিনি শরীরে সুদৃঢ়, সুন্দর, সর্ব-সৌষ্ঠবসম্পন্ন। মগজে অসাধারণ। হৃদয়ে বিশাল। সর্বাগুণান্বিত। সাহসী। তেজী। জিত-ইন্দ্রিয় বাগ্মী। ধ্যানী। লোকনায়কতায় দক্ষ। আদেশ ক'র্‌তে পটু, আদেশ নিতে পটু। সু-সেবক। সংগঠনে অদ্বিতীয়। বহু লোক একদিন তাঁহাকে মানিত। নিজে উপস্থিত হলে, অতিবড় বিরুদ্ধ শক্তিও তাঁর কাছে কেঁচো হয়ে যেত। এখনো অনেক লোক তাঁহাকে মানেন। তাঁহার ভাব অনুযায়ী স্বেচ্ছায় জীবন সমর্পণ করেন। তিনি সংযমী। মহাপবিত্র। পরদুঃখে কাতর। যোগ-সংসিদ্ধ। অতুল উৎসাহ-সম্পন্ন। কর্ম পটু। সূক্ষ্ম সুচারু শিল্পবোধে অদ্বিতীয়। আবার রন্ধন-নিপুণ। গায়ক। বাদক। কবি। ব্যায়াম-কুশল। সু-রসিক মিশুক।

কখনও কখনও ধীর, গম্ভীর—একান্ত উদাসীন। কখনও শিশু। আবার পরক্ষণেই জ্ঞানবৃদ্ধ লোকাচার্য।

চূর্ণী কৃষ্ণনগরের পুতুল-মূর্তি-গঠন-বিদ্যায় সুদক্ষ আচার্য দীর্ঘজীবী (১৯২৪ সালে বয়স ছিল প্রায় ১০৭ বৎসর) রসবিৎ শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল মহাশয়, অনেক কথার ভেতর, স্বামীর সম্বন্ধে বললেন, "দেখো, অনেক আসরে—জীবনে ঢের শোন্‌বার সুবিধা হয়েছে। কিন্তু, বাপু, তেমনটি পাখোয়াজ,—মিঠে, বড় মিঠে, —বাজনা আর কারুর হাতে শুনিনি। আর তাঁর শিল্প-দৃষ্টি খুব পাকা ছিল সব বিষয়েই। আমাকে খুব ভালবাস্‌তেন, যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন।"

তাঁহার কথা শুনিয়া লোকে তাতিত। মাতিত। আজও পড়িয়া চঞ্চল, গরম, নরম সব রকমই হইয়া উঠিতেছে। সকলের ভিতর একটা প্রবল অনুসন্ধিৎসা দেখা দিতেছে। একটি যুবক, একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ককে, জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনি ত' দেখেছেন, সঙ্গ পেয়েছেন, আচ্ছা, তাঁর ডান গালে বা বাম গালে, বা সমগ্র মুখমণ্ডলের কোথাও কোনও তিল ছিল কি?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি ফাঁপরে পড়লেন। "সেটা বলা বড় শক্ত। কই? উল্লেখযোগ্য ত' স্মরণ হচ্ছে না।"

গোড়ায় আমলে না আনলেও বাঙ্গালী,—কলিকাতা সহরবাসী,—আজ তাঁহাদের গর্বের বস্তু—বিবেকানন্দের স্মৃতিকে পূজা করিবে বলিয়া বদ্ধপরিকর। তাঁর সম্বন্ধে যিনি যেটুকু জানেন, সব তথ্য, সব সত্য, সব খুঁটিনাটি—ছোট বড়, পোষাকি, অট-পৌরে, সকল কথা শোন্‌বার জন্য, অতীত কাহিনীর যাদু-পেটিকায় এখন মাথা ঠুক্‌ছে। আহিরীটোলার দালপটীতে চটী পায়ে দিয়ে, বিবেকানন্দ মহারাজ—দাল কিন্‌ছেন, কলকাতার বিষয়ী-ব্যস্ত ব্যাসাতী লোকবাগীশ কতদিন তাঁকে আপনাদের ভেতরেই একজন রূপে দেখেও, চিন্‌তে পারেনি। জ্যান্তে চেনা দায়। আজ এতদিনে, কালের দীর্ঘব্যবধান বোধ হয় একটা চেতনা এনে দিয়েছে। এদিকে রাষ্ট্রিক পরাধীন যখন আমরা, আমাদের কাছে, ঐ যে প্রভুর জাতেরা, জাতভায়েরা, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের তারিফ কর্‌ছেন,—সেটাও কতকটা আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে। এখন বলছি তাই,—কে জানো, কি জানো, ওগো বলো, বলো বড় কুতুহল হয়েছে, অধৈর্য হয়েছি—সেই সরস, সতেজ জীবনের সব রহস্যটুকু আমাদের শোনাও। আমরা তৃষিত চাতকের মত চাহিয়া আছি। যত মধুবর্ষণ পাইতেছ, ক্ষুধা, অনুসন্ধিৎসা ততই আরো বাড়িতেছে।

বিবেকানন্দকে আজ নব্য বাংলা ভালবাসিয়াছে। তাই তাঁর নামে এত উন্মাদনা, এত উত্তেজনা। বিবেকানন্দকে ব্যাক নাম্বার বলারও লোক দেখা যাচ্ছে। এ-ও এক দিক্।

কেউ বলছেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে মান্তে পারি, পরন্তু. দল মানি না। যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের স্মৃতি নিয়ে,—ভাল ভাবে হোক, মন্দ ভাবে হোক, —ঘরদোর ছেড়ে জীবন-উৎসর্গ করেছেন, করছেন বা করবেন, তাঁদের মানেন না। জনৈক কর্তার জীবনে এক সময়ে গৈরিক বসন দেখলেই অন্তরে গাল-মন্দ দেওয়ার প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইত। বলতেন—"ব্যাটারা সব সন্ন্যিসি সেজেছে, পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে, খ্যাঁট্ যোগাড় করেন। চক্‌চকে পাকা বাড়ীতে বাস করেন। তায় আবার বিজলী বাতি লাগানো। এয়ারকণ্ডিশন। আরও কত কি।"

আবার এক শ্রেণী আছেন,—মাসিক পত্র, দৈনিক পত্রের মালিক। তাঁদের রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী, বিবেকানন্দ প্রভৃতির কথা লিখতে হয়। ছবি ছাপাতে হয়।—যেহেতু এঁদের নামে দেশে বেশ কিছু ভাল কাজ হচ্ছে। এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাও সুতরাং আছেন,—যাঁদের কাছে, মাসিক ও সাময়িক পত্র বেশী বিক্রি হবেই হবে,—যদি এঁদের কথাবার্তা ছাপা হয়। এঁরা আরও বলছেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'ভক্ত' ছাড়া, আমাদেরও কাছে এঁদের জীবন পরম সম্পদ। আমাদেরও তাঁদের সম্বন্ধে বলবার আছে। অবতার, ভগবান, নারায়ণ, এসব কুসংস্কারপূর্ণ কথা তাঁদের সম্বন্ধে বলতে আমরা নারাজ। কাউকে ভগবান বললে, তাতে যে আমাদেরই মানহানি হবে। ইজ্জত যাবে। মূর্খ গেঁয়ো লোকে—ও সব শব্দ সস্তায় ব্যবহার ক'রবে। আমরা "চাইল্ড হ্যারল্ড" পড়েছি, কীট্‌স পড়েছি, সেলি, আর্নল্ডকে গুলে খেয়েছি। বড় জোর সিদ্ধ সাধু, কিম্বা মহাপুরুষ, বা অতি-মানব এই পর্যন্ত উঠা যেতে পারে। (তাও ম্যাক্সমূলারিজম্ বা রোমঁ্যা রোঁলাইজিমের মহিমায়!) আর পিদিম্ ধরে তাঁদের দেবতা বানাতে আমরা একেবারেই নারাজ।

এই শ্রেণীর একজন, রাঁচি বিদ্যাপীঠের এম-এ পাস করা মার কৃপাপ্রাপ্ত শশিঘোষ শিক্ষককে একদিন বলছেন,—"আর তুমি লেখাপড়া শিখে কিনা, সটান্ বিশ্বাস করছ যে, মধুরভাব সাধনের কালে রামকৃষ্ণের শরীর—পুষ্পিত হয়েছিল! ও সব গাঁজা। যদি আমরা হতুম ত' তাঁদের সম্বন্ধে যা' কিছু অলৌকিক—(অর্থাৎ যা কিছু বৈজ্ঞানিক আমরা বুঝি না)—সব ছেঁটে বাদ দিতুম। খালি কতকগুলো মিথ্যে—সাজানো গোজানো পুরাণ-রচনা। আর

কেন বাবা ? অষ্টাদশ প্রসিদ্ধ মহাপুরাণ, অসংখ্য উপপুরাণেও এঁদের সা/ায় না। বড় গল্পে,—এরা খেলা পেয়ে গেছে! তাঁরা সাধারণ মানুষই ছিলেন, তবে উঁচু দরের বটে। চরিত্রবান্। দয়াবান্। উদার।—আর, চরিত্র ওরা যতটা বলে ততটা বড় নয়। ওরা বাড়ায়। আজকাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামে অনেক দল গজাচ্ছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কেতাব বানানো উচিত যাতে লেখক, সাংখ্যের পুরুষের মত (তিনি নাকি ছিলেন, সৃষ্টির আদিতে বা প্রাক্কালে প্রথম বৈজ্ঞানিক ইতিহাস-রসিক) নির্বিকার হ'য়ে, কোন মন্তব্য না চড়িয়ে, কেবল ঘটনাগুলি দিয়ে যাবেন। (অবশ্য, তাহা দিলেও, শেষে আবার এই ঘটনাগুলির সত্যাসত্য লইয়া তুমুল বিবাদ বাধিবে।) আর যদি মন্তব্য দিতে হয় ত' অলৌকিক তথ্যে যাতে অবিশ্বাস আসে, সে পক্ষে ঝোঁক থাকলে, আমাদের আর কোনই অপত্তি থাকবে না। খুব ভাল সমালোচনা করব। আমরাও তাঁদের জীবন-কাহিনীর কম দরদী নহি। তাঁদের নামে আজ সহজে ভিক্ষা মেলে ব'লে, কতকগুলো বুজ্‌রুকে দল পাকিয়ে, কাছা খুলে যা' তা' করছে। পেট্‌কি ওয়াস্তে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

১৯৩৪ সালের ৬ই মে তারিখের স্টেট্‌স্‌ম্যানে খবর পাইতেছ যে, ইটালির পিরানো নামক ছোট সহরের এক হাসপাতালে একজন রোগিণী আছেন। তাঁর শরীর থেকে গভীর রাত্রে সত্য সত্য আলো বাহির হইয়া অন্ধকার ঘর আলোকিত করিতেছে। বিজ্ঞান সত্য-প্রকৃতির কতটুকু জানিয়াছে ?—সামান্যই। ইটালির জাতীয় বৈজ্ঞানিক কৌন্সিলের (National Council of Scientific Research) প্রেসিডেণ্ট মার্কনি সাহেব জগতের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি, এই অদ্ভুত ইলেক্‌ট্রিক—বিজলী-বিচ্ছুরণকারিণী নারীর প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। ভেনিস সহরের অধ্যাপক ভাইটালি (Vitali) কেস্‌টি পরীক্ষা করিয়া—Self-produced—ভিতর হইতে আলো আসিতেছে—এই মাত্র বলছেন। কেন আস্‌ছে ?—তিনি, এখন বলতে অক্ষম।

কিছুদিন পূর্বে, ঐ কাগজের মারফত আর একটি অপূর্ব মানবের পরিচয় পাইয়া, বৈজ্ঞানিক জগৎ বিস্মিত বিমোহিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাকি উলটো দিকে হৃৎপিণ্ড। অথচ বেশ সুস্থ আছেন। কর্মঠ আছেন।

শুনা আছে মানভূম জিলায় পুরুলিয়া সহরে একজন বাঙালী মহিলা আছেন, যিনি এক যুগের উপর আহারাদি করেন না, অথচ সংসারের কাজকর্ম করেন, অপরের আহার্য রন্ধন করেন।

ঐ অঞ্চলের একটি লোকের, হঠাৎ একদিন, পুংদেহ স্ত্রীদেহে রূপান্তরিত হইয়া গেল বলিয়া, কিম্বদন্তী শুনিয়াছি। আমরা অবশ্য এই বিশেষ দৃষ্টান্ত শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু, এই ধাঁচের আরও দৃষ্টান্তের সংবাদ কাগজে পড়িয়াছি।

'ভক্ত' নাম লইতে কিন্তু কিন্তু বোধ হয়। পাছে লোকে অবুঝ অ-বুদ্ধিমান্ বলে গায়ে কালি দেয়। বাধ বাধ ঠেকে। আর এটাও খুব স্বাভাবিক। যাঁদের সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে, নামযশের খুব বোল্ বোলাও আছে, তাঁদের কেউ অ-বুঝ্ অ-বুদ্ধিমান্ বললে সইবেন না। অথচ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শক্তি, তাঁদের দাসানুদাস সেবকদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত সদনুষ্ঠানের সৎপ্রভাব হ'তে, ইঁহারা আপনাদের বাঁচাইতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধী অবশ্য এই শ্রেণীর টিপে টিপে কথা বলার দলে নহেন। তিনি রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত, মগের মুল্লুকের সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—ভারতের যেখানেই যাই, দেখি, রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত সেবকবৃন্দ আপনাদের কাজের দ্বারা দেশের চিত্ত জয় করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অমানুষিক ঐশী সত্তায় কতটা ভেতরে বিশ্বাস এলে, মানুষ অদম্য উৎসাহে, অবৈতনিকভাবে, স্বেচ্ছায় হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজে নামতে পারে, তা এঁরা ভাববার অবকাশ পান না। ইহাই হইল সংক্ষেপে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অ-ভক্ত নামধেয় ভক্তদিগের দৃষ্টি।

বারাণসীর সনাতন হিন্দু সমাজের নাম লইয়া, (লোকমুখে শুনিয়াছি, কোন শ্রেণী-বিশেষের এই মতের সহিত সম্বন্ধ নাই)—কোন এক 'জাতি'সর্বস্ব ব্যক্তি পুস্তক মারফতে বলিতেছেন,—(সংক্ষেপে ভাবটা দিলাম)—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন দেশের ভিতর ক্রমশঃ ক্রমশঃ শক্ত করিয়া শিকড় গাড়িয়া, সনাতন হিন্দুত্বের সর্বনাশের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। ব্রাহ্ম-আন্দোলন-কারীদের অপেক্ষাও শতগুণে, এই নব-আন্দোলনকারীদের কর্মপদ্ধতি, আহার-বিহার, পোষাক, আচরণ নিন্দনীয়। ইঁহারা সনাতনত্বের আবরণে বেশীরভাগ আমিষ ভোজন করেন। যদৃচ্ছা পুরাতন প্রথা-সংস্কার পদদলিত করিয়া, ঘুরিতেছেন, ফিরিতেছেন। অন্যায়—অন্যায়—মহা অন্যায়। একান্ত অন্যায়! হে দেশ, হে জাতি, হে হাঁড়ি-সর্বস্ব, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা মোরে লজ্জাবতী লতা-শ্রেণী, প্রতিরোধ করো, করাও,—সর্বতোপায়ে, খুব শক্ত ক'রে, সর্বভাবে। হে সনাতন অচলায়তন সমাজের হিতৈষিগণ,—রামকৃষ্ণ

ছিলেন মহামূর্খ, ভক্তি-বাদী, কালীসেবী। বেদান্তসাধনাদির ইতিহাস ও তাঁহার নির্ভীক চরিত্র বর্ণনাচ্ছলে, তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যবৃন্দ যা' তা' লিখিয়াছেন। আর পূর্বমীমংসার ভাবব্যাখ্যা-তন্ত্রে পারগ আমরা—'জ্ঞ' আমরা, আমরা ত' অকুতোভয়ে সটান্ বলিতেছি, রামকৃষ্ণের উক্তিগুলি বিচারের নিক্তিতে সমগ্রভাবে ওজন কর, কারচুপি ধরা পড়বে। দেখবে কর্তার মতের কোন সামঞ্জস্য নাই। বিবেকানন্দ ত' একটা আস্ত মস্ত প্রতারক, ভণ্ড সন্ন্যাসী। শিলংএ থাকাকালে, ভেড়াকুল মেরে নির্মূল ক'রে, মাংস খেয়েছেন। বিলাসী বাবু। তবে বক্তা ভাল। দেখতে ভাল। চোখ দুটো প্রকাণ্ড বড়। জীবদ্দশায় দেশের আশাভরসাস্থল দুলালদের যথেষ্ট তাতিয়েছেন। তাদের ভবিষ্যৎ জ্বালাইয়া দিয়া, বংশবৃদ্ধির পূর্ব অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সনাতন পাকাপোক্ত রাজপথ হ'তে বিপথগামী করিয়া ছাড়িয়াছেন। এখন অশরীরী। অথচ, চেলা, নাতিচেলা লাগিয়ে, ছেলেদের ভুলাইতেছেন। তোমরা কেউ এঁদের বার্তায় কর্ণপাত করিও না। রামকৃষ্ণ অবতার না হলে, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য-কুলের ভোগরাগ, সম্মান, খাতির সব বন্ধ হয়ে যাবে।

বাঁচিয়া থাকিতেই, অনেক নিন্দা স্বামীজী হাসিমুখে সয়ে ছিলেন। একশ্রেণী যখন গাল দিয়া থামিয়া গেলেন, একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "এরা থেমে গেল কেন? চলুক,—চালাক,—এই ত জীবন্ত সমাজের লক্ষণ। নইলে বলতুম—মরে আছে।"

ভিতরে দেবদেবীর দর্শন, অদ্বৈতানুভূতির তীব্র সুখানুভব তাঁহার দুর্লভ ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে, বাহিরের জগতের নিকট হইতে—বিকারগ্রস্ত সমাজের তরফ হইতে—পদাঘাত, কশাঘাতে তিনি বিকট দুঃখের স্পর্শ পেলেন। এ স্পর্শও তাঁহার বন্ধু, তাঁহার মিত্র, তাঁহার সুহৃৎ, তাঁহার চিরসাথী ছিল। সব সত্যসন্ধানীরও থাকিবে। যাদের উপকার করতে হবে, তাদেরই তীব্র তিরস্কার খেতে হবে। বাইবেলের এক বর্ণনায় ঈশা মহাত্মাকে, ক্রীড়ারত—আখড়ার সীমানায় বা বেষ্টনীতে লড়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতা লড়িতে উদ্যত বলিয়া, রূপকের ভাষায় বর্ণনা আছে। নরেন্দ্রনাথকে এইভাবে কল্পনায় আমরা দেখিতে পাই,—As a new Christ entering the list! ভারতীয় সমাজে, ভারতীয় ধর্মজগতে যাহা কিছু অশিব, বাজারচলন ঘৃতের মত বাজারে চলিতেছিল, সেই সকলের ঘাড় মট্‌কাইতে, তিনি বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সঙ্গে ছিল, শ্রীগুরুর আশীর্বাদ, আর নিজের বুকের অনন্ত সাহস। অপরিমেয় অপরিসীম, দুর্জয় সাহস! নরেন্দ্র-নিন্দা পড়িয়া মনকে বলিলাম, ঠিক হয়েছে, এই ত সজাগ সমাজের মত কাজ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আসা সার্থক। দেশ দেখুক, সত্য কোথায়। এ ত ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেউ খাবে! তগরারে, কথা কাটাকাটিতে, "তাৎপর্যনির্ণায়ক, ষড়বিধলিঙ্গ বিষয়ক" বাগ্‌জালের বিস্তার করিয়া, অনেক কথারই, সব কথারই জবাব দেওয়া যায়। কিন্তু, কাজ নেই। উহা করিয়া, আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অবমাননা করিতে চাহি না। বড় বড় মত অনেকেই তোতাপাখীর মত আওড়াইতে পারে। একতিল করিবার সামর্থ্য থাকে না। যদি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শধারা নিঃশক্তি হইয়া থাকে, কোন চিন্তা নাই, এ প্রদীপ অবিলম্বে কালের ফুংকারে নিভিয়া যাইবে। নিঃশেষ হইবে। কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। আর যদি ইহার ভিতর এখনও কল্যাণের বীজ উপ্ত থাকে, পাথর কাঁকরের উপর নন্দন-কানন সৃষ্ট হইবে।

রোমাঁ রলাঁ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ফরাসী ভাষায় স্তুতিমূলক জীবনী রচনা করায়, ভারতের শিক্ষিত বাঙালী মহলের এক শ্রেণী বিশেষ হিংসাক্রান্ত, উতলা হইয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি ফরাসী-চিন্তানায়ককে নাকি লিখিয়াছেন, "আপনি শেষটা কিনা, এক শ্রেণীর একদেশী সাক্ষ্যের উপর নির্ভর ক'রে এমনটা লিখে ফেল্‌লেন?—আমরাও যে ঐ দুই জীবনের অন্য দিকের সংবাদ রাখি।" রলাঁ ত নাবালক নহেন, তিনি সাহিত্যে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ "নোবেল" পুরস্কার সম্মানে পৃথিবীতলে সম্মানিত। এখন দেখা যাক্, এঁদের সাক্ষ্যের ফলে, ফরাসীমগজ পুরাতন মত কেমন পাল্‌টান।

রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী ভক্তেরা নাকি পাদ্‌রিগিরি করিয়া, ফরাসীর উর্বর মাথায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভক্তি ফুঁড়িয়া দিয়াছেন। ইঁহারা আরো বলিতেছেন যে, কেবল সেবাদ্বারাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দভক্তকুল দেশের ভিতর সর্বত্র নিজেদের প্রভাব, প্রতিপত্তি—বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা আনয়ন করিয়াছেন। উচ্চ বিদ্যার আলোচনা, উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সাধন প্রভৃতি সব বাজে।

শ্রীশঙ্করের বিরুদ্ধবাদিগণ—তাঁর চরিত্রে অপরিমেয় অপবাদ দিয়া, তাঁকে অসুরের অবতার বলিয়া মধ্যযুগে বড় গলায় প্রচার করিয়াছিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাত্মাদের দ্বারা অনুপ্রবর্তিত সব আন্দোলনের জীবন কাহিনীতে এমনটি ঠিক ঘটিয়া থাকে। এক হিসাবে ইহা তাঁদের বিজয়-অভিযানের জয়টীকা।

ঘরে বসিয়া ঝিমাইলে ও কুকুর-বিড়ালের মত মরিয়া যাইলে, বিপুল গাল কেউ কাউকে দেয় না, বড় একটা। দিবার অবকাশ দেওয়া হয় না। সেইজন্যই ত বিজ্ঞ কেহ কেহ বলেন, "ঝামেলায় খামোকা যাও কেন?" বাহিরের বড় আসরে, দুনিয়ায় বড় আদর্শ নিয়ে, উপলব্ধি করব ব'লে বেরোবেন যিনি, তাঁকে অজস্র গালির ভার নিতে হবে, যিশুদেবের জীবন তাহারই সাক্ষ্য। শিবক্ষেত্র দেওঘরে গুর্জরের মহান্ আত্মার প্রতি এক দিন যে শোচনীয় ব্যবহার শ্রেণীবিশেষ করিয়াছেন, মানুষমাত্রেরই পক্ষে তাহা ঘোরতর লজ্জার কথা! সমগ্র ভারতের অশিব শক্তি সেদিন ক্রূর সর্পিণী সম অহিংস-অপ্রতিরোধিতার মূর্তবিগ্রহকে দংশনে উদ্যত হইয়া, শতফণা বিস্তার করিল। ইহা তাহারই প্রতীক। কিন্তু, আমরা ঠিক জানি, যিনি বড় হতে চেষ্টা করবেন, তাঁর আঘাতের ভারও বড়,—গালির ভারও বড়, বিপুল হ'তে হবে। 'পিঠ করতে হবে কুলো, কানে দিতে হবে তুলো।' আর ভেতরে যেটা খাঁটি ব'লে বুঝেছেন, সেইটেই কর্মক্ষেত্রে সফল করবার জন্য প্রাণ পণ করতে হবে।

এক নব সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতারা বাংলাদেশে কয়েক বৎসর আগে তাঁদের মুখপত্রে লিখলেন,—এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন মস্ত সাধক এসেছিলেন। কিন্তু, সাধনার সময়ে, দক্ষিণেশ্বর-ঈশ্বরের নারী সঙ্গে না রাখাটা একটা ত্রুটি। ঐ ত্রুটি নিবারণ করিবার জন্য,—ঐ ভুল শোধরাবার তরে, ইঁহারা নারী সঙ্গে রাখিয়াই নবযুগে, নবভাবে, নব-আদর্শের উদ্বোধন করিতেছেন বলিয়া মনে করেন। নব জাগরণের এই দিনে, জাতির সমক্ষে, হয়ত' এরূপ সবরকমই চাই।

আবার কেউ বল্‌ছেন, রামকৃষ্ণ অত বড় হতেন না, যদি না বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গিয়ে, বরাত জোরে, বিবেকানন্দের মত ও রকম একজন সর্বাঙ্গসুন্দর সুদক্ষ কাজের ছোক্‌রাকে পেতেন,—প্রচারের জন্য, সোরগোল বাধাবার জন্য—দুনিয়াময়। বিবেকানন্দই রামকৃষ্ণকে অবতার বরিষ্ঠ—ভগবান্ বানিয়েছেন। আর বিবেকানন্দের ঘোর আধ্যাত্মিক সাধন শক্তি-ফক্তি ও সব বাজে। তবে তিনি খুব লোকহিতকর কাজের পত্তন ও শুভপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। এটা জাতিগঠনের দিক হইতে—বড়ই মঙ্গলপ্রদ। আর এইটিই তাঁর জীবনের সব্‌সে সেরা মস্ত বাহাদুরি। তিনি স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। ধর্মগুরু নন। একটা রানাপ্রতাপ, গুরু গোবিন্দসিং, শিবাজীরই সামিল। যদিও হাতে ছিলো না ঢাল বা তলোয়ার। আর যদিও পরতেন, গেরুয়া। বলেছেন, মুক্তি ফুক্তি—সব ফেলে দে। আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য জননী জন্মভূমিই

তোমাদের একমাত্র দেবতা হউন। আর সব অকেজো দেবতাগুলোকে গঙ্গার জলে ফেলে দে। জ্যান্তো নরনারীর সেবা কর্। তিনি প্রচ্ছন্ন ধর্মের আবরণে দেশচর্যাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ও সব মালসা-ভোগ খাবার ব্যবস্থা করলে চলবে না। বিবেকানন্দকে ভাঙ্গিয়ে বাবাজীরা আর কতকাল খাবেন? আর তিনি যে নয়া-বাংলার দেবতা বনেছেন, যুবক-বাংলার অন্তরের রাজা হোয়েছেন, তা সেটা নিছক তাঁর ঐ সুন্দর সুঠাম নয়নাভিরাম তেজঃপুঞ্জ বপুখানারই জন্য। আত্মিক শক্তি নয়। দেহটাও তাঁর ওপর প্রকৃতির হঠাৎ দান, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। তাঁর ঐ চোখ দুটো মস্ত বড় বড়। আর ওরই জোরে তিনি সবাইকে বশ করতে পারতেন। কিন্তু বলি ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ করলে এইরূপ তুলিতে আঁকা বহু বরবপু চোখে ঠেকবে। তাঁরা কিন্তু কেউ ভারতের নিত্যসত্য আত্মিক—আধ্যাত্মিক চৈতন্যময় জীবন্ত ইতিহাসে— বিবেকানন্দ বন্‌ছেন না। আর সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য, অখিল বিশ্বের মনোময় ও আত্মময় গৌরব অবদান—জগতের বাজার-চলন জড়দৃষ্টি বহুল, রাজনৈতিক ইতিহাস-লেখকদের নজরে আসা সম্ভব নয়। তা হোলে কি স্থূল-অবয়ব অতিরিক্ত আরও কিছু আছে নাকি?

* * *

পাঁচশো টাকা মাইনের গরম দেখা গেল বেশ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পদাশ্রিত একটি বাবাজী পাড়াগাঁয়ে, অপরাধের মধ্যে, ভগবানের নামজপ করছিলেন। ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করছিলেন। বাবু বললেন, "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নামে ভণ্ড আপনি। আপনি পরগাছা। নিদেন একটা নাইটস্কুল করেন না কেন?" বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় বাবাজী, অপরাধের মধ্যে, সেঁধিয়েছিলেন। "বিবেকানন্দকে তো আপনি মেরে ফেল্‌ছেন, মালা ঘুরিয়ে।" চাপরাশীদের সেলাম খেয়ে, আর তখনকার দিনের মাস মাস সরকারী বেতনের মোটা "চেক" পেয়ে বাবু, আরাম কেদারায় বসে ভেবেছেন, নব ভারতের, নব্যজগতের কাছে আচার্যপাদ বিবেকানন্দের নববার্তার সবটা বুঝে নিয়েছেন। বা আসল শিক্ষা ধরতে পেরেছেন। বাবাজী হাসতে হাসতে বাবুকে বললেন "বেশ তো, উকীলবাবুর বাসায় ভিক্ষা পাই। তাঁকে ব'লে খাবারটা বন্ধ করতে চেষ্টা করুন না। আর ব্রাহ্মণের ছেলে আপনি। ফস্ কোরে একটা মানুষকে পাশ্চাত্য বুলির কদম্ব-করণ কোরে পরগাছা বলা কি বিবেচনার কাজ? তা হোলে এই পর্যায়ে

পড়িবেন, আচার্য বুদ্ধ, আচার্য ঈশা, আচার্য শঙ্কর, আচার্য চৈতন্য। বিশ্বসমাজ কি এতই বোকা, এতই হাবা, যে এঁরা তাঁতশালা বা পাঠশালা হাতে না করলেও, এঁদের ভিক্ষান্ন দিতে নারাজ হলেন না কোনদিন? গৃহস্থের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা, এঁদের পায়ে গৃহস্থই নিজহস্তে অকাতরে ঢেলে দিয়ে ধন্য হয়েছেন। সব যুগে। সব শতাব্দীতে। সবক্ষণে, সব পলে। সবদিন, সব রজনীতে। যে গৃহস্থ এত হিসাবী—যে—দুই পয়সা দামের হাঁড়িটা আজ কিনে, তিনদিন পরে আকাশে গ্রহণ লাগলো বলে, আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবেন জানেন,—তাও কানা ফুটো কিনা, কুমোর ঠকালো কিনা, পরখ করবার জন্য সাতবার ফং ফং টং টং করে বাজিয়ে, যাচাই করে চোখ চেয়ে দেখে নেন!!!

*　　　　*　　　　*

দেহত্যাগের কিছুদিন আগে নরেন্দ্রনাথ একদিন শরচ্চন্দ্রকে (স্বাঃ সারদানন্দ) বলিয়াছিলেন, "ওরে আর সে মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি না। বেটী— আমার হাত ছেড়ে দিলে।" শরৎচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, তিনি নাকি তখনই তাঁকে বলেন, "সেকি ভাই, তা কি কখন হ'তে পারে? মা তোমার সর্বদাই হাত ধরে আছেন।" মুখে এই কথা বলিলেও, শরৎ মহারাজ আমাদের বল্‌লেন, "দেখ, সেইদিন থেকে আমিও বুঝলুম স্বামীজীর শরীর দিয়ে মার যা কাজ করাবার ছিল—তা সাঙ্গ হয়েছে।" যে সন্তান (১৮৯৬) নিউইয়র্ক থেকেই, 'খেলা মোর সাঙ্গ' বলে জগদম্বার উদ্দেশ্যে গান গেয়ে উঠেছিলেন, সেই বালককে কঠোর পরিশ্রমের পর, মা আবার অঙ্কে ধারণ করিয়া বিশ্রাম দিবেন বলিয়া, উতলা হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অতি প্রয়োজনীয়—যোগ্যের সুযোগ্য বিশ্রাম দিবেন। সোহাগে নিবিড় করিয়া বুকের ছেলেকে আবার বুকে জড়াইয়া রাখিবেন। বাহিরে সে তো বেশ খেল্‌লে।

স্বামী সারদানন্দ শেষবার শ্রীক্ষেত্রে শশীনিকেতনের দুতোলার একখানি ঘরে বসিয়া, সন্ধ্যায় নরেন্দ্র-প্রসঙ্গ করিতেছিলেন। সেদিন পরিষ্কার বললেন, স্বামীজীই তো একটি অবতার। ঠাকুরের কথা ছেড়েই দাও। বার বার তিনবার একদিন ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, তুই ঠিক থাক্—তোকে এখন কেউ বুঝ্‌তে পারবে না।

একটি বালক ব্রহ্মচারী শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা আঠারটা গুণ স্বামীজীর ছিল ব'লে ঠাকুর বল্‌তেন। তা কোনদিন আপনাদের কাছে

এই আঠারটা গুণ কি কি, বলেছিলেন ?" শরৎচন্দ্র উত্তরে, আওয়াজে চটাভাব জ্ঞাপন করিলেন। এবং কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন—"না কা-চন্দ্র লিষ্টি চাইবেন বলে, তিনি রেখে যান নি।"

নির্ভয়ানন্দ পাঁচ মাস শয্যাশায়ী। স্বামীজীর সন্ন্যাস সন্তান। স্বামীকে রেঁধে খাইয়েছেন। অঙ্গসেবা করেছেন। দিনের পর দিন এক ঘরে শুয়েছেন। স্বামীর কথা কইতে তিনি শতমুখ। সমালোচক কেউ কেউ হয়তো মনে করবেন, এসব তো পরস্পর তারিফকারী সভার সভ্যদের সাক্ষ্য (Mutual Admiration Society) কিন্তু যাই-ই বলো আসল সত্যের অনেকখানি এই সব হাতে-নাতে মেশা লোকদের দেবার অধিকার। এঁদের সাক্ষ্যের মূল্য অনেক, নিঃসন্দেহ। নির্ভয়ানন্দ বলেন, ভুরুর উপর একটা দাগ ছিল। বড় শান্ত শিষ্ট ছেলে ছিলেন কিনা! বেশ নাচতে পারতেন। বেলুড় মঠে তাঁর ঘরে সাহেবী (পাশ্চাত্য) নাচ আমাকে দেখিয়েছিলেন। নানান্ রকম নাচ। আর একবার খোল-করতালের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে নাচ্তে নাচ্তে তাঁকে যেতে দেখেছি। রামকৃষ্ণপুরে শ্রীযুত নবগোপাল ঘোষের বাটীতে, যেদিন তিনি স্বয়ং ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। পুণ্যশ্লোক নবগোপালের এই দুর্লভ ভাগ্যোদয় ঘটিয়াছিল। তুলি বা পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁক্তে, তাঁকে কখনও দেখেছেন কিনা, প্রশ্ন করায়, নির্ভয়ানন্দ বলেন,—না। শেষে আবার হাস্তে হাস্তে বল্লেন, তবে ছেলে স্কোয়ার ছিলেন।

নিজে বিষয় ভোগ কর্‌ব, এ বোধ, নরেন্দ্র বিবেকানন্দে কোনদিনই ছিল না। তাঁর মত রূপে গুণে সরেস জামাই পাবার জন্য, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁর পিতাকে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, 'রাজ্যি রাজকন্যে', সবই তিনি দিতে প্রস্তুত,—খালি নরেন্দ্র রাজি হইলেই হইল। তবে রাজকন্যা শ্যামা,—সেই জন্য তদ্দোষ স্খালনার্থ অর্থদণ্ড—দশ সহস্র মুদ্রাদানে তিনি প্রস্তুত।—'পোষাইয়া' দিতে চাহেন। নরেন্দ্র কিন্তু জানিতেন,—"শ্বশুরখ্যাতো ধমাধমঃ।"—ঘরজামাই বা শ্বশুরের ভেড়ুয়া ব'নে, ইজ্জত বংশমর্যাদা জলাঞ্জলি দিতে তিনি প্রস্তুত হন নাই। তিনি আজকালকার 'সস্তার তিন অবস্থার' গ্রাজুয়েট ছিলেন না। তখন বি-এ পাস করা মানেই, কিছু না হোক—নিদেন একটি ডেপুটিগিরি। তাহা ছাড়া, তাঁহার শরীরের বহিঃসৌন্দর্যে বিমোহিত কয়েকটি নারীও তাঁহার দৈন্য দেখিয়া, কাঞ্চন-বিনিময়ে তাঁহার সুন্দর তনু কিনিয়া লইবার প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কথায়—"বাবা

মারা যাবার পর, সময় বুঝে, অবিদ্যা মহামায়া পেছু নিয়েছিলেন।” এই শ্রেণীর সঙ্গতিপন্না একজনকে, তিনি শান্ত গম্ভীরভাবে উত্তর করিয়াছিলেন,—“বাছা, এই ছাই-ভস্ম শরীরটার জন্য এতদিন কত কি ত করলে। মৃত্যু সামনে, তখনকার জন্য কিছু সম্বল করিয়াছ কি? হীনবুদ্ধি ছাড়িয়া পরমেশ্বরকে ডাক।” যুবতী অধোবদন। বাচ্চা পরমহংসের আচ্ছা জবাব।

উত্তরকালে নিজ চেষ্টায় শ্রীবিবেকানন্দ লোক ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠ-সম্পত্তি বানাইয়া, নিজে কর্তা, এমন কি কার্য-নির্বাহক-সমিতির কোন পদই গ্রহণ করেন নাই। বা নিজ নামে ব্যাঙ্কে টাকা মজুত রাখিয়া, সুখে দিনযাপনের সুন্দর ব্যবস্থার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র করেন নাই। তিনি সহজ স্বাভাবিক স্বার্থত্যাগী। বসন্তঋতুর মত লোক-হিতকারী। গুরুভাইদের দু'জনকে উৎসাহ দিবার জন্য, প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী বানালেন। ভাবস্থ হয়ে—নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যায়ে দেখ্‌তে পেয়ে,—পত্র লিখতে লিখতে, এই সব দুর্লভ ভ্রাতৃমণ্ডলীর কাহাকেও কাহাকেও তিনি একদিন, পরিষ্কার লিখতে সঙ্কোচ করেন নাই—“My Children!” মদীয় বৎসবৃন্দ!—কি মধুর সম্বোধন!

শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল অন্তর্ধানের পর—কল্পনা করিতে ভাল লাগে, বাইবেলের আলঙ্কারিক ভাষায়—প্রভুর সবাই বৎস। আর নরেন্দ্রই তাহাদের রাখাল। তিনিই একক চালক, আর সবাই চালিত। ‘খাপ খোলা তলোয়ার,’ শ্রীমৎ তুরীয়ানন্দ অসুস্থ অবস্থায় খাটে শুয়েছিলেন। শরীরটে কালো। আর, মুখমণ্ডল—অরুণোদয়ে যে লাল চোখে পড়ে, সেই লালে লাল। বিছানার উপর বাবু হয়ে বসে ব'ললেন, “ত্যাখো, তাঁর পায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও যোগ্য, আমাদের মধ্যে কেহই নয়।” কি অদ্ভুত সরল মহাপুরুষ-সুলভ স্বীকৃতি।

ফ্রাঁসের বিশ্ববিশ্রুত মনীষী রামকৃষ্ণকে পাশাপাশি ঈশার সঙ্গে এক কোঠায় ফেলে প্রবন্ধ লিখছেন। বলছেন ঈশা ক্রুশে তনুত্যাগ করলেন। আর রামকৃষ্ণ আর একভাবে তিলে তিলে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় নবযুগে আত্মদান করলেন। রামকৃষ্ণকে দেবমানব বলছেন। যাহা “লীলাপ্রসঙ্গকার” ব'লে গেছেন। আর বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলছেন—“নির্বিকল্প সমাধিযোগের অতো বড় আধারটা যে ব্যবহারিক ধূলোর জগতে নেমে এসে গরীব, আর্ত, ব্যথিত, অশ্রুসিক্তের জন্য বুকের পাঁজরখানা বলি দিলে—এইটেই,—এই সর্বমানব-প্রেমবত্তাই—রক্তে রক্তাক্ত য়ুরোপের ও পৃথ্বীর আজকের ইতিহাসে,—

বিক্ষোভ মনস্তাপের জ্বালাময় বর্তমান জীবনে অমৃতের মত কাজ করবে। বাহিরের দিক হতে সর্ববিষয়ে বিবেকানন্দই পূর্ণত্বের প্রতিচ্ছবি। আমি ফরাসীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনকথা, কথার তুলিতে এঁকে, লোকের যুদ্ধবিক্ষুব্ধ অস্থির চঞ্চলপ্রাণে অমৃত পরিবেশন করবার সৌভাগ্য লাভ করবো, মনে মনে ভাবছি।"

য়ুরোপের কাল্‌চার, সাধন, সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা সভ্যতায় ফ্রাঁস অনেক বড় আসন, এমন কি, আচার্যের পদ পেয়ে এসেছে। মধ্যযুগেও তাই। য়ুরোপ কতটা এগুচ্ছে, তা জানবার জন্য লোক ফ্রাঁসকেই এককালে মানদণ্ড ব'লে ঘোষণা করছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের হাওয়া এই রল্যাঁর ভিতর দিয়ে ফ্রাঁসের এবং সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপ মার্কিনের গায়ে আর একবার লেগে, রাষ্ট্রিক হিসাবে পৃথিবীজয়ী পাশ্চাত্যজাতিসমূহ, যাঁহারা বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ভোগ কোরে এসেছেন, তাঁদের নবজীবনে অনেক কিছু বা অন্ততঃ কিছু কিছু, সত্যের দিকে পরিবর্তন ঘটাবে ব'লে আশা করা যায়। রঁল্যা নব্যভারতের অন্যান্য সাধক মনীষী ও বিজ্ঞবৃন্দ, যথা, মহাত্মা গান্ধী, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র, গোস্বামিপাদ বিজয়কৃষ্ণ, বিশ্বভারতীর বিশ্ব-বিশ্রুত প্রতিষ্ঠাতা কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেরই চরিতকথা আলোচনা করিয়াছেন।

রাশিয়ার কোন চিন্তা-নেতা বলছেন, বিবেকানন্দের জীবনীশক্তিপূর্ণ সতেজ কথাগুলি তাঁর প্রাণ মন নতুন আগুনে ভরিয়ে দিয়েছে। তিনিও আপন সমাজকে নূতন পথে নবাদর্শে স্বতন্ত্র গঠন দিবার ক্ষমতা ধরেন। তিনি রাশিয়ানে বিবেকানন্দ তর্জমা করিবেন। জার্মান ভাষায় নরেন্দ্র ইতিপূর্বেই রূপান্তরিত হইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোকনেতৃত্ব—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—সংঘপরিচালনা

কেউ বল্‌ছেন বিবেকানন্দ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপাসক ছিলেন। গণ্ডীবদ্ধ গেঁড়ে ডোবা তোয়ের করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় বাঁধিয়া, মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইতে, তিনি সচেষ্ট থাকিতেন। কেউ বা বলছেন, তা

কেন হবে, তিনি যান্ত্রিক আজ্ঞাবহতার পৃষ্ঠপোষক। সামরিক আইন। ভৃত্যকে হয় গুলি করা হবে, নতুবা, প্রভুর আজ্ঞাবহতা সাধন করতে হবে। আঁট চাই। বাঁধাবাঁধি চাই। কর্তা যা বলেন, মক্‌সো ক'রে যাও, নিজের ছটাকী বুদ্ধি, শিকেয় তুলে রেখে দাও। কারুর মতে তিনি জ্ঞানী। কখনও তিনি ভক্ত। কখনও কর্মী। কখনও প্রেমিক। কখনও একেবারে মায়ের মত! আবার কখনও সৈনিক, কঠিন—কঠোর! তিনি কত কি, কে জানে!! কত কি লিখে গেছেন, বক্তৃতায় ব'লে গিয়েছেন। চিঠিগুলিতে এক একজনকে এক এক রকম উপদেশ দিয়ে গেছেন।

সামঞ্জস্য কোথা? মিল কই?—একি সবই গরমিলই না কি!

শ্রেণীবিশেষ বলছেন—স্বামীজী এসেছিলেন, সংহতিশূন্য ভারতে একতার বজ্র বাঁধনে, প্রীতির পবিত্র মসল্লায়, একটি আদর্শ সংঘ এবং তদনুকরণে জাতীয় জীবনের প্রতিবিভাগে অনন্ত সংঘ সৃষ্টির জন্য। এই কল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তবে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে মিলনের সূত্র বার করে ফুলের মনোলোভা মালা গাঁথতে হবে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য সুষমা সত্তাময়—কিন্তু সোনার তারে সংবদ্ধ, একত্রিত। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দই কি এই নবমিলনের স্বর্ণসূত্র? বহু প্রতিভাকে একত্রিত করিয়া জননী জন্মভূমির বোধন পূজা আরম্ভ করিয়া, পথের খেই দেখাইয়া, চক্ষের আড়ালে চলিয়া গেলেন! বুঝি আড়াল হইতে আড়ি পাতিয়া দেখিবেন সন্তানেরা আরব্ধ কর্ম কতদূর আগাইয়া দিল, কোন্ গতিতে, কেমন ছন্দে, কোন্ ভঙ্গীতে চলিতে শুরু করিল, আর পরিশেষে কোথায় বা গিয়া দাঁড়াইল? কে ইহার উত্তর দিবে?

Unity not uniformity must be our aim. Through variety—differences must be *integrated*, *not annihilated* nor destroyed. * * * Give your difference, welcome my difference—unify all differences, in the larger whole.—Madam Follet.

মিলন!—জোর করিয়া সব জামা-কাপড়গুলোকে এক ছাঁটকাটে বানালে চল্‌বে না। মিলনই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রত্যেকের ভিতর সৃষ্টির যে বিশেষ বাণী, বিশেষ সুর, পৃথক মৌলিকত্ব ফুটিয়াছে তাহাকে জবাই করিয়া নয়। বহুত্বে একত্ব। পার্থক্যগুলিকে—স্বতন্ত্র সাত সুরকে একটি ছন্দবদ্ধ পূর্ণ গীতে একত্রিত—পরিণত করিতে হইবে। কাহাকেও বিনাশ করিলে চলিবে না। এস ভাই, তোমাতে কি পার্থক্য, বিশেষত্ব ফুটিয়াছে সেইটি দাও ও আমারটি আদর করে

লও। সকলের সব পার্থক্য সর্ব-ব্যষ্টিত্ব ধূলি ধূসরিত করিয়া রাষ্ট্রিক conscriptionism বাধ্যতাবাদকেও আজ কোন কোন দেশে মাথা নীচু করিতে হইতেছে। অধ্যাত্ম সাধন-রাজ্যের নেতৃবৃন্দকে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে বলি। স্বামী সারদানন্দের মত একজন অদ্বিতীয় গঠয়িতাই কার্যের দ্বারা—তিরিশ বৎসর সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির সম্পাদকতা পদে, ক্ষমতায় আচার্য কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত অধিষ্ঠিত হইয়া, উদারতার সুতোয় সবটিকিই একসঙ্গে দীর্ঘদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য এ নয়, যে প্রমাণ পাইয়াও তিনি অসাধু আচরণ কখনও কাহারও সমর্থন করিতেন। সে রকম সাংসারিক আপোষবাদী বলিয়া তাঁহাকে কোনদিন দেখিয়াছি মনে হয় না। আর তাঁহাকে দেখিয়াছি সুদীর্ঘ একুশ বৎসর। জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ। অবশ্য ইহাও বলিতেছি, তিনি অহেতুকী করুণাধারা আমাদের নানা দোষ সত্ত্বেও নিত্য প্রবহমান রাখিয়াছিলেন নিজগুণে। স্বেচ্ছায়। কৃপা করিয়া। তিনি দেখা দিয়াছিলেন বলিয়া, কাছে রাখিয়াছিলেন বলিয়া, দেখিতে ও থাকিতে পারিয়াছিলাম। নতুবা আমাদের কি সাধ্য ওরূপ সাধুর সঙ্গ পাই। কি সুকৃতি থাকিতে পারে?

স্বামী বিবেকানন্দের দুই বৎসর-কম বয়সী এই গুরুভ্রাতা—অনুপম শরৎচন্দ্রের দুর্লভ চরিত্রের প্রাণস্পন্দন কথঞ্চিৎ অনুভব করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

স্বামী সারদানন্দের চরিত্র একটি মহান্ দিব্যাবদান। ১৯০৬এ আমরা ছয় বৎসরের বালক। ছয় হইতে নয় পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে বাড়িতে বসিয়া ইঁহাকে দেখিয়াছি। বালকের দৃষ্টিতে—বৈরাগ্যাশ্রয়ীর আঁখিতে নহে। ১৯০৯ হইতে ১৯১৫, রবিবার রবিবার, সপ্তাহে একবার, একবার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখিয়াছি। ১৯১৫ হইতে যে কালরাত্রির কালবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের পাবনকারী শ্রীনাম শুনিতে শুনিতে সাধুভক্ত সন্তানকুল সমাবৃত হইয়া, তিনি আমাদের—দেহধী আমাদের, ছাড়িয়া চলিয়া যান, সেই রাত্র অবধি, এক যুগ, তাঁকে দিনে দেখেছি। রেতে দেখেছি। যখনতখন দেখেছি। কাজে দেখেছি, ধ্যানে দেখেছি। উৎসবে দেখেছি। শ্মশানে দেখেছি। গম্ভীরভাবে বই লিখছেন দেখেছি। আমাদের সঙ্গে Carrom, wordmaking খেলা করেছেন দেখেছি। ফাল্‌তো ফষ্টি-নষ্টি করেছেন। সুখে ভক্তের সহিত আনন্দ করছেন। আবার তারই দুঃখে মাতৃসম সমবেদনা করছেন, তাও দেখেছি। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। পক্ষের পর পক্ষ। মাসের পর মাস। ঋতুর পর ঋতু। বৎসরের পর বৎসর। সবই ঘুরিয়া চলিয়াছে। আবার

ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের হাঁড়ির এই ভাতটি বেশ করিয়া টিপিয়া দেখিবার ভাগ্য, আমাদের হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র আধার। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আধার আমাদের। আমরা তাঁহার মহিমা মোটেই বুঝি নাই বলিলে, মৌখিক বিনয়, অতিশয় উক্তি প্রভৃতি দোষ মোটেই হয় না। যৎসামান্য বুঝিয়াছি, নিশ্চয়ই। তবে নিরাশ হই না। একদিন একটি বালককে অপর একটি ব্যাধিগ্রস্ত বালক মা তুলিয়া গালি দিলে এবং প্রথম বালকটি আকুল হইয়া কাঁদিয়া এই কথা তাঁহাকে জানাইলে তিনি সেদিন (আবার সেদিন বিশেষ শুভদিন—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মতিথির দিন) যেমন সেই শুভ সকালে এই বালকের বুকে আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া বুঝাইয়াছিলেন, উহাতে বালকের মৃতাগর্ভধারিণীর কোন কিছু হানি হয় নাই,—সেইরূপ তিনি তাঁহার অহেতুক করুণায়, দয়া করিয়া আমাদের বুকে মাথায় আমাদের চিরবাঞ্ছিত চির-পরিচিত তাঁহার সেই অদৃশ্য আশীর্বাদ-হস্ত বুলাইয়া—বুঝাইয়া দিলে, একদিন তাঁহাকে—তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্রীনরেন্দ্রকে আর তাঁহাদের মূলাধার শ্রীরামকৃষ্ণ—সারদাদেবীকে ষোল আনা, সম্যক্ বুঝিতে পারিবে। কাহারা ইঁহারা? কেন ইঁহারা? পৃথিবীর ভিতর কেনই বা আমরা ইঁহাদেব সঙ্গে?

স্বামী সারদানন্দ ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে জরজর হইয়া, দেহের অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতে করিতে, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেহ হইতে নাভিঃ শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সব চেতনবত্তা গুটাইয়া লইয়া, ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন। যেন একটি শয়ান ঘুমন্ত সিংহ। কিন্তু তৎপরক্ষণেই সঙ্গে সঙ্গে রোগেব ক্লান্তি জড়িমা সহসা দূর হইয়া শ্রীমুখমণ্ডলে যোগীর অপূর্ব সমাধি-শান্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বাক্‌রোধ হইয়া তেরদিন পড়িয়াছিলেন। জীবন-উপক্রমে, প্রথম প্রভাতে ভূমিষ্ঠ হইয়া একদিন সব শিশুরই মত তিনি "ম্যাঁ ম্যাঁ" করিয়াছিলেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, দেখিলাম—এই সুন্দর, শক্তিসাধক, কালীর তনয় শনিবার সন্ধ্যায় সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হইলেন হঠাৎ। শেষ যে শব্দ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইল, তাও শুনিলাম। "দুর্গা" "দুর্গা"। অবশ্য ঐ নামের ডাক্তারবাবুকে লক্ষ্য করিয়াই। জীবনের উপসংহার কি সুন্দর! মার নামে হে দেব-বালক! হে দেব-শিশু! তুমি একদিন ধরণীর বুকে এসেছিলে, মাতৃনামে জেগেছিলে। আবার খেলাশেষে মার নাম নিয়েই তুমি আর এক রাতে, তোমার কর্মক্লান্ত তপঃশ্রান্ত তনু মার বুকে ধরিত্রীর কোলে মিলিয়ে দিলে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আদর্শের, এই হিমাচলটির কথা ভাবিতেছি, মোহিত হইয়া

যাইতেছি। সম্পূর্ণ অহমিকাশূন্য ঠাকুর স্বামীজীর সোনার পাতে ঢাকা নীরব শরৎ মহারাজ।

দেহে যৌবনের উদ্ভব উদ্‌গম হইলে, সাধারণ নরনারীর জৈবধর্ম হিসাবেই বলো, আর যাই বলো মা বাপের উপর টান অনেকটা কমিয়া যায়। শৈশবের সেই আপনভোলা মা-পাগলা মাতোয়ারা মাতৃনামে সর্বশরীরে শিহরণ অনুভবকারী বালককে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বালক পূর্বের সেই আকুলতা লইয়াই ভোগক্ষেত্রে, সংসারে মতামাতি করেন। মার কৃপায় শরৎচন্দ্র যৌবনে মা ভুলেন নাই। তাই বুঝি বরষার বারিধারার প্রায় শরতের মাথার উপর মার এত করুণা! এত আশীর্বাদরাশি! আবার দেখাও যায়, তিনি বিরুদ্ধশক্তির সহিত লড়াই আজন্ম করেছিলেন। তিনি যেন "পৌষ-আকাশে শারদ চাঁদিমা"। পৌষ মাস শরৎচন্দ্রের জন্মমাস। তিনি অঘটন-ঘটন।

তাঁহার থুৎনীটা খুব ভারী ছিল। আন্তরিক দৃঢ়তার বাহ্য লক্ষণ। সুন্দর ব্যঞ্জনা। যখন বেলুড়মঠে চিতায় পুড়ছেন, ঝড় বৃষ্টি হ'তে লাগলো। মাঝে একবার মনে হল, বুঝি চিতা নিভে যাবে। কিন্তু চিতা ঠিক ধূমায়িত রহিল। আগুন দেহ থেকে গেল না। সব বাধা শেষবার মানিয়া লইয়া, তিনি যেন শুইয়া শুইয়া জীবনের শেষ লড়াই লড়িলেন। আগুন একেবারে নিভিল না। দমিল না। তিনি পুড়িলেন। পুড়িয়া আমাদের সামনে ছাই হইলেন। পোড়াতেও যেন সুন্দরভাবেই তাঁহার দেবোপম সত্তার দৈবীসম্পদ শ্রীরামকৃষ্ণ করুণা করিয়া আমাদের দেখাইয়া দিলেন। কাঁদিলাম—কিন্তু ভাবিয়া মোহিত হইলাম।

ভাবনয়নে একদিন দক্ষিণেশ্বরের ভগবান—তাঁহার ভগবান, তাঁহাদের দুই ভাইকে ঈশার পূতসঙ্গে সংযুক্ত দেখেছিলেন। বাস্তবিকই খৃষ্টের পূর্ববর্তী অপর এক ঋষির সহিত তুলনা করিয়া তাঁকে বাইবেলের ভাষায় আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, হে সখা, তোমার মহাত্মা জোবের (Job) মতই ধৈর্য ছিল। অমন সইতে কাউকে দেখিনি। Thou hads't the patience of a Job !—এ উক্তি অসমীচীন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাববাহিগণের কয়েকজন

কি দিনই না উদ্বোধনে পাইয়াছিলাম! ঠাকুর ঘরে মা। পরনে গেরুয়া নাই, গলায় রুদ্রাক্ষ নাই। সচরাচর চোখে পড়ে বাঙালী বিধবার মত মুখে কপালে চন্দন চর্চিত চিহ্ন নাই। কালী বা কৃষ্ণ নামের নামাবলী অঙ্গে নাই। হাতে হাঙ্গরমুখো বালা দুগাছি। পরনে নরুনপাড় ধুতি। সাদাসিধে। যেন বাঁকুড়া জেলার কারুদের বউমা-টি। শরীরে বাইরের একটা মাদকতাকারী রূপের স্পর্শ নাই। মা শ্যামা।

ভোর তিনটে থেকে চারটের মধ্যে, নিত্য বারমাস সব ঋতুতে শয্যাত্যাগ। প্রাতঃকৃত্য অন্তে ঠাকুরকে শয়ন হইতে উত্তোলন, বাল্য ভোগ দেওয়া, নিজ হাতে রোজ ঠাকুরঘর মোছা, ঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়া, সকাল-সন্ধ্যা জপে বসা—ইত্যাদি সবই একে একে মনে পড়িতেছে—অন্ততঃ ঠাকুরঘরের সব কাজ নিজ হাতে কলিকাতাতেও করিবার তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। মাকে দেশে, কলিকাতার মত,—শরৎমহারাজের হেফাজতে থাকিতে হইত না। সেখানে তিনি পিত্রালয়ের ঝিউড়ী। গ্রামের বালিকা। নিজ হাতে কুটনো কুটে, বাটনা বেটে, দুধ মেগে এনে, ছেলেদের 'চা' পর্যন্ত খাইয়েছেন। কলিকাতাতে এই পল্লীবালার যে, কৃত্রিমতার দরুন খানিক অসুবিধা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এখানকার উদ্বোধনের আধখানি উদ্বোধন—(সাম্‌নে দিকের) তখন। যেন একটি পাখীর ছোট বাসা। ছোট্ট বারান্দাটি চিকে ঘেরা। আলো বাতাস কম। জয়রামবাটীর মত ফর্‌দা ফাঁক উন্মুক্ত নহে। বাড়ীসুদ্ধ ঠাসা লোক। দোতলা তে-তলায় পুরুষদের একরকম ওঠা নিষেধ। উদ্বোধন-সম্পাদক নীচের ঘরে সম্পাদকতা করেন। রবিবার সাম্‌নে (তখন খোলা মাঠ ছিল) মাঠময় লোক,—দুই রোয়াকে লোক। আর বাড়ীতে—গিস্‌গিস্ ঠাসা! থৈ থৈ! উপরে মেয়েরা। আশি সত্তর জনকে রবিবার রবিবারে, বৈকালে হাতে হাতে মিষ্ট প্রসাদ দিয়াছি। এক এক দিন পঁচিশ-ত্রিশজনকে মা দীক্ষা দিয়েছেন।

কলিকাতায় গৃহ-কর্ম নিজহাতে তাঁর করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, শরৎ-মহারাজের ভয়ে, গোলাপ-মা যোগীন-মার ভয়ে, বেশী কর্‌তে সাহস করতেন

না। বয়সে তিনি গোলাপ-মা, যোগীন-মা—এদের ছোট ছিলেন। মনে হইত, গোলাপ-মা বা যোগীন-মা—যেন শাশুড়ী—আর মা তাঁদের অধীনা বউ-মা। আ-গঙ্গার দেশের লোক তিনি—উদ্বোধনের ছাদ হইতে গঙ্গা, দক্ষিণেশ্বর মার মন্দির দেখা যায়। তিনি সুস্থ থাকিলে, বাত বেশী চাগান না দিলে, নিত্যগঙ্গাস্নান করিতে পারেন,—ইহাই ছিল তাঁহার কলিকাতারউপর আকর্ষণ। মার দেহান্তর পর—একদিন সারদানন্দ মহারাজ বল্‌ছিলেন,—আমার সাধ মিটে গেছে। ধার ক'রে উদ্বোধন করেছিলাম, (জায়গাটুকু দান, খড়ের ব্যবসায়ী কেদারবাবুর)—ধার শোধ হয়েছে। আর এতকাল, মধ্যে মধ্যে কখনও বেশী দিন, কখনও অল্প দিন, মা এখানে বাস করেছেন।

মায়ের আমলে উদ্বোধনে বিজলী বাতি ছিল না। কেরোসিন পুড়িত। বিজলী থাকিলে, সোনায় সোহাগা হইত। কারণ মায়ের সুন্দর জ্যোতির্ময়ী অলৌকিক শান্ত অধ্যাত্ম জীবনের ভাস্বরতা ত' ছিলই।

পূজা নিজে শেষ করিয়া বা যখন নিজে না করতেন, পূজা সাঙ্গ হইলে—কয়জন ভক্ত নীচে আছে, তা একটি বালককে গণিয়া আসিতে বলিতেন। শাল পাতায় করিয়া ঠাকুরের মিষ্টি, ফলমূল, প্রসাদ ভাগা ভাগা সাজাইয়া দিতেন। কালো বড় একখানি বারকোষের উপর ঐগুলি চড়াইয়া, বালক বিতরণ করিত। শেষে ব'লে দিতেন,—এইটি মোহনের ছেলেকে দিও। মায়ের পুরাতন চাকর মোহিনীর একমাত্র শিশুপুত্র। অত ভিড়ের ভিতর দেখিতাম—কোনদিন মা তাহাকেও ভুলিতেন না। মার সবদিকেই নজর।

প্রসাদবিতরণকারী ঐ বালকটিকে একদিন, তাহারই কোঁচড়ের কাপড় নিজে খুলিয়া, কতকগুলি আম বাঁধিয়া দিয়া, বালিকার মত বলিতেছেন,—"যা বাবা, খপ্ ক'রে নীচে নেমে বাড়ী চলে যা'। দেখো, সাবধান, গোলাপ না দেখতে পায়। দেখতে পেলে, আমাকে বকবে।"

ছেলেটি তখন রবিবার রবিবার তাহাদের কলিকাতার বাটী হইতে আসিত। তারা গরীব। ভাল খাইতে পাইবে বলিয়া, মার নিকট আসিত। ছেলেটি উপরন্ত মাবাপ-খেকো। মার—তার উপরেও কি করুণা! আবার সর্বাধিষ্ঠাত্রী হইয়াও, গোলাপ-মার সম্বন্ধে কি মধুর ভয়।

মাকে জয়রামবাটীতে দেখিবার ভাগ্য আমাদের হয় নাই। ভক্তমুখে শুনিয়াছি, সে মা নাকি আরো মধুর! আরো দরদ-কারিণী!—আরো আপনার! যাই হোক, কল্‌কাতাকে তবে আর আমরা ঠাকুরের ভাষায়

'এ দোপড়া' বলিব না। কারণ, ইহারই উপকণ্ঠে অনেককাল ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করিয়া, ইহার হাওয়া শুদ্ধ করিয়াছেন। মা অনেককাল ছিলেন। কলিকাতা আমাদের কৈলাস। কাশী।

শ্রীমার আশীর্বাদপ্রাপ্ত ললিতের কথা কহিব। তাঁহার দেহ যাইলে স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, ইদানীং মার কৃপায় উহার কি সুন্দর পরিবর্তনই না হইয়াছিল। মার খুড়ো যখন মারা যান তাঁকে ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। রামকৃষ্ণ লেনের সাম্‌নে সদর রাস্তার উপর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। কি একটা কাজের জন্য খানিকটা ফালির দরকার হয়েছে। ললিত একখানা নূতন দেশী কাপড় পরিয়াছিল। ঝট্ কোরে তার পাড়টাই ছিঁড়ে দিল। জয়রামবাটীর ডাক্তারখানা, মন্দির, পাঠশালা ইত্যাদিব জন্য মাব কত কাজ করেছে। নিজের শরীর খারাপ। মোটেই ভ্রূক্ষেপ কর্‌তো না। রোদ-টোদ কিছু কেয়ার করত না। কত লোকের সঙ্গে কাজের জন্য দেখা করতো। কত খাটতো।

ললিত আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, পূর্বে তাঁহার পানদোষ ছিল। মা সব দোষ দূর কর্‌লেন। মা নিজে তাঁর বাটী গিয়া তাঁকে দীক্ষা দেন। মার দেহ যাইলে, তাঁহাকে ঠাকুরঘরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বালকের মত ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে দেখিয়াছি। যেন বুকে বেঁধা যন্ত্রণায় Shooting Pain-এ ছট্‌ফট্ করছেন। মা বিহনে ঠিক ঠিক—অনাথ বালক।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে জাগ্রত নিখিল নরনারী, আসুন! আমরা মার জীবনের এই সব ছোট ছোট ঘটনাগুলি জানিয়া মার মতন কিছু কিছু হইতে সচেষ্ট হই। সভায় সাধু সেজে বসে থাকা নয়। জীবনের দৈনন্দিন প্রতি ক্ষুদ্র কাজে, মার আদর্শ, মার দৃষ্টান্ত সাম্‌নে রাখতে হবে। শুধু হাউ-হাউ ক'রে ভাব-প্রবণতা দেখালে চল্‌বে না!

তে-তলার ঘরে গোলাপ-মা, তাঁর কাজ কর্মের—যথা কুটনো কোটা, রান্নার খাবার ব্যবস্থা, ময়লা ধুয়ে রোদে দিয়ে রাখা, অবসরসময় সুপারীকুচুনো ইত্যাদি সব খুঁটিনাটির উপর শ্যেনদৃষ্টি—সুন্দরধারা—পাকা গিন্নীর অনুপম পদ্ধতি।—তিনিই সেই শোকাতুরা ব্রাহ্মণী—যাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রাজরাণী একমাত্র কন্যার শোক ভুলাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে এক খোরা মোহনভোগ ঠাকুরকে একদিন খাওয়াচ্ছেন, আর সাদা চোখ দেখছেন, একটা সাপ লক্ লক্ ক'রে ভিতর থেকে উঠে, আহার টেনে নিচ্ছে। যতদিন সুস্থ সবল ছিলেন, ততদিন দিনের বেলায় ও রাত্র নয়টা

পর্যন্ত যোগীন-মাকে এখানে দেখা যাইত। তিনি কর্মে, জপে, পূজায়, ব্রতাচরণে নিষ্ঠায়, শাস্ত্রপাঠে,—বাংলাদেশের রমণী-চরিত্রের, সীতা সাবিত্রীর স্মৃতিপূত ভারতে, একটা অত্যুজ্জ্বল অধ্যাত্ম দৃষ্টান্ত। পাকা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে, ডানহাতি ঘরে রাত্রে শরৎমহারাজ। নতুবা, দিবাভাগে নীচের ছোট বৈঠকখানটিতে শরৎ মহারাজ। মধ্যে মধ্যে, ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী, মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজ (যিনি একবার অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন ছিলেন), প্রেমানন্দ মহারাজ, সুবোধানন্দ মহারাজ প্রভৃতি আসেন যান। মাকে প্রণাম করেন। কয়েকদিন বা এইখানেই থাকেন,—মা না থাকিলে, দেশে গেলে—বাড়ী খালি থাকিলে। পীড়িত অবস্থায় স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ এখানে কয়েক মাস (কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিত, ডানহাতি ঘরে) খাটের উপর অবস্থান করেন। পূজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজ (১৯১৭) কালাজ্বরে পীড়িত হইয়া এখানে কিয়ৎকাল চিকিৎসিত হন। শ্রীস্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাধনা-কর্মময় পুণ্যদেহ এই মার বাটীতে অসীমে বিলীন হয়। মার। শরৎ মহারাজের। যোগীন-মা, গোলাপ-মার দেহ এইখানেই যায়। এখানে যে সাধুভক্তদের ঘন ঘন আগমন আবাল্য দেখিব, তাহা আর বিচিত্র কি? আবার মায়ার এমনি লীলা, কলিকাতা সহরের এই পল্লীর এই লেনের আগে, এই মার বাটীর পাশেই, সন্ধ্যা হইতে না হইতে, অবিদ্যামায়া তাহার মোহনকারী জাল বিস্তার করিয়া থাকিতেন। ভায়ে ভায়ে এই পথে যেতে একটু সঙ্কোচ বোধ হইত। উপায় ছিল না।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভক্তদের এই তীর্থক্ষেত্রে যে কয়েকটি সুন্দর জীবন দেখিয়াছি, আদর্শ বুঝিবার—এবং জীবনে যাপন করিয়া ধন্য হইবার সুবিধা হইবে বলিয়া, আমরা এখানে তাহার কিছু কিছু বিবৃতি করিব।

ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই শরৎচন্দ্রের আমহার্স্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সঙ্গমস্থলে অধুনা-ধূলিধূসরিত দোমহলা বিরাট পৈতৃক বাটীতে গিয়া, নরেন্দ্রনাথ পরিচয় করিয়া শরচ্চন্দ্রকে জানাইয়া দেন যে, দুইজনে বন্ধুত্ব প্রাক্তন ও নিগূঢ়। তখনও দুইজনে সন্ন্যাসী হন নাই। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গঠন করিয়া, নরেন্দ্রনাথ স্থূলে মণ্ডলী পরিত্যাগ করিলেন। বাসুকীর মত, জগতে এই যুগভাবধারা, এই যুগধর্ম, যাঁহারা জীবন দিয়া কর্ম দিয়া ধ্যান সমাধি দিয়া মাথায় রাখিয়াছিলেন এবং পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা বিরাট বিশিষ্ট স্থান কলিকাতাবাসী পুণ্যশ্লোক গিরিশ চক্রবর্তী মহাশয়ের জ্যৈষ্ঠ পুত্রের।

নেতাকে কেমনতর হতে হয়, তাহা সারদানন্দ মহারাজকে দেখিয়া বুঝিয়াছি,—মুগ্ধ হইয়াছি। 'হাম্‌কে' চাপিতে খুবই মজবুত দেখা যাইত। ইহা বিরল। সাধারণতঃ, অধ্যাত্ম দর্শনের কথা কহিতে গেলে দেখিয়াছি, বলতেন, ঠাকুর এমনি দেখেছিলেন। মা এমন দেখেছিলেন ব'লে যোগীনমার মুখে শুনেছি। স্বামীজী এমন দেখেছিলেন। মহারাজ এমন দেখেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে উপযুক্ত চালক দেখিয়া, ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁহারই নিকটে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। একেবারে গুরুবৎ। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন মহেন্দ্রনাথকে বলিতেছেন—"শরতের ভার, ঠাকুর আমার উপর দিয়া গিয়াছেন। ওর কুলকুণ্ডলিনী জেগেছে।" প্রত্যেক কাজটি স্বামীজীর কথা ভিন্ন শরচ্চন্দ্র করিতেন না। একবার শরৎকে বললেন, "কিরে মঠে (বেলুড়) বসে বসে খালি অন্ন ধ্বংসাচ্ছিস্! যা, ওপারে দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষা করে খেগে। আর ধ্যানধারণা কর্‌গে।" স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "তাই গেলুম। ওমা! দুতিন দিন যেতে না যেতেই, মঠে কার অসুখ করেছে—সেবা কর্‌বার জন্য লোকের দরকার। বলে পাঠালেন, শিগ্‌গির আয়। ফিরে এলুম।"

শরচ্চন্দ্র অসীম ধৈর্যসহকারে, স্বভাবতঃ সুরবিহীন, সেই অসীম ধৈর্যের একটু আধটু ছিটে ফোঁটা বিশিষ্ট ধীর বালককে গান শোনাচ্ছেন। বালক বলিল—"এই যে লাইনটা গাইলেন। তাতে কি কি পর্দা ব্যবহার করলেন বলুন। আমি লিখে নি। মনে রাখবার, শেখবার সুবিধা হবে।" জবাব দিলেন, "আমি তোমাদের মতন সা-রে-গা-মা সেধে গান শিখিনি। স্বামীজী, গলা দিয়ে যেমন শেখাতেন, ঠিক তেমনটিই শিখেছি। আর তার একচুলও এধার ওধার এখনও আমার হচ্ছে, ব'লে মনে হয় না। তুমি হারমোনিয়াম টিপে কি কি পর্দা লাগছে, পারতো, মিলিয়ে ঠিক ক'রে নাও।"

"মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কান খুব ভাল ছিল। আমি স্বামীজীর কাছে শিখে নিয়ে, ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা, মহারাজের কাছে এক্‌জামিন দিতুম। তিনি অনুমোদন যতক্ষণ না করতেন, ছাড়তুম না।"

শরচ্চন্দ্রের দেখিতাম, যেন সব মাপকাটিই স্বামীজী। লোকটিকে এক এক সময় স্বামীজীময় বলিয়া বোধ হইত।

একদিন ঐ বালককে বলছেন—"কিরে, সিন্ধুড়া সুর শিখছিলি নাকি?"

বালক বালকোচিতভাবে বললেন—“আপনি কি ক'রে জানলেন ওটা সিঙ্গুড়া ?” উত্তর হাসিমুখে—“আমরা নিজেরা না জানলেও স্বামীজীর মুখে শুনেছি।”

স্বামীজীর বই পড়লে ছেলেদের কল্যাণ হবে। বিশ্বাস করতেন। পড়তে বলতেন। বাঁকুড়া কলেজের একজন পাশ্চাত্য অধ্যাপক চটে একবার একখানা চিঠি লিখেছিলেন। সম্পাদক সারদানন্দের কি অধিকার আছে জগৎবিখ্যাত স্বামীজীর ইংরাজী পুস্তকের ভাষার উপর হাত দিবার ? উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের দুই সংস্করণে (সম্ভব—কর্মযোগ—ইং) তফাত অনেক। সারদানন্দ দেখিতেছি যেমন ইচ্ছা কাটিয়া ছাঁটিয়াছেন।

শরচ্চন্দ্র বললেন, “এ চিঠির কোন জবাব দেবার দরকার নেই। তবে তোমরা জেনে রেখো, তাঁর লেখা যথা যেমন ইচ্ছা কাটিয়া ছাঁটিয়া ছাপাইবার অধিকার স্বামীজী আমাকে দিয়া গিয়াছেন।” উত্তরকালে এই শরচ্চন্দ্র অনেক-কাল লেখাপড়া পরিত্যাগ করিবার পর ১৯২৬ সালে, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রথম কন্‌ভেন্‌শনের সময়, একটি ইংরাজীতে প্রবন্ধ নিজহাতে লিখিলেন। তখন তাঁর লিখিবার সময় হাত একটু একটু কাঁপা শুরু হইয়াছে। লেখা শেষ হইবার কয়েকদিন পরে একদিন মাধবানন্দকে ডাকাইয়া সটান বলিলেন, “ওহে অনেক-দিন আর লেখা অভ্যেস নেই। এটা তুমি নিয়ে যাও। এবং correct সংশোধন করে পাঠিয়ে দিও।” ছোট ঘটনা—আপাতদৃষ্টিতে সামান্যই। কিন্তু শরৎচরিত্রের একটা বিশিষ্ট দিক্ ইহা হইতে উঁকি মারিতেছে। ইহা স্মরণ করিতেছি আর মনকে বলিতেছি, রে মন ! আর সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকে যে যেথায় আছো, হে নবীন, হে প্রৌঢ়, হে প্রাচীন, এটি শোনো। এবং শেখো। স্বামী সারদানন্দ মনে প্রাণে জানিতেন কর্তা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীমা সারদা। একটি শিক্ষিত বালক একটি ততোধিক বালকের সঙ্গে বচসা করে শ্রীশ্রীমার বাটী খাওয়া ছাড়িয়াছিল। কথাটা কর্তা সারদানন্দের কানে গেলে বললেন, ও ছোঁড়াটা তো মস্ত আহম্মক। মার প্রসাদে আমাদের সকলেরই সমান অধিকার আছে। কেউ কাউকে 'পাবে না' বলতে পারেন না। অনধিকার।

একদিন একজন খুদে কর্তাববুদ্ধিসম্পন্ন 'কর্তা' একটু বেহেড্ রকমের কাণ্ড করাতে, রসিক শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজ বলেছিলেন—ওরে এই কর্তা কোথায় রবে “সেই কালাকালের কর্তা” এলে ? ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের আলেখ্য অবশ্য ঝুলিতেছিল।

ইঁহারা আর একজনকে দেখিয়ে দিয়ে, নিজেকে অহমিকাবোধ থেকে রক্ষা করতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীকে দেখিয়ে দিতেন। আমার আশীর্বাদ কিরে! বলবি—মা কালীর কৃপায় এমনতর হলো। মা কালীর আশীর্বাদে। আর একান্তই যদি ওটা বলতে চাস, তো মনে মনে বলবি। সাধু যোগানন্দকে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা হইল। মোহিনীমোহন মণ্ডল কেরোসিনের একটি লণ্ঠন লইয়া গিয়া উদ্বোধনের ঠাকুরঘরে দিলেন। মোহিনী মার চাকর। ছেলেবেলা থেকে আশ্রয়ে আছে। স্বামী সারদানন্দ ও যোগীনমাকে বলিতে শুনিয়াছি—ও চোর নয়। খাঁটিলোক। মোহিনী ঠাকুরকে মারবেলের মেজেতে মাথা নত করিয়া একটি প্রণতি ঠুকিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। মা পা ছড়াইয়া বসিয়া পাঁচজন মহিলা ভক্তের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। বালিকার মত মুখচোখে সরলতা ফুটিয়া উঠিল। সন্ধ্যার আলো দেখিলেন। সচকিতে সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিক্ষণে হরিনামের মালা হইতে আঙুল বাহির করিয়া লইয়া, মালা কোলে রাখিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন—"জয় গুরুদেব! জয় গুরুদেব!" বলিলেন। মা সব সময় নয়, অধিকাংশ সময় ঠাকুরকে দেখাইয়া দিতেন। সারদানন্দ স্বামী কাহাদের দেখাতেন তাহা তো ইতিপূর্বেই বলিয়াছি।

স্বামী সারদানন্দের চরিত্রে সবগুলিকে মিলাইয়া পরিপূর্ণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিমা গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য ছিল। তিনি অনেক কিছু হজম করিয়া সংশোধন করাইয়া দিবার ক্ষমতা বুকে ধারণ করিতেন। যেহেতু ঠাকুর মায়ের যন্ত্ররূপে নিজেকে দেখিতে পাইতেন।

বিশ্বাস হয় না, ইঁহাদের সূক্ষ্মশক্তি রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। বহুত্বে একত্ববুদ্ধি কার আছে—আমরা তোমাকে বা তোমাদিগকে বা আমাদের মধ্যে কে আছে তাহাকে বা তাহাদিগকে আকুল হইয়া আহ্বান করিতেছি এসো হে, কোথা সেই মাতৃযজ্ঞের দেব ঋত্বিক্? সত্যি—অতি সত্য —একমাত্র সত্য—আমাদের কর্ণধার শ্রীরামকৃষ্ণ। শক্তি একমাত্র তাঁরই। তিনিই ধরিবেন। ধরিতেছেন। ধরিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসীকে ইহা একদিন শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। তুমি আমি, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ উপলক্ষ্য মাত্র।

মাদাম ফোলের যে উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা খুবই সুষ্ঠু এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারার অন্তর্নিহিত গুপ্ততত্ত্বেরই আত্মীয় ভাব বলিয়া আমাদের ধারণা। তাই সযতনে উহা উদ্ধার করিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ প্রতীক স্বামী সারদানন্দকে বারো বৎসর কাছে থাকিয়া ও দেখিয়া মনে হচ্ছে, যেন বারো দিন। ফস্ ক'রে কেটে গেলো। ধরা-ছোঁওয়া যাচ্ছে না। এখন জাবর কাটতে হচ্ছে সেই স্মৃতি নিয়ে। অধ্যাত্ম শক্তির কি অনির্বচনীয় মহিমা। মনে হইতেছে যে, জীবনের ঐ গুলিই চমৎকার দিন! মাতৃহারা গাভীকুলের মত ভক্তবৃন্দকে আর কতকাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পৃথিবীতলে ঘুরাইবেন, তাহা তিনিই জানেন। ব্যক্তিগত কথা বলিতেছি, তাহার একটি গভীর অর্থ আছে। সাধারণতঃ আমরা সব এমন লোক যে, বেশীকাল যে ব্যক্তিই আমাদের সঙ্গে থাকেন তিনিই ঘনিষ্ঠভাবে হয়ত আমাদের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের উপর হাড়ে চটিয়া, বিরূপ হইয়া ছাড়িয়া চলিয়া যান। আর কাছে ঘেঁষতে চান্ না। বলেন, কাছে মিশে দেখলুম— মুখে মধু। অন্তরে গরল। আরে ছ্যা—ছ্যা। এমনই মহিমা আমাদের! আর যাঁহাদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করিতে বসিয়াছি, এই সামান্য কথাটার দিক দিয়ে কতই না তফাত—আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের। অবশ্য তত্ত্বতঃ আমরা যদিও সকলেই পূর্ণ ব্রহ্ম!

'বুড়ী'—শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তবে ভাল খেলা খেলতে ত্যাগী বালকবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। রেখেছিলেন। খেলা সাঙ্গ করিয়া এক-একটি খেলুড়ে আবার যেই সেই বুড়ীকে ছুঁইয়া, তাঁ'তে লয় হইতে চলিয়াছেন—অপর বালকবৃন্দের সতীর্থ-বিহনে কষ্ট হইতেছে। লীলায় ইহা হইতে নিষ্কৃতি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের পদঃপূত বলরাম মন্দিরের হলঘরে ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী মহাসমাধি লীন হন (১৯২২)—সে দৃশ্য অপরূপ দৃশ্য! মনে হইতেছে যেন, শিব শুইয়া আছেন। বুকের উপর হাত দু'খানি জোড়া। যেন, অভীষ্ট ব্রজরাজকে প্রণাম জানাইয়া, জুড়াইতে—জড়াইতে—আলিঙ্গন করিতে চলিয়াছেন। আগের দিনের ব্রহ্মানন্দ স্বামীর ভাবস্থ মহাবাক্যাবলীর সবকথা শরৎ মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন। করজোড়ে ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে বিদায় বেলায় রাখালরাজের অভয়বাণী শুনিয়াছিলেন।—"ওরে শরৎ, তুই ব্রহ্মজ্ঞানী, তোর ব্রহ্মজ্ঞান আমায় একটু দে।" স্বভাবজ গাম্ভীর্য ও চাপা ভাবকে ভাবের রাজার সামনে ঠেকাইয়া রাখিতে শরৎমহারাজ অক্ষম হইয়াছিলেন। রাখাল বিহীন হইয়া, কেমন ক'রে জীবন ধারণ করিব, ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। সুরধুনীর ধারা দু'চোখে প্রবাহিত হইতেছিল।—"ওরে শরৎ তুই, থাকৃতে আমার এই হ'ল?"—বাণীটি বুঝিয়া উঠিতে, পরেও পারেন নাই।

বাবুরাম মহারাজও বলরাম মন্দিরে একই হলঘরে ইহার পূর্বে তনুত্যাগ করিলেন। বাড়াবাড়ির খবর পৌঁছিবামাত্র, শরৎচন্দ্র ছুটিয়া গেলেন। বাবুরাম তখন বাক্‌শক্তিহীন। (১৯১৮) ব্রহ্মানন্দ মহারাজ হল কাঁপাইয়া কানের কাছে চীৎকার করিলেন—"বাবুরামদা, ঠাকুরকে ভুলো না।" পুনঃ পুনঃ কয়েকবার বলিলেন। বাবুরামদা' হাসিলেন। সঙ্গীহারা হইতে হইবে ভাবিয়া সেদিনও, আদরের বাবুরামের জন্য সকলের সঙ্গে—রাজা মহারাজের সঙ্গে—শরৎচন্দ্র কাঁদিলেন। চাপিতে পারিলেন না। খালি যোগীন-মার বেলা, নিজে "পূর্ণমিদং" —বেদমন্ত্র শিয়রে শুনাইলেন। চোখে সকলের সামনে ঠিক সেই সময় জল পড়িতে দেখা যায় নাই, তবে একটু পরে দেখিলাম, গায়ের সাদা পাঞ্জাবিটির বুকপকেট হইতে রুমালখানি বাহির করিয়া, বার বার, ঘন ঘন মুখ মুছিতেছেন। তিনি বড় চাপা ছেলে ছিলেন।

মোটা কথায় আছে, "জপতপ কর কি? মরতে জানলে হয়।" রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকিত কয়েকটি জীবনের তিরোভাবের কথা কহিলাম। লোভনীয় দেহত্যাগ—অনেকগুলিই স্বচক্ষে দেখা।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর কাছে কাশীতে, শরৎ মহারাজ আহ্লাদের সহিত বলছেন, —(সনৎ মহারাজ প্রমুখাৎ)—"দেখ,—মা যে আমাকে অত ভালবাসেন, তা ভাই, আগে বুঝিনি। শেষ অসুখের সময়, একদিন গায়ে খুব জ্বালা হয়েছে। কাপড় ফেলে দিচ্ছেন। ছটফট্ করছেন, আর বলছেন—শরৎকে কোলে করে নিয়ে, আমি এখুনি পালিয়ে যাব। তোদের কাছে আর থাকবো না। (অর্থাৎ উদ্বোধনে ঠাকুরঘরে) তবে শরৎ যদি আপনি নিজে খাইয়ে দেয়, খাবো। তোদের কারুর হাতে নয়।"

এইদিন শরৎমহারাজ জীবনে বোধহয় প্রথম, মাকে নিজ হাতে খাইয়ে ছিলেন। আর তাঁর থপথপে ঠাণ্ডা বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে, মা তাঁর জ্বালাময়ী তনু শান্ত করেছিলেন।

কিন্তু একটি কথা এখানে বলি, বুঝবেন শরৎচন্দ্র—কি দুর্লভ সংযমী ছিলেন, কি মানসিক তন্তুতে গঠিত ছিলেন। বুঝবেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-আদর্শ সেবীর কিরূপ হওয়া উচিত। বৈদিক প্রার্থনায় আছে—হে পরব্রহ্মন্, আমার চক্ষু যেন, তোমার কৃপায় সায়েস্তা থাকে। যথা তথা অসংযত ভাবে না তাকায়। মা—ঠাকুরের আমলের মহারাজেদর সামনে ঘোমটা দিতেন। যেই খবর দিলুম, মা, মহারাজ (শরৎ) প্রণাম কত্তে আসবেন কি? বল্লেন—খাটের

ওপর বসে, হাঁটু ঝুলিয়ে—"হ্যাঁ বাবা, ডাকো। ও নলিন (তাঁর ভাইঝি) চাদরটা দেতো, মা।" কাপড়ের উপর চাদর চড়াইয়া ঘোমটা দিলেন। মা-টি যেন তখন পাড়া-গেঁয়ে বউমা-টি। শরৎ মহারাজ মিনিট পাঁচ ধরে, পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম কল্লেন। সে কি দীর্ঘ শ্রদ্ধা নিবেদন! হৃদয়ের সহিত জীবন্ত প্রতিমার পূজা। মাটির দিকে চেয়ে, রাধু প্রমুখ মার সাঙ্গোপাঙ্গদের সব খুঁটি-নাটি সংবাদ নিলেন।—কার জন্যে কাপড় কিনতে হবে, কার জন্যে ডাক্তার আনতে হবে। ইত্যাদি। আর মা আলতো আলতোভাবে আস্তে আস্তে সব কথার, দুএক কথায়, সাঁটে সাঁটে, জবাব দিলেন। আবার পিছু হটিয়া বিরাট বপু সারদানন্দের ঠাকুরঘর হতে বহির্গমন। সঙ্গে সঙ্গে মার ঘোমটা সরে গেল। আমরা সব একে একে গড় করতে লাগলুম। এমনতর রোজ।

লাটু মহারাজ এবং বুড়ো গোপালদা, মার এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর গগনে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে লাটু, দত্তের চাকর হইয়া, ছোট হইয়া, জগদম্বার ইঙ্গিতে আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন—উদয় হইয়া ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহাকে চিনিয়া, আশীর্বাদের দ্বারা তাঁহাকে বিশ্বে বড় বানাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অঙ্গসেবা গাড়ু গামছা বহার অবাধ অধিকার শ্রীমৎ লাটুর ছিল। মা—বলরামবাবুর বাটীতে থাকিবার সময় নিজে খাওয়া শেষ হইলে, একবাটী দুধ ভাত হাতে করিয়া নীচের তলা হইতে লাটুকে ডাকাইয়া বলিতেন, এই নাও নাটু, খাও।—নিজহাতে দেওয়া মার নিজের প্রসাদ!

একদিন শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মার যে ছবি পূজা হয়, ও মূর্তিতে তাঁকে তো আমরা দর্শন করি নি। ইদানীং এর মূর্তিই (আমরা ১৯০৯ শ্রীশ্রীমার যখন ৫৬ বৎসর বয়স তখন হইতে) আমাদের মনে আঁকা আছে। কোন্ মূর্তি চিন্তা করতে হয়?

তিনি বল্লেন, তোরা যা দেখেছিস, তাই ভাববি। আমার কিন্তু ভাগ্যে একদিন ঐ আগেকার মূর্তি দর্শন হয়েছিল। সেটা সম্পূর্ণ অঘটন-ঘটন। সেন্ট জেভিয়র কলেজ থেকে বৃহস্পতিবার দক্ষিণেশ্বর যেতুম। একদিন আচম্বিতে (ঠাকুরের দেহ থাকিতে, মার ফটো তুলিতে দেওয়া হয় নাই)—দেখি, ঠাকুরের ঘরে, ঠাকুরকে ভাতের থালা ধরে দিতে এসেছেন—মা। নবৎ থেকে। (সিঁথেয় সিঁদুর। পরনে কস্তাপেড়ে লাল শাড়ী)—তখন সচরাচর

কারুর ভাগ্যে তাঁকে দেখা ঘটতো না। আমার সেই এক দেখাই, মনে মনে আছে। তাই—ভাবি।

শরচ্চন্দ্র একদিন বলেছিলেন, জানুক বা না জানুক, যে একবার মাকে দেখেছে, তার হয়ে গেছে। ঠাকুর ও মা, এক। তোমরা মাকে দেখেছো, তাঁর করুণা পেয়েছ। ঠাকুরকে দেখা হয়ে গেছে। পত্রে একজনকে বলছেন, তুমি মাকে গুরুরূপেই পেয়েছো। এখনও তাঁহাকে জগদম্বারূপে দেখো নাই। তাঁর কৃপায় একদিন দেখিবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, তাঁহার একটি বালককে একদিন বলিয়াছিলেন,—মাকে দর্শন ক'রে আয়। তাঁকে দেখলেই ঠাকুরকে দেখা হবে। মার জীবদ্দশায়, মার সম্বন্ধে নরেন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "মা ঠাকুরাণী যে কি বস্তু, তা আজও বুঝতে পারি নি, এখনও কেউ পারবে না; ক্রমে ক্রমে পারবে...মা ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন; তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।" ১৮৯৫-এ লেখা পত্র। নিছক যুক্তিবাদী এই অবতারতত্ত্বে যুক্তি দেখিতে পাইবেন না। তবে যুক্তির আবার সূক্ষ্মত্ব আছে। মোটা বিচার আছে। অধ্যাত্মজগতের যুক্তি,—আলাদা জগতের যুক্তি। তাহা মোটেই অযৌক্তিক নহে। তাহাই সূক্ষ্মযুক্তি। গভীর যুক্তি—ঠিক যুক্তি। তবে, অধ্যাত্ম জগতের যুক্তি। বুঝিতে হইলে দেহযন্ত্রকে সংযম ব্রহ্মচর্য পবিত্রতা ও গুরুবল সহায়ে অধিকারী, তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। গুরু অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া চাই। ((ঠাকুরের কথা বলিতে গিয়া বিবেকানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন—অধ্যাত্ম-শক্তির দুর্লভদান, জড় দ্রব্যের মতো, দেওয়া যায়। যদিও যখন যারা পায়, তখন হয়ত সবাই তারা, সে দানের দেয়ত্বটা টের পায় না। Although they who receive it. are not conscious of the gift. 'কিছু পেলাম' বোধ হয় না।))

সীতা হারাইয়া গেলে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন. "সীতা দেবীর পায়ে যে যে অলঙ্কার ছিল, সেগুলি আমার জানা আছে। অন্য কোন অঙ্গে কি কি ছিল, জানি না।"

মা লজ্জা করিতেন বলিয়া, শরচ্চন্দ্র তাঁর সেবাভার লইয়াও, তাঁর মুখের দিকে দীর্ঘকাল, এমন কি, দূর হইতেও কোনও দিন তাকান নাই। শেষ পীড়ার পূর্বোল্লিখিত ঘটনার দিন নিশ্চয়ই না—বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি। শরচ্চন্দ্রকে জীবনে কোনদিন মিথ্যা বলিতে শুনি নাই। ভাবিলাম, লক্ষ্মণ সত্য। কারণ—শরচ্চন্দ্র সত্য। বেশী কিছু মাকে নিবেদন করবার

দরকার হ'লে, যোগীন মাকে দিয়ে বা অন্য সেবিকাকে দিয়ে বলে পাঠাতেন।

একবার অম্বিকানন্দ স্বামীর রামকৃষ্ণ-বিলীনা মাকে—স্বপ্নে মা রামকৃষ্ণপুরে বলছেন—"বউমা, গুল্ খাবো। তোয়ের করে শরতের ওখানে, দিয়ে এস।" (তখন, মা স্থূলে নাই।)

সারদানন্দ স্বামী বৃত্তান্ত শুনিয়া, অভিমান ও আনন্দের সহিত বলিলেন,—"বেটী ও-কথা আমাদের জানাতে পারলেন না!"

বাঁকুড়ার একজন শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত একটি সভায় একদিন সর্বসমক্ষে সুন্দর বর্ণন করলেন—এবার নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ। নর বা নরত্তোম—নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরেন্দ্র। দেবী সরস্বতী—মা সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"ও সরস্বতীর অংশ,—মহা বুদ্ধিমতী।" জ্ঞানদায়িনী, সার-দায়িনী—মা সারদা। তাহার পর ব্যাসদেব—স্বামী সারদানন্দ। প্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ যিনি জগৎকে শুনাইয়াছেন। এই সকল মহান্ আত্মার মৃত্যু নাই। বারে বারে প্রভু ভগবান্ লীলায় এই সব সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া আসেন। চারকাল আসেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া আসেন।

*　　　　*　　　　*

একদিন সন্ধ্যায় পীড়িত প্রেমানন্দ উদ্বোধন দোতলার ঘরে একখানি চৌকীতে শুইয়া আছেন। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে, তিনি সুস্থ অবস্থাতেও লাল হইয়া যাইতেন। তাঁহার স্বভাব-সুলভ ভাবপ্রবণতা আরও প্রকট হইত। শুইয়া শুইয়া, করজোড়ে ঠাকুরের দেওয়ালে টাঙানো ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে বলছেন শুনিলাম,—"ওরে হতভাগারা, আমাদের কি সাধ্য, আমরা কি নিজের চেষ্টায় সাধু হয়েছি? তিনি কৃপা করে এনেছিলেন। এবং কৃপা করে রেখে-ছিলেন বলে—হতে, থাকৃতে পেরেছি।" জিব শুকাইয়া আসিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভাবটি সেবক বালকদের মনে গাঁথিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিলেন—"কৃপা, কৃপা, কৃপা! ওরে বেটাচ্ছেলেরা, আবার বলছি, কৃপা! কৃপা কৃপা! পরীক্ষার ভয়ে ঠাকুরের কাছে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসি। এখন দেখছি, জীবনে প্রভু, প্রতি পদে পদে পরীক্ষা করেছেন। আর প্রতি পদে পদে প্রভুই রক্ষা করছেন।"

ভাবলাম, ইনি রিপুর অধীশ। রামকৃষ্ণদেব নিজমুখে বোলেছেন। তথাপি ইনিও এই কথা বলছেন! আরও—ইনি আকুমার সন্ন্যাসী। গোলাপ-মা যোগীন-মা সংসারকরা শ্রীরামকৃষ্ণের মহিলা ভক্ত। ইনি তাঁহাদের পায়ে সাষ্টাঙ্গ

হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন,—বলরামবাবুর বাটীতে দেখিয়াছি। জোড়হাতে বলছেন, ঠাকুরের পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়। মায়েরা তাঁকে প্রতি-নমস্কার করছেন ও বলছেন, "ও কি গো, বাবুরাম, তুমি বাপু অমনতর করো না। আমাদের অপরাধ হবে।" বাবুরামের দেহান্ত হলে, তাঁর এস্টেটের ভিতর খান দুই চার গেরুয়া বসন, একটি তুলার জামা ও একখানি আলোয়ান বাহির হইয়াছিল মাত্র।

বিনয়ের জীবন্ত মূর্তি! অপরূপ সুন্দর সুঠাম তনু; গায়ের রঙের সঙ্গে গৈরিক বসনের সোনালী লাল মিলাইয়া গিয়াছে। হাতের চেটো দুটি—গোলাপী লাল। পা দুটি যেন স্বয়ং প্রকৃতিদেবী কর্তৃক আল্তায় রাঙ্গানো। সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মত বেঁটে। তামার থালা হাতে করে, ঠাকুর পূজোর পর ফুল পাতা চন্দন লইয়া গঙ্গায় গঙ্গাপূজা করিবার জন্য—ঐগুলি ভাসাবার জন্য বেলুড় মঠের ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। মনে হচ্ছে, যেন স্বয়ং মা গৌরী!—ধরায় শিবের লীলা দেখতে নেমেছেন! দেবভোগ্য দৃশ্য। বাবুরাম মহারাজের অনন্ত কৃপায়—তাহা দেখিয়া—তাঁহাকে দেখিয়া মশ্‌গুল হইয়াছি।

আমাদের মনে হয়, শ্রী প্রেমানন্দের রূপ ও গুণের অনুধ্যান করিলে, আমাদের শরীরে কাম-রিপু মাথা তুলিতে পারিবে না। একটি পুরাতন মন্ত্রকে আমরা রূপান্তরিত করিয়াছিলাম—প্রেমানন্দের পূত অনুস্মরণে, "যত্র যত্র রামকৃষ্ণকীর্ত্তনম্। তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্॥ বাষ্পবারি-পরিপূর্ণ লোচনম্। বাবুরামম্ নমত কামান্তকং॥"

বাবুরাম মহারাজের ভালবাসার কথা বলিতে বলিতে, রামকৃষ্ণপুরের বৃদ্ধ রামলাল ডাক্তার বাবুকে, ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের লম্বা বেঞ্চের উপর বসিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া বালকের মত, কাঁদিয়া আকুল হইতে একদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছি। মুগ্ধ হইয়াছি।

আবার রসিকও ছিলেন খুব। উদ্বোধনে একদিন পরামর্শের জন্য, কোন গুরুতর সাংসারিক বিষয় সবিশেষ তাঁহার কাছে যোগীন-মা বর্ণন করলেন। তাঁর মন তখন ঈশ্বরীয় ভাবে ভরেছে, কান কোন কথা নিচ্ছে না! শেষে যোগীন-মা থেমে, সব কথা শেষ ক'রে বলছেন, "এখন তুমি কি যুক্তি দাও বলো, বাবা?"

তিনি বললেন, হাস্‌তে হাস্‌তে এবং করে জপ করতে করতে, "কি আর বলব, যোগীন-মা, হরি-হরি বলুন ? হরি হরি বলুন।"

*　　　*　　　*

কাকু বন্দো, কাকু নিন্দো ? তুরীয়ানন্দ আর একটি শ্রীরামকৃষ্ণের দুর্লভ কীর্তি। অত জ্ঞানী—অত তপস্বী। ললিত মহারাজ বল্‌লেন,—ভগবত সব শোনালুম, শেষে বালকের মত লাফিয়ে উঠে বলছেন—ও সব কিছুই নয়, দশম স্কন্ধ যা শোনালে। ভগবানের লীলা,—ওর আর তুলনা নাই। এ না হলে আশা মেটে না।"

তুরীয়ানন্দ মহারাজ দেহবোধ জয় করিয়াছিলেন। ক্লোরোফর্মে বেহুঁশ না হইয়া, দেহ হইতে সহজভাবে মন উঠাইয়া লইলেন। পুরীতে দেহ ডাক্তারদের হাতে যেমনতম ইচ্ছা, কাদার তালের মত নাড়াচাড়া করবার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। ভীষণ কার্বঙ্কল্ ক্ষত। ডাক্তারেরা সুগভীর ক্ষতে হাত পুরিয়া ড্রেস করিলেন। যেন কার গা—ত' কার গা! ধীর সহনশীল শরচ্চন্দ্র ভয়ে জড়সড় জোড় হাত,—ঠাকুরের নিকট প্রার্থনারত। সামনে দাঁড়াইয়া, দেখিয়া, বিস্ময়ে অবাক। প্রভুর লীলা-প্রসঙ্গের এও একদিক। তুরীয়ানন্দ সহাস্যে বললেন,—(ব্যাণ্ডেজরত ডাক্তার কাঞ্জিলালকে)—"কি কাঞ্জিলাল, বুকে কি বাবা, ভৃগুপদ-চিহ্ন ক'রে দিলে!"

এই সব দেখে শুনে একজন পুরাতন বাঙালী এল-আর-সি পি, লণ্ডনে শিক্ষা প্রাপ্ত—ডাক্তার, এস, বি, মিত্র অধ্যাত্মজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হবেন—তাহা আর বিচিত্র কি ?

যতদূর জানা আছে, তুরীয়ানন্দ বড় একটা দীক্ষা দেন নাই। কাশীতে একদিন একটি সেবককে বলছেন—"তুমি তো ভারি বোকা। বুঝতে পার্‌ছো না, এই সব লোক্—যারা এখানে আসে—তাদের, আমাকে—দিতে হচ্ছে।" অর্থ—সূক্ষ্ম অধ্যাত্মশক্তি তাহাদের কল্যাণকল্পে দান করতে হচ্ছে। শান্তানন্দকে তুরীয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, "জগৎকে আমার যা দেবার, আমার চিঠির মধ্যেই তা দিয়েছি।"

অবিশ্বাসের ভিতর দিয়া সবাইকেই অধ্যাত্মপথে ভ্রমণ করিতে হয়। আবার—বাস্তবিকই চোখের সামনে দেখিয়া—প্রথম বিশ্বাস হইল, অধ্যাত্মসাধন সত্য। দক্ষিণেশ্বরে মুহুর্মুহুঃ ভাবস্তিমিত দেহবোধ-তিরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেখিলাম ; সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ঐ

দেখা—বিস্মিত হইতে হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দের ন্যায় অসামান্য একনিষ্ঠ সিদ্ধ-সাধক। যাঁহাকে পাকা অবস্থায় একবার দর্শন করিলেই বোধ হইত, ভদ্রলোক বুকে করিয়া অধ্যাত্মআগুন বহিয়া চলিয়াছেন। একদিন সেই অগ্নির রক্তরোগের সুন্দর রক্তিম্ আভায় তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল আলোকিত—উদ্দীপিত দেখিয়া জীবন-যৌবন ধন্য হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—"তু-ভায়া বাল-ব্রহ্মচারী। জ্বলন্নিব ব্রহ্মতেজসা। ছিলেন নমো ব্রহ্মণে। হয়েছেন—নমো নারায়ণায়।" তাঁহারও বলিলেন, মার্কিনে কিছুদিন নাস্তিক জড়বাদী সাহিত্য পড়িতে পড়িতে বাংলায় প্রকট যুগেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের উপর ভীষণ সন্দেহজাল মনকে জড়াইয়া ধরিল। "কিছুদিন সব পড়া বন্ধ করিলাম। বেশী করিয়া অন্তর্মুখ হইলাম। ক্রমে মেঘ কাটিয়া গেল। তিনিই বুঝাইয়া দিলেন।"

হৃদয়গহ্বর হইতে সাধনাপ্রসূত যে আলোকধারা সমুত্থিত হয় তাহা সব গ্রন্থের গ্রন্থিত্ব কাটাইয়া দেয়। বিজ্ঞানময় কোষের পরের স্তরে—তুরীয়েরও পারে লইয়া যাইয়া, জীবকে সমাহিত করাইয়া ধন্য করে। কৃতকৃতার্থ করে।

হরি মহারাজ কলিকাতা বাগবাজার বসুপাড়া নিবাসী পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—চট্টোপাধ্যায়দের ঘর আলো করে এক পরম শুভক্ষণে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বাংলার নাট্যসাহিত্যের রাজা, নটগুরু—অসামান্য প্রতিভার আগার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের অশেষ কৃপাসিদ্ধ গিরিশচন্দ্রের বাটীর সম্মুখেই এই—চাটুয্যেদের বাড়ী। হরির মা হরির ছেলেবেলায় স্বর্গারোহণ করেন। তখন কলিকাতার এই অঞ্চল পাড়া গাঁ—পাড়া গাঁ গোছের ছিল। বিকাল ঘনাইয়া আসিলে শৃগাল ডাকিত। একদিন দাওয়ায় হরি শৈশবক্রীড়ারত। হঠাৎ সেই কালবেলায় একটি শেয়াল তাহাকে কামড়াইতে আসিল। মা কড়া নিয়ে রান্নাঘরের ভিতর রাঁধছিলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে, প্রাণের হরিকে বুকে করলেন। শেয়াল ছাড়িল না। প্রসূতিকে কাল-কামড় দিয়া চলিয়া গেল। এই ঘায়ের ফলে মা মারা গেলেন। হরি বলতেন, সত্য সত্য মা আমায় প্রাণ দিয়েছিলেন। নিজের প্রাণের বিনিময়ে।

কৈশোর হইতে হরি পরম আচারী—নৈষ্ঠিক ব্যক্তি ছিলেন। বউ দিদিদের হাতেও খেতেন না। স্বপাক—পঞ্চগ্রাস হবিষ্যান্ন। পঞ্চভূতের আহুতি। তখন তাঁহার লম্বা লম্বা কোঁকড়ানো কালো চুল মাথায় ছিল।

জেনারেল এসেমব্লীতে, স্বামীজীর কলেজের, স্কুল বিভাগে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়লেন। পাদরী সাহেবদের বাইবেল ক্লাস খুব ভাল লাগতো। ঈশার লীলা

আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেন। শুভকালে মনে বৈরাগ্যোদয় হইল। বুঝিলেন, যার যটা পাশ। তার তটা, পাশ। মনকে বললেন, কাজ নেই মন, লেখা পড়ায়। গৌরপদে তিনি গিয়া পড়িলেন। বুঝিলেন—নরেন্দ্র বিবেকানন্দ বুঝাইলেন—গদাধরই গৌর। নদের নিমাই কামারপুকুর আলো করে, কলিকাতার উপকণ্ঠে রাসমণির রমণীয় কালীবাটীতেই এবার কালীনামে মাতিয়াছেন। গৌর—নববেশে নূতন লীলারত। দীনুবোসের বাটী, বলরাম বোসের বাটী, বিশ্বাসী ভাব-ভৈরব নটরাজের আঙিনায়, ভগবান রামকৃষ্ণকে দেখেছেন—বোস পাড়াময়। কলিকাতার বাগবাজার পল্লীটি একহিসাবে রামকৃষ্ণময়। বাগবাজারের প্রতি রেণুকণা—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাধক-সাধিকার তীর্থ—পরম তীর্থ।

হরির মেজ দাদা প্রভুর চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাক্তার উপেনবাবু (যাঁর ডিস্‌পেন-সারীতে লাটু মহারাজ একবার অস্ত্রোপচার করান) আমাদের বল্লেন—বাবার বুড়ো বয়সের ছেলে—হরি। গঙ্গাযাত্রায় যাবেন। তাঁকে মায়াবদ্ধ করবার জন্য, ছোট ছেলের দোহাই পাড়িয়া, আমাদের বাড়ীর কে যেন তখন বল্লেন,—বাবা, হরি ছোট। হরিকে ছেড়ে কোথা যাবেন, বাবা? হরির জন্য আপনার মন কেমন করচে না? হরিকে কার হাতে দিয়ে যাচ্ছেন? হরি যে মাতৃহীন। মহাপুরুষের মহান্ পিতৃদেবতা বল্লেন—"বাবা, হরিকে আর কার কাছে দিয়ে যাবো? হরি জগতের। আর জগৎ—হরির।"

উত্তরকালের 'হরি মহারাজ' দেখিয়া ভাবিতেছি, বাবার শেষ কথায় ফুলচন্দন পড়িয়াছে। বর্ণে বর্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ করুণা করিয়া উহা সার্থক করিয়াছেন। হরি জগতের—জগৎ হরির। বাস্তবিকই সত্য সত্য—হরি জগতের—জগৎ হরির। দুনিয়া শ্রীহরি—শ্রীতুরীয়ানন্দের পদতলে। তাঁর শেষ সময়ের কথা—অপূর্ব ও বিচিত্র। সেবক সনৎকে সমস্ত ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিতে বললেন। গলিত ক্ষতের যাতনা পরিহার করিয়া, শ্রীহরি তপস্বী দধীচীর ন্যায় অকুতোভয়ে, "সত্যং জ্ঞানং আনন্দং অনন্তং ব্রহ্ম"—"জয় গুরু, জয় রামকৃষ্ণ"—বলিতে বলিতে নশ্বরত্ব বিমুক্ত হইয়া স্বরূপলীন হইলেন। শোকাতুর মুহ্যমান্ ভক্তগণকে চৈতন্যদান করিয়া, উদ্দীপিত করিয়া, প্রণবরূপ ধনুতে, ইন্দ্রিয়াদি শর সংযোজন করিয়া, অপ্রমত্ত সুরসৈনিক—ব্রহ্মবস্তুকে অমোঘরূপে বিঁধিলেন। রামকৃষ্ণের কৃপায় উপনিষদ, চক্ষের সমক্ষে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল, প্রতিফলিত হইল। জ্ঞানমূর্তি গুরু তুরীয়ানন্দ সকলকে চমকিত করিলেন।

যোগ্যের, যোগী-শ্বরের সুযোগ্য—জীবন-যবনিকাপাত। স্বামীজীর স্তুতি—হরিভাই ছিলেন নমো ব্রহ্মণে। হয়েছেন। নারায়ণায়। ব্রহ্মতেজের জ্বলন্ত পাহাড়।

*　　　　*　　　　*

আত্মলীন আত্মানন্দ মহারাজ এক সময়ে উদ্বোধনে ঠাকুর পূজা করতেন। তিনি মার ও স্বামীজীর কৃপাপ্রাপ্ত। প্রেমানন্দ মহারাজ ইহাকে 'শুকুল মশাই' বলতেন। তখন তাঁর শরীর নিটোল ছিল। রোগ স্পর্শ করে নাই। দুধের মত সাদা রঙ! গেরুয়া বসন। সাধনার এবং বস্তুলাভের চিহ্ন চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। নিস্পন্দভাবে ধ্যানলীন হইতে কতদিন দেখিয়াছি। স্বাবলম্বী সর্বদাই। আর স্বল্পভাষী। বাজে কথা, আড্ডা—একেবারে বর্জন। হুজুগে—মোটেই ছিলেন না। কাশীতে গঙ্গাধর বাবা বলেন, ওকুলেরই ঠিক্ ধ্যান।

একবার বেলুড়ে মহোৎসব। শরৎ মহারাজ সবাইকে জাহাজের ফ্রী পাশ একখানি, একখানি দিচ্ছেন। কে উদ্বোধনে বাড়ী আগ্‌লে থাকবে? শুকুল মহারাজ বল্লেন, অতি শান্তভাবে, আমি আছি।

শরৎ মহারাজের নীচে বসবার ছোট ঘরে শুকুল মশাই বসিয়া তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। অতর্কিত হওয়াতে শুকুল মশায়ের পাদুকা শরৎ মহারাজের দরজার চৌকাঠে—চোখের সামনে রহিয়াছে। কটু দেখাইতেছে। ছোট ঘরে অনেকগুলি লোক গিস্‌গিস করিতেছে। শুকুল মশায়ের নড়িবার উপায় নাই। একটি বালককে বলছেন, ওহে, জুতোটা পায়ে করে সরিয়ে দাও তো। বালক সহজভাবে হাতে করিয়া সরাইয়া দিলেন। শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে তাঁহার জীবনের সেই গম্ভীর যুগেও (তখন তিনি অধিকন্তু দাড়ি রাখিতেন—দেখিয়া বাহির হইতে ভয় হইত) বালকদের সঙ্গে বেশ হাসাহাসি করিতেন। তিনি বালককে মজা দেখিবার জন্য বলিলেন, তোমার এ কোন্ দেশী কাজ? —(যেন কিছু অন্যায় হয়েছে) উনি তোমাকে পায়ে করে সরাতে বললেন। আর তুমি কিনা, হাতে করে সরালে! বালক কথা শুনিয়া গোড়ায়—অতো লোকের সামনে, একটু ঘাবড়াইয়া গেল—অপ্রতিভ হইল। পরে—বুঝিল। ঐ কথার কোন উত্তর দিল না। বুঝিল, তাহার কোন অপরাধ হয় নাই। শুকুল মহারাজের সহিত সকলেই হাসিলেন।

*　　　　*　　　　*

আর ঘন ঘন মনে পড়িতেছে—দেবব্রত প্রজ্ঞানন্দকে। কর্মভূমে থাকিয়াও

যোগী, প্রজ্ঞানন্দকে। তাঁহার ভিতর একটা যোগজ স্তব্ধতা ও তুষ্ণীম্ভাব সর্বদা দেখিতাম। নাক মুখ টিপিয়া কে কি বলবে, ভেবে—কৃত্রিমভাবে আমরা যে গুরুগম্ভীর হইতে চেষ্টা করি—সে অভিনয়কারী গাম্ভীর্য নহে। তিনি পূর্ব-জীবনে দেশের একজন নামকরা রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। কলিকাতা স্টার লেনের বালক। স্বামী সারদানন্দের পর ওরূপ Balanced Mind স্থিতধী ব্যক্তি কমই দেখিয়াছি! এখন যতই তাঁর কথা ভাবিতেছি মনে হইতেছে, ভিতরে অধ্যাত্ম-বস্তু কিছু লাভ না হইলে দেবব্রত—দেবব্রত হইতেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের যখন তিনি মায়াবতী কেন্দ্রের অধীশ, তখন উদ্বোধনে তাঁহা অপেক্ষা গুণে—শতগুণে নিকৃষ্ট একব্যক্তি একদিন কাজের ব্যাপারে দেবব্রত মহারাজের বুদ্ধি-শুদ্ধি মোটেই নাই, স্পষ্ট বলছিলেন। দেবব্রত কিন্তু চুপ্ করিয়া চমৎকার Saradananda like দোতলার সারদানন্দ নামক মোটা বালকটির মত—সব হজম করিলেন। তাঁহার স্নায়ু খুব শক্ত ছিল। প্রভূত শাস্ত্র জ্ঞান ছিল। পবিত্রতা প্রভূত ছিল। ধ্যান ধারণা ছিল। বুকে অনন্ত সাহস ছিল। গান বাজনা অল্প স্বল্প জানতেন। হোমিওপ্যাথি পড়তেন। কথাবার্তা চমৎকার কইতেন। ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারতেন। খালি, দাঁড়িয়ে বলতে পারতেন না।

প্রথম যোগ দিবার পর (যদি দর্প কিছু থেকে থাকে—তা চূর্ণ করবার জন্য) শ্রীরামকৃষ্ণের কোন সন্ন্যাসী তনয় কিছুকালের জন্য শুনিয়াছি নিত্যকর্মরূপে ব্রহ্মচারী দেবব্রতকে বেলুড়মঠে স্বামীজীর ঘরের বারাণ্ডা, সিঁড়ি ইত্যাদি পুঁছতে আদেশ দেন। আত্মসমর্পিত-তনু-মন দেবব্রত তাহাই করিতেন। বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, গোড়া থেকে এসেই একেবারে চেয়ারে বসা ভাল নয়। অহঙ্কার আসার সম্ভাবনা। দেবব্রত আট বৎসর সন্ন্যাসীসঙ্ঘে রহিলেন। ত্রিশে আসেন।

স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা ছাড়িয়া মাব দেশে গিয়াছেন। নিদাঘের এক তপ্ত রাতে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ দেবব্রতের শিব শরীর বহন করিয়া কলিকাতা শ্মশানেশ্বরের শ্মশান চুল্লীতে চাপাইয়া কাঠে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইল। মাত্র শেষ একদিন তাঁহাকে "আ—উ" করিতে শুনা গিয়াছিল। প্রায় ৩৮ বৎসর বয়সে, বৈশাখের সাত তারিখে শনিবার রাত্র ৮টায় (১৩২৫) শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলী দেবব্রতকে অকালে হারাইলেন। দাহ-ক্রিয়া শেষ করিয়া ফিরিতে ফিরিতে একটি ছোক্‌রার চোখে অবিরল জল ঝরিতে

লাগিল। আদর্শ সংঘর্ষের যুগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ, বাঙালীকে ভারত-বাসীকে, জগৎজনকে তেমন পারঙ্গমভাবে আর কি কেহ বুঝাইতে পারিবেন? ঐ যুবক দেহধী। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা বুঝিবার ক্ষমতা তখনও তাহার হয় নাই।

প্রজ্ঞান মহারাজ সহজে তাতিতেন না। ছেলে যুবা বৃদ্ধ—সকল মনের অভাব মিটাতে পারতেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শধারার উত্তরাধিকারী নিখিল বিশ্বের নরনারী! আপনাদের অতি সংক্ষেপে দেবব্রতের কথা বলিলাম। শুনাইলাম। ইহার অনুধ্যান করিবেন। মনে বল পাইবেন। হৃদয়ে সাহস আসিবে।

* * *

জ্ঞান মহারাজ স্বামীর সন্তান। বড় একরোখা। শরীরে অটুট যৌবন বল সুস্বাস্থ্য নিয়ে, বুকে অনন্ত সাহস ধরে, ঘর ছেড়ে তখনকার দুর্গম গিরি-কান্তার-প্রান্তর নগর অতিক্রম করে, যুবা বয়সেই হিমাচলের পূত আবহাওয়ায় প্রেমিক বিবেকানন্দের—শিবগুরুর—সন্ধান—কোল পান। সেদিন স্বামীজী ঘোড়ার সওয়ার। ঘোড়া চেপে টগ্‌বগ্‌ করতে করতে পাহাড়ী পথ বেয়ে প্রাতঃভ্রমণ সেরে মায়াবতী আশ্রমে আসছেন। স্বরূপানন্দ যুবা হবু সাধুকে একটি ছাতা দিয়ে আশ্রম থেকে পাঠিয়েছেন—তাঁর মাথায় ধরে নিয়ে আসতে। মাথায় যেন রোদ না লাগে। মাটিতে দাঁড়িয়েই যুবক মহাপুরুষের মাথায় ছাতি ধরতে সচেষ্ট। তৎক্ষণাৎ মুখ চোখে 'কিন্তু' ভাব পরিস্ফুট হ'ল। তিনি ঝট্ করে নেমে পড়লেন। বললেন—"থাক্ থাক্" 'সখেতি মত্বা'——সহজ বন্ধু ভাব।

তখনকার সেই যুবক একদিন প্রসঙ্গে বলেছেন—স্বামীজীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ফুটাইবার জন্যই আসা। তরুণদের দরদী। ছেলেদের গড়ে উঠবার জন্যে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন।

স্বামীজী একপত্রেও দেখিতেছি সন্তানকে লিখছেন "আমি চাই আমার প্রত্যেক সন্তান, আমি যা হতে পেরেছি তার চেয়ে দশ গুণ বড় হবে।" কি সুন্দর উৎসাহ বাণী! পুত্র পিতাকে পরাজিত করুন—পিতা এদেশে কামনা করেন।

স্বামী সারদানন্দ একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর কাজ ছেলেদের ভেতর জ্ঞান অনেক করেছে। তবে ও কারুর অধীনে কাজ করতে পারে না।"

শ্রীমার শক্তিপ্রাপ্ত সহিষ্ণু তপস্বী পূর্ণানন্দ (ডাক্তার মহারাজ) কয়েক মাস াঞ্জাবের অমৃতসহরে কাটাইতেছিলেন। ১৯২০তে মার বিশেষ অসুখ শুনে উদ্বোধনে চলে এলেন। ইনি এখন রামকৃষ্ণ-বিলীন। কলিকাতা আহিরী-টোলার বালক। স্বামীজীর স্নেহভাজন ঐ টোলার আজীবন ব্রহ্মচারী নন্দলাল াহারাজের সংস্পর্শে আসেন। নন্দলাল ঐ পাড়ায় বহু যুবকের প্রাণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রীতি-প্রদীপ জ্বালাইবার নিমিত্ত-স্বরূপ। পূর্ণানন্দের গলা মিষ্টি ছিল। ব্রাহ্মসমাজে মিশিয়াছিলেন—ব্রাহ্মসমাজের আচার্যদের উপদেশ হইতে উপকৃত হইয়াছিলেন। ইনি শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। হিসাবের কাজ জানিতেন। সোনার মেডেল পাওয়া হোমিও ডাক্তার ছিলেন।

গুরুর ঘরে "গৌকা মাফিক্" থাকিতে হয়, হিন্দী বুলিতে বলে। পূর্ণানন্দ ার বাড়ীর পাকা সিঁড়ির তলায় মাথার উপর একখানি চাঁদোয়া খাটাইয়া প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পড়িয়াছিলেন। আসনে সিদ্ধ। জীবনে সব কাজে সুপদ্ধতি, নিয়মবদ্ধভাব ফুটিয়া উঠিত। বছর চারেক সম্ভব ছাদে পর্যন্ত উঠিতে দেখি নাই। স্বামী সারদানন্দ অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। সারদানন্দ মহারাজের কথাবার্তা যা শুনতেন রোজ তাহা ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। এই ডায়েরীগুলি এখনও পূর্ণানন্দের একজন নিষ্ঠিক গুণগ্রাহী, বাগবাজার পল্লীর ভদ্রলোকের কাছে সঞ্চিত আছে। স্বাধ্যায়ে তাঁর সুন্দর অভিরুচি দেখিয়াছি। রাত তিনটেয় উঠে নিত্য জপরত থাকিতেন। নিজের উপর অপরের ঘৃণা উৎপাদিত করিবার জন্য সাধারণত মিষ্টভাষী হইয়াও কোন কোন সময় অনেক ভক্ত, অনেক সাধুর উপর অসাধুচিত কটুবাক্য, কটুব্যবহার প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি। যাতে কেউ তাঁর কাছে না আসে। সময়ে সময়ে ভাবিয়াছিও—আচ্ছা, কটু না বলিয়াও পূর্ণানন্দ মহারাজ তো এরূপ কর্মঠব্রত ধারণ করিয়া থাকিতে পারিতেন! ওটা—সাধু তিনি, না করিলেই ভাল হইত।

চৈত্র সংক্রান্তির পুণ্য দিনে শ্রীমার বাটীতে পূর্ণানন্দ তাঁহার প্রিয়, নীচের ছোট ঘরখানিতে বিদেহ হইলেন। ঠাকুরের ছবি দেওয়াল থেকে নামিয়ে, চোখের সামনে রাখতে বললেন। গীতা রোজ শুনতেন। যাবার আগে বললেন, "তোমাদের অনেক কষ্ট দিলুম।" পূর্বদিন বলেছিলেন,—"আর শরীর থাকবে না।" রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাঁধে চড়িয়া, পূর্ণানন্দ শ্মশানেশ্বরের শ্মশানে সমাহিত হইলেন। এই মহাশ্মশানে যোগানন্দ স্বামীজীর দেহ,

গোপালের মার দেহ, গুপ্তমহারাজের দেহ, গিরিশচন্দ্রের, যোগীনমার মায়ের বলরামতনয় রামকৃষ্ণ বসুর, দেবব্রতের, চিন্ময়ানন্দের, যোগীনমার, গোলাপমার দেহ—একে একে রামকৃষ্ণ ভক্তেরা দেব-বৈশ্বানররূপী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া পর পর অনেকবার আঁখির বারি বিসর্জন করিয়াছেন।

সৎসাহসী তেজস্বী চিন্ময়ানন্দের দেহ চমৎকার গিয়াছিল। পাকা সিঁড়ি দিয়া শ্রীমা 'আহা—আহা' বলিতে বলিতে নামিতেছেন। শরৎমহারাজ বাড়ীতে আছেন। তাঁর গর্ভধারিণী মাকে জাগাইতে মা সারদা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পূর্বরাত্রে জাগিয়া সকাল হইতে নিদ্রাভিভূতা। সংসারের মায়াকান্না পাছে চিন্ময়কে জ্যোতির্মার্গে—দেবযানে যাইতে না দেয়, পথে বিঘ্ন আনে, জগদম্বা সারদাদেবী তাহাই করুণা করিয়া ঘটাইলেন। এ না হইলে কি, প্রকৃত মায়ের দরদ হইত ?

কৃষ্ণানন্দ মহারাজ। রাখাবের জঙ্গলে তাঁর অত্যুগ্র তপের কথা টাটানগরে এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় একজন বলিলেন। উক্ত ভদ্রলোক ব্যবসা ব্যপদেশে ঐ জঙ্গলে যান—তপস্যা দেখিয়া মুগ্ধ হন। বললেন—"আগে মনে করতুম স্বামীজী কথিত আদর্শের চেলা মানে, বুঝি খালি রিলিফ কাজ, হাতে গ্লোব, ম্যাজিক লণ্ঠন, রোগীর সেবা বা আজকাল পাঠশালা। দেখলুম, এও বটে, ও—ও বটে। কারণ, কৃষ্ণানন্দ মহারাজ যে একজন সরেস সেবাশ্রমকর্মী ছিলেন, অনুসন্ধানে তাহাও শুনিয়াছি"। সাধুমুখে শুনিয়াছি, কৃষ্ণানন্দ মহারাজের কয়েকবার জগদম্বার দর্শনও ঘটিয়াছে। মানভূমের কয়েকটি ছেলের প্রমুখাৎ কৃষ্ণানন্দের জীবন তাহাদের উপর যে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাও বুঝিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কৃষ্ণানন্দ এক গৌরব। কৃষ্ণানন্দকে একদিন একজন কিছু উপদেশ দিতে বললেন। কৃ—সরল। বললেন—"কিছু ত করবেন না। ঠাকুরের উপদেশ বাজারে কিনতে পাবেন"। লাটু মহারাজ সুন্দর বলতেন,—"হামি—কি বোলবে ? ছাপা হোয়েছে তাঁর উপদেশ। রোপেয়া ফেলো, কিনো, কিতাব পড়ো। কিন্তু জেনো কেবল তা'তে রামকৃষ্ণকে 'মার দিয়া' কোর্‌তে পারবে না,—সাধতে হোবে।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ একটি খরস্রোতা গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর ন্যায় ভাবধারা। এই আমোঘ শক্তিময়ী ধারা কখন কাহাকে কেন যে আকর্ষণ অন্তে, তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া টানিয়া লইবে,—তাহা যাঁহারা টানে এসেছেন, তাঁহারাও জানেন না। জানেন, জগদম্বা। কোন্ চিত্তে কখন তিনি তাঁর সোনার

সিংহাসন পেতে, আঁতের ঘর আলো ক'রে বসবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তাহা জানেন। আজ যিনি বিপক্ষ, কাল হয়ত তাঁকে সপক্ষে দেখতে পাবো। অনেক আধারে, তাঁরা আধেয় হবেন।

সদানন্দ বা শ্রীগুপ্ত মহারাজ আর একজন স্বামীজীর সন্তান। তান্ত্রিকী দীক্ষা এবং বৈদিক বিরজা হোমান্তে সন্ন্যাসদীক্ষা—দুইই স্বামীজীর নিকট হতে পাওয়া। তাঁর ছিল—ব্রজের ভাব। জোর জবরদস্ত্। বলতেন 'প্রভু প্রভু' খালি কি? কৈশোরে তাঁহার দর্শন আমাদের ভাগ্যে জুটিয়াছিল। তখন ব্যাধি তাঁহার শরীরকে ঘিরিয়াছে। দেহে আর পূর্বের সে লাবণ্য নাই। তিনিও বিবেকানন্দের ন্যায়ই কলিকাতার বালক। বাগবাজার বসুপাড়া লেন ৮নং মোকামে তাঁহারই হাতেগড়া বালকবৃন্দ তখন তাঁহার সেবাশুশ্রূষা তত্ত্বাবধান করেন। তখন পরমহংস অবস্থা, এখন মনে হইতেছে। তখন বুঝিতাম না মোটেই, তবে ভাল লাগিত। আর পবিত্রহৃদয় বালকের ভাললাগার একদিক দিয়া গভীর অর্থ, থাকিতেও পারে।

নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার ভাব গুপ্তের কর্মজীবনের গোড়া হইতে দেখা দিয়াছিল। শুনা যায় তিনি বাড়ি থেকে ঝগড়া ক'রে ইউ-পীর জৌনপুর সহরে যান। সেখানকার স্টেশন মাষ্টার তাঁহাকে প্রথম—রেলের পার্শেলের গাঁটে, দাগ মারিবার কাজ দেন। রোজ বিদায়—তিন আনা। "তাই দিয়েই রুটি কাবাব কিনে খেতুম।"

ক্রমে ক্রমে—রেলে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি টেলিগ্রাফ্ শিখেন এবং চাকুরি লাইনে উন্নতি করিয়া উচ্চপদ পান। উত্তরকালে সন্ন্যাসী হইবার পরও, অপরকে সাহায্য করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইলে, সিমলা পাহাড়ের Carrying Co.তে রেল সংক্রান্ত কাজ কিছুকাল করেন। তাহার পর সহসা কাজ ছাড়িয়া দিলেন যেই শুনিলেন স্বামীজী আমেরিকা থেকে আসছেন। তখন দক্ষিণে ওয়াল্‌টেয়র পর্যন্ত গাড়ী চলিত। তিনি বাকী পথ প্রাণের টানে, স্বামীজীর প্রতি অগাধ ভালবাসার জোরে হাঁটিয়া কাবার করিলেন। এবং রামনাদে পৌঁছিয়া বীরেশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ধন্য হইলেন।

স্বামীজী বেলাত মার্কিন থেকে নাম কিনে বিখ্যাত বিবেকানন্দ-মহারাজ হয়ে ফিরে এলে তাঁকে একদিন বলেছিলেন—"কি মহারাজ, আর কি আমাদের মনে আছে?"—তিনি বললেন হাসতে হাসতে,—"সে কি রে গুপ্ত, আমি কি ঘোড়ার ডিম হয়েছি যে, তোকে মনে থাকবে না! তোর জুতো

যে আমি বয়েছিলুম, সেদিনের কথা তোর মনে পড়ে?”—কর্তার চেয়ে গুপ্ত ছয় মাসের মাত্র ছোট ছিলেন।

একদিন বিদ্যাসুন্দরের একটি বয়েৎ স্বামীজী আওড়াইতেছেন, “বিদ্যে পাবার সাধ থাকে ত, চাঁদমুখে ছাই মাখ, যাদু।”—ঐ বচন শুনিয়া সদানন্দ বাস্তবিকই থপ্ করে গিয়ে খানিকটা উনানের ছাই মুখে মেখে, কর্ত্তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্বামীজী বললেন,—“আমি কি তোকে সত্যি সত্যি ছাই মাখতে বলেছিলুম?—আমি গান করছিলুম।”—হাসির গর্‌রা উঠিল। সদানন্দের সরল বালকোচিত কার্য ও বিশ্বাস দেখিয়া বীরেশ্বর মুগ্ধ হইলেন।

যৌবনে সদানন্দের ব্রহ্মচর্য সাধনার আধার, বলিষ্ঠ দেহে এতদূর ক্ষমতা ছিল বলিয়া শুনিয়াছি যে, একদিন জোরের পরীক্ষা এইভাবে দিলেন। এক বগলে বন্ধু গুরুদেব, অপর বগলে রাজা মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ স্বামী)। পরমহংসেরা বালকবৎ হন শাস্ত্রে আছে। এই দৃশ্যটি চোখের সামনে আর একবার সত্য হউক, একবার দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতে এখন ইচ্ছা হইতেছে।

সদানন্দ বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর নামক প্রসিদ্ধ সহরে, কায়স্থ সেনেদের আলয়ে কিছুদিন ছিলেন। এই পবিত্র বাটী, শ্রীশ্রীমার দেশে যাইবার পথে—তাঁহার বিশ্রাম-আগার। পরমহংসদেবের শিষ্যদের অনেকেরই পদধূলিতে পবিত্রীকৃত। সুতরাং, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের পরম লোভনীয় তীর্থ। এইখানে থাকিতে থাকিতে, তাঁহার ভিতর কতকগুলি অলৌকিক শক্তির পরিস্ফুরণ হয়। তাঁহার পূত সঙ্গ প্রাপ্ত জনৈকের প্রমুখাৎ যেমন শুনিয়াছি, বলিয়া যাইব। এরূপ শক্তি যে তাঁহার ভিতর জগদম্বা ফুটাইবেন, তাহা মোটেই আমাদের চক্ষে বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় না। পরমহংসদেবের আমলের সাধু মহারাজদের সঙ্গলাভে পরিষ্কার বুঝিয়াছি, এ সকলগুলি তাঁহাদের পক্ষে কিছুই নহে। তাঁহাদের শিক্ষার জোর—চরিত্রের উপর, স্বভাবের উপর, ব্যবহারের উপর, কার্যের উপর। অলৌকিক দর্শন ও শক্তি আসে—আসুক। কিন্তু, স্বার্থের জন্য বা নাম কিনিবার জন্য ঐগুলি ব্যয় করিলে অপব্যয় হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বা আত্মোপলব্ধির পথে কাঁটা দেয়, বিঘ্নস্বরূপ হয়,—বুজ্‌রুক বনিতে হয়। চেলা বানাবার বা ইমারত বানাবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইবার আশঙ্কা থাকে।

জনৈক যৌবনে মদ খাইতেন। তাঁকে কোনদিন সাক্ষাৎ ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। পরমহংসদেব ও গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। কিন্তু, সাধুসঙ্গের এমনি মহিমা, তাঁহাকে ক্রমশঃ এই অভ্যাস আপনা হইতেই

পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। প্রথম তাঁহার সহিত, বাড়ির আর আর পাঁচ-জনের মধ্যে একজন হইয়া—ব্যবহার করিতেন।

জনৈক পুলিসে কাজ করতেন। তাঁকে একদিন বললেন, "ছাখো, কখনও কোন লোককে শারীরিক পীড়া দিয়ে, কোন স্বীকৃতি আদায় করো না।" জনৈকের শিকারে ভারি ঝোঁক ছিল। বললেন,—"যে প্রাণ দেবার ক্ষমতা তোমার নেই, নেবার ক্ষমতাও তোমার থাকা উচিত নয়।" বললেন ইংরেজীতে।

একদিন জনৈককে বললেন। "তুমি জীবনে যা যা অন্যায় করেছ, আমার কাছে স্বীকার করো—Confess করো। তোমার সব দোষ ক্ষমা করবার ক্ষমতা আমার ভিতর এখন এসেছে।" তিনি বলেন, "আমার ভয় হোলো। আমি ভয়ে কিছুই বলতে পারলাম না।" তিনি বললেন,—"তোমার ভাল হবে,—তবে—দেরীতে"। আধ ঘণ্টা পরে এই শক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন। অধ্যাত্মরাজ্যের সাধককেও অনুভূতির বিভিন্ন স্তরের ভিতর আনাগোনা, উঠানামা করিতে হয়। Men and women are all really multiple beings.

একজনের রক্ত-আমাশয় হয়েছে। তাহাকে তিনি ভালবাসেন। তার কাজে যেতে অসুবিধা হবে। তার মাথায় পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন। সে সেরে গেল। তাঁহার নিজের রক্তদাস্ত হইল।

দুই ব্যক্তি—একজনের স্বভাব ভালো, একজনের মন্দ। দুইজনেই একই দিনে সদানন্দের সেবার জন্য কিছু আহার্য দ্রব্য পাঠান। ভাল লোকের খাবার বেশ খেলেন, দ্বিতীয়টা খেতে গিয়ে, আপনা হতে মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সেবকরা চামচে দিয়ে, চোয়াল ছাড়াতে চেষ্টা করেও পারলেন না।

খাবার নানারূপ করাইতেন। নিজে একটু-আধটু চাখতেন। সেবকদের বেশ পরিতৃপ্তকর ক'রে খাওয়াতেন। বালকদের খাওয়াতে খুবই ভালবাসতেন। তাঁকে উপলক্ষ মাত্র ক'রে খাবার প্রস্তুত হ'ত।

সদানন্দ বলতেন,—"আমরা স্বামীজীর কাছে, তাঁর glamour বহিঃ চাক্‌চিক্য, ঐশ্বর্য দেখে আসি নি।" সদানন্দ চাইতেন, সাধুরা ভক্তেরা সবাই ভেতরের অধ্যাত্মশক্তিতে দিন দিন বেড়ে উঠুন। রোজ রোজ মা-ঠাকরুণের বাড়ি গিয়ে ভক্তি করার অপেক্ষা, মার-জীবনের অনুযায়ী জীবন, কিছু কিছু, গঠন করবার ভাবটিকেই তিনি পছন্দ করতেন।

দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে, সদানন্দ বিশেষ নিবন্ধে প্রার্থনা না করে—পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা সারদাদেবীর পাদপদ্ম মাথায় বুকে ধারণ করলেন, বললেন,—"মা, সেই সন্ন্যাস নিয়ে, স্বামীজীর আদেশে আপনার দেশে গিয়ে আপনার পদধূলি নিয়েছিলুম। আপনার সেই এক আশীর্বাদের জোরে বাইশ বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে। আজ আবার বিদায়-বেলায় আপনার আশীর্বাদ চাচ্ছি। এখন আমার মাথায় পা দিন, আমি হাসতে হাসতে চলে যাই।" মা প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন,—পাদস্পর্শ দিলেন। বললেন, "তোমার ভয় কি বাবা? তোমার নরেন আছেন।" বোসপাড়ার বালকদের কোলে, ছেলেদের কাঁদাইয়া, ছেলেদের অকূল সাগরে ভাসাইয়া (ফেব্রুয়ারী ১৯১১), সদানন্দ তনুত্যাগ করেন।

তিনি ছেলেদের, রোগীর গা কেমন ক'রে টিপতে হয়, শেখাতেন। এমনভাবে গায়ে হাত দিতে হবে, যাতে রোগী স্পর্শ পেয়েই বুঝবে, এ লোকটা আমার মা।

(অসুখ বাড়াবাড়ির সময় শয্যাশায়ী অবস্থায় মলত্যাগের জন্য, কাগজের প্রয়োজন হইল। সদানন্দ সেবককে বললেন,—"ছ্যাখ্, অন্য কাগজ দিবি না। কি জানি মা সরস্বতী রাগ করবেন। যে কাগজে ঠাকুর—স্বামীজীর কথা ছাপা আছে, সেই রকম ছেঁড়া কাগজ দিবি। আমি কোন রকম দ্বিধা না ক'রে তা ব্যবহার করতে পারি। তাঁদের ওপর দাবী আছে। তাঁরা আমার আপনার লোক।")

একদিন একজন সেবককে বলছেন,—শুধু শুধু সময়টা নষ্ট করছিস্ কেন? খানিক স্বামীজীর বই পড়্—যেখানটায় না বুঝতে পারবি, বলিস্, বুঝিয়ে দেবো।

সেবক পড়িতেছেন। তিনি অসুস্থ, নিস্তব্ধ, নিথর,—শুইয়া শুইয়া শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে যেন বাক্যহারা। মাঝে মাঝে চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইতেছে। উত্তেজিত হয়ে বলছেন,—"ওরে ত্রিতাপতাপিত হয়ে—মুক্তির জন্য আসি নি। পীরিতে পড়ে এসেছি,—পীরিতে পড়ে এসেছি। আবার বলি, নরেন দত্তের পীরিতে পড়ে এসেছি। সাফ্ কথা—He was all love,—তাঁর সব সত্তাটাই প্রেমময়—ভালবাসা জমাট।

হাথরাস স্টেশনে কাজ করতুম। একরাত্রে সাধুর স্বপন দেখি। বাস্তবে, তাঁকেই খুঁজছিলুম। তিনদিন পরে এক ট্রেনে দেখি, একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায়,

এক লাল সুন্দর পাগ্‌ড়ীবাঁধা বড় বড় চোখওয়ালা সাধু যাচ্ছে। দেখে বুঝলুম,—হিন্দুস্থানী নয় বাঙালী,—আমারই স্বপনের সাধু। তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলুম। আমারও খুব লম্বাচওড়া সুশ্রী চেহারা ছিল। বললুম, "মহারাজ, আমি বাঙালী। এখানে নেমে আমার বাসায়, আপনাকে দুই একদিন, মেহের-বাণী করে, থেকে যেতে হবে।" তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমার বাড়ী গেলে তুমি কি খাওয়াবে?

স্বামীজীর বাবা আইন ব্যবসা করতেন। সে যুগে আদালতে ফার্সী-আরবীর চাল ছিল। বাড়ীতে মৌলবী থাকতো। স্বামীজীও কিছু কিছু শিখেছিলেন। কাব্যটাব্য পড়েছিলেন। আমরা বাইরে, পশ্চিমে থাকতুম। তাই ওসব জানতুম। তৎক্ষণাৎ হাফিজ থেকে, এক ফার্সী বয়েদ বললুম, ভাবার্থ,—"হে প্রেয়সী, তোমায় আর কি খাওয়াবো? আমার এ সাধের কলিজাখানার কাবাব ক'রে খাওয়াবো।" তাঁর লালমুখ, প্রেমে ঢলঢল আঁখি, আরও bright—উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। পরে, ফের্‌বার পথে নেবে পড়লেন। তিনদিন রইলেন। (শুনেছি, সদানন্দ মাসিক বেতনের সব টাকাগুলি কর্তার পায়ে ঢেলে দেন।) তা জান্‌লি তো প্রথম দেখা হতেই পীরিত। পীরিত—জমে গেল! Love at first sight!— এ তত্ত্ব কে বুঝবে? বাস্তবিকই সদানন্দের সহিত বলিতে ইচ্ছা হয়, মার করুণা ভিন্ন এ টান বুঝা ভার। জগদম্বা করুণা করিয়া, যাঁহার দৃষ্টি, যাঁহার প্রবৃত্তি যৌবনে সাধুর দিকে, গুরু-বেদান্ত-পরমেশ্বরের দিকে মোড় ফিরাইয়া দেন, তিনিই বুঝিয়া, সদানন্দের ন্যায় কুলকে পবিত্র করেন, জননীকে কৃতার্থ করেন।

আবার এ ছাড়া, সদানন্দ চরিত্রে, "ময় গোলাম, ময় গোলাম তেরা"—এই ভাবও ছিল। বলতেন জোরের সহিত, উপলব্ধির সহিত বলতেন,—We belong to the line of Prophets,—আমরা বড় ঘরের ছেলে। বড়ঘর, ব্যবহার লইয়া, বড় ঘর। ঋষির বেটা আমরা। মানস পুত্র। মানস সন্তান। পয়গম্বরের সন্তান।

সদানন্দের শ্রীচরণে সদাই প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তাদের প্রত্যেক পথানুসরণকারীকে, যিনি যথায় আছেন, সেইখানেই, এই কথা বুঝাইয়া দেন। ইহা উপলব্ধি করিলে ফাঁকা গর্ব আসিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রকৃত বিনয় আসিবে। আস্তিক্য বুদ্ধি আসিবে। প্রত্যেক মতের সহিত সত্যকার সহানুভূতি আসিবে। শুধু বুদ্ধিপ্রসূত, নীরস বুলি আওড়াইয়া

বা লিখিয়া দায়িত্ব শেষ করিলাম,—এ বালকোচিত বোধ বিদূরিত হইবে। আবার, সদানন্দ খুব বেশী অপরের দোষ দেখতে নিষেধ করতেন,—প্রায়ই ঈশার বাণীর প্রতিধ্বনি করতেন—Judge not that ye be not judged.

ছেলেদের অনুরোধে মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) একদিন বসু-পাড়ার ৮নং এর উপর তলায়, গুপ্ত মহারাজের ঘর দেখিতে যান। এইখানে গুপ্ত-সদানন্দের স্মৃতি সুগুপ্ত, সুসঞ্চিত ছিল। মহাপুরুষ তাঁহার সন্তান পর্যায়-ভুক্ত সদানন্দের বিছানার নিকট শিয়র নত করিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া সকলকে চমকিত করেন, বলিয়া শুনিয়াছি। সদানন্দের গুরু স্থানীয় -শিবানন্দ স্বামীজী! ঠাকুরের যে মহিমা সদানন্দে ফুটিয়াছিল—শিবানন্দ মহারাজ তাহাকেই বোধ হয় অভিবাদন করিলেন। ৮নং বাটি রাস্তায় নিশ্চিহ্ন।

স্বামী সদানন্দের একটি অদ্ভুত ক্ষমতা উদয়ের কথা আমরা তাঁহার সেবকদের মুখে পাইয়াছি। কেহ কোন অসৎ চিন্তা করিয়া তাঁহার ঘরে ঢুকিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখিয়া বলিতেন—একটু বাইরে ঘুরে আয়। তোর গায়ের গন্ধ থেকে টের পাচ্ছি, খারাপ ভাবনা ভেবে এসেছিস। যা, আবার হাওয়া বদলে আয়।

"আমি সাধু"—এই বোধটি সদাই সদানন্দে পরিস্ফুরিত হইত। আরও বলিতেন,—আরে দাতা কোন হ্যায়?—সাধুই দিতে পারেন। আর সবপ্রথম ভদ্র হতে হবে। তারপর সাধু। First a gentlemam, than a Sadhu.

আবার বলিতেন—সাবধান। ঠাকুর কল্পতরু। যা যাচ্ঞা করবি তাই পাবি। কিন্তু সাবধান। যা-তা, চাস নি।

বেলুড়মঠে চতুর্দশী তিথি, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪০। পূজনীয় কেদার-বাবা কয়েকটি চমৎকার কথা শুনাইলেন। হরিমহারাজের সহিত কিছুকাল, বাবা সাধনভজনে কাটান। একদিন ধ্যান হইতে উঠিয়া পরে কেদার-বাবাকে তুরীয়ানন্দ কহিলেন,—"সত্যি বল্‌ছি, কেদার বাবা, মা আমাদের আমিত্বটা অক্ষরে অক্ষরে মুছে দেন (হাতের দ্বারা মুছা কাজটি দেখাইয়া)।" সাধকের কাঁচা 'আমি' জগদম্বার কৃপায়—সিদ্ধের 'পাকা' আমিতে পরিণত হয়, শ্রীহরি তাহা উপলব্ধি করিয়া জীবনে ধন্য হয়েছিলেন।

কেদার বাবা স্বামীজীর সম্বন্ধে দুইতিনটি কথা, বেশসুন্দর কথা ব'লেন। স্বামী তখন বেলুড়ে। বালকের মত থাকতেন। কাপড়খানি বগলে,—পরমহংস অবস্থা। দক্ষিণেশ্বরের ঈশ্বর যেমন সর্বদা থাকতেন। (শ্রীমতী

গোলাপমাতা বলতেন, পরমহংস মশায় কচি ছেলের মতন খাটখানিতে বসে থাকতেন, বগলে কাপড়। আমরা সব গেরস্তর সোমত্ত মেয়ে,—কোন সংকোচ বা কুভাব কখনও মনে উঠত না।) একদিন মঠের ভাণ্ডারীকে হুকুম দিচ্ছেন,—যে যে ঠাকুরঘরে বসে নি, সে সে খেতে পাবে না। (যিনি মূর্তি সত্য সত্য মানেন না, তাঁর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।) আর একবার বলেছিলেন,—"সাধুর সব অপরাধ মাফ হয়,—খালি স্ত্রীঘটিত চরিত্র দোষ মাফ হয় না"।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতীচ্যে প্রাচ্যের আলোকসম্পাত

ঠাকুরের কাজে আমরা উপলক্ষ মাত্র। তাঁর কাজ তিনিই নিজে করে নিচ্ছেন। আমাদের অহমিকা এলে সবই পণ্ড। দূর-দূরান্তরেও তিনি তাঁর ভাব নিজেই ছড়াচ্ছেন।—এইটি বুঝাইবার জন্য একদিন স্বামী সারদানন্দ একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিলেন।

(রামলাল দাদা বলেছিলেন, আর আমিও শুনেছিলুম একদিন সমাধি থেকে উঠেই তিনি বলছেন,—এক নূতন জায়গায় গেছলুম গো। কি রকমের সব লোক সেখানে। ধবো, ধবো—(ধলা, সাদা) অনেক লোক। তাদের নীল চোখ। এক নূতন দেশ।

তখন আমরা এ সব কথা কিছু বুঝতে পারি নি। বরানগর মঠে আমরা সব খুব তর্ক-বিতর্ক করতুম। একদল খালি দেখাতো, তাঁর সব কথা সত্যি হয়েছে। আর একদল বল্‌ত, সব অমিল হয়েছে। লাটু মহারাজ সরল বিশ্বাসী। তিনি চ'টে বলতেন, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি। অমন বোল না কখনও। আলবৎ তাঁর সকল কথা মিল্‌বে।)

তা ঘ্যাখো, এখন দেখছি। (বুড়ো বয়সে) তাঁর প্রত্যেক কথাটি সত্য হচ্ছে। বোস্টন নিউইয়র্ক এসব সহরে তখন আমি কাজ করি। মণ্ট্ ক্লেয়ার ব'লে একটা জায়গায় মিস্ ওয়ালডোর বাড়ীতে থাকি। একদিন একটা কথোপকথনের ক্লাসে তিনি একজন প্রৌঢ়াকে এনে, আমার খুব কাছে বসিয়ে দিলেন, আর বললেন, ইনি কানে কম শোনেন।

তার পর দু-চার দিন আসা-যাওয়া করতে করতে এঁর সঙ্গে আলাপ হোলো। বয়স প্রায় তখন ৪৫। আমার একখানা ছোট্ট নোট-বুকে, ঠাকুরের ছবি ছিল। একদিন সেখানা তাঁকে দেখিয়ে বললুম,—"ছাখো, যাঁর কথা বলি, তাঁর এই চেহারা।" দেখেই তিনি হঠাৎ চম্‌কে উঠলেন, আর বললেন,—"আমার যখন বিশ-পঁচিশ বয়েস, তখন প্রথম স্বপ্নে আমি এই মহাত্মার দেখা পাই। আর সেই অবধি, আমার অসুখ-বিসুখ হলে বরাবরই দেখতুম, ইনি—এই ইনিই, অনন্ত দয়া করে, বাপের মত আমার মাথার ধারে এসে, মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। সেই থেকে আমার এসিয়ার লোকদের উপর শ্রদ্ধা। প্রাচ্যদেশ হ'তে নূতন কেউ এলে বা পূর্বদেশের সম্বন্ধে কথাবার্তা বক্তৃতা কোন পণ্ডিত সজ্জন দিলে, সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটে যাই। তোমাদের এ বেদান্ত আন্দোলন আমার খুব ভাল লাগে। আমি পণ্ডিত নই। আমার দেখার দিক, বিশ্বাসের দিক। স্বপ্নে দৃষ্ট মহাত্মার দেশের লোকদের কণ্ঠ থেকে এ সবই যে, উচ্চারিত হচ্ছে।)

পাঠক-পাঠিকার ইহা বিশ্বাস হইবে কি না জানি না। এ ছাড়া এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। পরমহংসদেবের দেহান্তের পর, কেহ কেহ তাঁহার দর্শন পান। শ্রীরন্দ্রনাথ পরিষ্কার লিখিয়া গিয়াছেন যে, এরূপটি হইবে। আর, সেটা যে দ্রষ্টার মাথার খেয়াল নহে, তার প্রমাণ, ঐ দর্শনাদির ফলে, তাঁদের জীবনগতি সতের পথে, সত্যের পথে, ফিরেছে বা ক্রমশঃ ফিরছে। এবং তাঁরা প্রভূত আত্মপ্রসাদ, পরমা শান্তি পাচ্ছেন। একজন বিদেশী চিত্রকর, পরমহংসদেবের স্বপ্নে দর্শন পেয়ে, মনোরম এক পট এঁকেছেন বলে শোনা আছে। (ব্রাজিল দেশ থেকে এক প্রৌঢ় এঞ্জিনিয়ার, সঙ্গে একটি যুবক সহকারী নিয়ে, উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী সারদানন্দের কাছে এসে হাজির। আন্দাজ ১৯১৮ হইবে। ভক্তি-পূর্ণ ক্যাথলিক পদ্ধতিতে হাঁটু পেতে মিনিট পাঁচ ধরে স্বামীর পাদবন্দনা করলেন। তাঁর থিওজফিতেও ঝোঁক ছিল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, প্রভু রামকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে, তিনি তীর্থ ভ্রমণ হিসাবে ভারতে এসেছেন। "হে স্বামিন্! তোমার কাছেও কি প্রভু, আমাদের সম্বন্ধে অনুরূপ কিছু জানান নি? নিশ্চয়ই জানিয়ে থাক্‌বেন।" স্বামী একটু ভাবলেন। বললেন, না, আমি ত কিছুই পাইনি।)

*　　　*　　　*

(ধব্‌ধবে শুভ্রশির বুড়ী যোসেফিন্ ম্যাক্‌লাউড্। জীর্ণশীর্ণ শরীর নিয়ে রোগাহাড়ে ভেল্‌কি খেলাচ্ছেন। বেলুড় আর বেলাত্—এঘর ওঘরের মত

একাকার করে ফেলেছেন। উড়োজাহাজের চল এদেশে হবার আগের যুগ থেকেই। ক্ষীণ চোখে ভাল করে সযতনে চশমাখানা টেনে বসিয়ে, সরু লম্বা চিবুক আরও সিধে ক'রে, চোখ মুখ একাগ্রতার আভায় ফুটিয়ে, স্বামীজীর স্মৃতিকথা বলতে বলতে—লাল হয়ে উঠলেন। দাঁতে দাঁত দিয়ে, হাতের শীর্ণ স্নায়ুমণ্ডলী মুঠো ক'রে, ক'সে শক্ত ক'রে ঘুঁষি পাকিয়ে—বিবেকানন্দ চরিত্রের দৃঢ়তার ছায়া—অতুল আত্মবিশ্বাসের কায়াকে জীবন্ত,—ফুটন্ত কর্‌লেন। আত্মবিশ্বাস আত্মশ্রদ্ধা থাক্‌,—আর সব ডুবে যাক্‌। লোকে বলে, —তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখো। আমি বলি, আমি কলমে নই, কি লিখবো? আবার এও বলি, লিখলে সে জিনিস খাটো হয়ে যাবে। পুঁথির পাতায় তাঁকে কে ধরে রাখবে? জ্যান্ত মানুষের ভেতরেই তাঁর প্রকাশ। তিনি যাঁদের তৈয়ের ক'রে গেছেন, তাঁদের ছাখো। জীবনে—সেই জীবন মিলিয়ে নাও। বই ফেলে দাও। সে মহাশক্তিকে বইয়ে কি ধরে রাখবে? তোমার প্রাণে তবে সখ থাকে, ইচ্ছা প্রবৃত্তি হয়, আমার কাছে এসো, আমি তাঁর কথা বল্‌বো, —আলবৎ বল্‌বো—শুনে নাও। অবশ্য এখানের শ্রোতাকে তিনি নিজেই কাছে ডাকাইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন।

"আজ ষাট বৎসর সেই স্মৃতি নিয়ে কেটে গেলো। (জো-কুমারী)—আমি তাঁর চেলা-টেলা নই। আমি তাঁকে গুরু-টুরু ব'লে মানি না। তিনি আমার বন্ধু বটে। তাঁর দয়াতেই আমি আজ একজন অপেক্ষাকৃত ভাল রকম খৃশ্চান—a better Christian. সঙ্গীরা সব হিঁদু ব'ন্‌লো—তাঁর হাতে। আমার ওসব ভাব এলো না। আমি বল্‌লুম,—স্বামিন্‌! আমি কি হব? তিনি দৃঢ় গম্ভীর স্বরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—Joe! *be yourself*—পুঁথিতে ত' গলার স্বর ধরে দেবার পথ নেই, কেউ জোর সেই স্বর শুন্‌তে চান, শোনাতে পারি।—বুড়ী কি দৃঢ়কণ্ঠে জোরের সহিত, হাত ছ'খানা ধ'রে বার বার বল্‌তে লাগলেন। বেলুড় মঠের অতিথশালার সুন্দর সাজানো দোতলার উপর তাঁর নির্জন সুবৃহৎ হলঘর। ঘরে আর কেহ নাই,—নিস্তব্ধ, একান্ত। কার্পেটের উপর মেঝেয় ব'সে একটি শিশু। আর তিনি যেন একটি বুড়ো ঠাকুমা। পল্লী শান্ত। দেবারাম নিথর। সম্মুখে কুলুকুলুনাদিনী কল্লোলিনী শীতের শান্তা, সুশান্তা গঙ্গা। যে পাবনী জাহ্নবীকে শিব শিরে ধরেছিলেন; আর এক্ষেত্রে, প্রসঙ্গ—সেই শিবপ্রসঙ্গই।

কানে বার বার কথা বাজতে লাগলো। সজোরে বুড়ী শ্রোতার অন্তরে

যেন একটা নাড়া দিয়া বললেন, Joe *be your self* ! Joe *be your self* ! Joe, *be your self* ! জো-র ইংরেজী উচ্চারণ অতি স্পষ্ট, শুদ্ধ—চমৎকার। শেলের মত বুকে কথা বিঁধলো, কম্পন হ'ল। ধ্বনি অন্তরে ঘন ঘন প্রতিধ্বনি তুল্‌লে। শ্রোতা ঐ মন্ত্র, স্বাতন্ত্র্যের ঐ বীজ ভিতরে আওড়াইতে লাগিলেন। এমনি করেই কি জীবন—জীবনকে জাগিয়ে তোলে? প্রভো, তোমায় দেখিনি। তোমার সুবিমল সত্তায় যাঁরা জরিয়া রহিয়াছেন, তাঁদের দেখেই আমরা স্তম্ভিত।

জো আরো বলতে লাগলেন। ছাড়লেন না। "একবার কিছু টাকার একখানা চেক্ নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিলুম। তিনি বললেন, মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে,—'কিসের জন্য দিচ্ছ?'—আপনার জন্যই।" সাম্‌নে ত্রিগুণাতীত ছিলেন। মঠের বাংলা কাগজের ব্যয়ের জন্যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেইটি তাঁর হাতে দিয়ে খালাস হলেন।

ছাখ্, বিবেকানন্দও যেমন সত্যি, আমিও তেম্‌নি সত্যি। (পিঠে হাত চাপড়ে)—তুই—আমি—আমরা সবাইও তেম্‌নি সত্যি। এটা অনুভব করিস্? তিনি এসেছিলেন, আমি এসেছি ব'লে। আর আমি এসেছি, তিনি এসেছিলেন ব'লে। তাঁর কাজের জন্য—আমাদের প্রত্যেককে দরকার। কারুকে ফেল্‌বার উপায় নেই। তোরা বিবেকানন্দের ছেলে—You are the children of Vivekananda—You are the children of Vivekananda—Glory unto him. তাঁর জয়জয়কার! যাঁকে বলছিলেন, তিনি স্বামীজীর তিথিপূজায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামে উৎসৃষ্ট নবীন আন্‌কোরা সন্ন্যাসী (জানুয়ারী ১৯২৭)। বিবেকানন্দের নাম জয়যুক্ত হোক! আর, (হাসিতে হাসিতে)—আমাকেও মান্‌বি, ভক্তি কর্‌বি, কারণ, আমি তোদের ঠাকুমা, দিদিমাদের বয়সী।

আর তাঁর গান,—গলা বড় মিঠে ছিল। তাঁর সংস্কৃত-স্তব আওড়ানো বড় চমৎকার লাগতো। অর্থ বুঝতাম না সব। কিন্তু, আওয়াজ খুব প্রাণস্পর্শী। তাঁকে "যে দেখেছে, সেই মজেছে। অন্যরূপ লাগে না ভালো।" আর তিনি যখনই কোন কথা আরম্ভ কর্‌তেন, এই ধর, নাগরিক স্বাস্থ্য-উন্নতির জন্য, রাস্তার ড্রেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস নিয়ে কথা উঠল। তিনি কিন্তু, শেষ কর্‌তেন সেই অদ্বৈততত্ত্বে। যখন জ্ঞানানুভূতির অতি উচ্চ সোপানের কথাবার্তা কইতেন, আর আমরা বল্‌তুম, স্বামিন্, আমরা তোমাকে অনুসরণ

কর্‌তে পাচ্ছি না। তুমি বড্ড উঁচুতে উঠে গেছো। তিনি তখনই বল্‌তেন, জানিস্ না, আমি যে একজন কবি। Don't you know that I am a *poet ?*

এই দীর্ঘ জীবনের বহুল অভিজ্ঞতায় কেন কেবল বিবেকানন্দ—বিবেকানন্দ ব'লে পাগল হ'য়ে ছুটোছুটি করি, জানিস্? কারণ—আজ পর্যন্ত তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্টতর মানুষ, better man. চোখে পড়ে নি,—দেখিনি। যে দিন দেখবো, পাবো, সেই মুহূর্তে, সেইদিনই, তোদের বিবেকানন্দকে ছেড়ে, তাঁকে মান্‌বো, তাঁর হ'য়ে যাবো। রীতিমত কাজে—ভজ্‌বো। Prayer—প্রার্থনা ক'রে নয়। তবে, এখনো মিল্‌লো না, এই যা। ছাখ্, আমায় তিনি একবার বলেছিলেন, ভারতের হিতের জন্য কিছু করিস্। সেই জন্যে, যতটা সাধ্যি, ছুটোছুটি ক'রে, হাত-পা নাড়ছি। আর জানিস্, আমাদের বংশে একজন ভক্ত খৃশ্চান মহিলা জন্মেছিলেন। তিনি খুব ভজন—প্রার্থনা ক'রে গেছেন। আমাকে ওপথে কিছু কর্‌তে হবে না। তাঁর ভাবের উত্তরাধিকারিণী আমি। তোরও পিছনে যেমন আছেন। (শ্রোতা এ মত সমর্থন করেন না,—ইহা জো-র ব্যক্তিগত তখনকার মত)

তিনি ছিলেন পুরুষ-সিংহ,—সাহসের প্রতিমূর্তি। তাঁকে দেখলেই মনে বল আস্‌তো.—আর যত সব 'আনন্দ-টানন্দ' সবাই তাঁর কাছে ছিলো, যেন কেঁচো। আর, সবচেয়ে বড় কথা এই—তিনি ছিলেন আমাদের বড় আপনার জন। তোরা কি ভাবিস্—চ্যাপেলে, মন্দিরে তাঁকে বসিয়ে, খালি পিদিম ঘুরোবি, আর ভোগ চড়াবি ? তাঁর একটা cult নিয়মবদ্ধ তন্ত্র বানাবি ? তিনি যে এসব বড় ঘেন্না করতেন। তিনি রক্তমাংসওলা বাস্তবের 'মানুষ' ছিলেন। (তিনি থাকৃতে) আমি যেমন জুতা জামা পরে তাঁর কাছে, সটান গিয়ে বস্‌তুম, আর তিনি নিজে কেদারা এগিয়ে দিতেন, সেই রকম যেখানে যেখানে পূজা হচ্ছে, আজও সেখানে সেখানে সেইভাবেই যেতে চাই। তোদের ও বহিরাচার—কনভেন্‌শন, আমি মান্‌তে প্রস্তুত নই।

জো একবার উদ্বোধনে আসিলেন। সটান জুতো পরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তিনি সারদানন্দের ঘরের খাটের ওপর জুতোশুদ্ধ —ব'সে পড়লেন।—কোন সঙ্কোচ নেই। স্বামী সাহ্লাদে কথাবার্তা স্থরু করলেন।

জো বলেছিলেন যে তাঁরা বিবেকানন্দ স্বামীকে Svami no 1. এবং সারদানন্দ স্বামীকে Svami no 2. বল্‌তেন। স্বামী শ্রীব্রহ্মানন্দ তাঁহার

একটি ত্যাগী বালককে একবার বলিয়াছিলেন, আমাদের ভেতর যদি কেউ স্বামীজীর হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে—তো শরৎ।

বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পাশে ই-আই রেল কোম্পানী ইয়ার্ড—কারখানা বানাবেন ব'লে. একবার ঢেউ তুললেন। মঠবাসী এবং মঠের সুহৃদ্‌বর্গ সবাই প্রমাদ গণিলেন। .এই ভাবী বিপদের সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃদ্ধা জো—যথাসাধ্য চেষ্টার দ্বারা সেই মেঘ, কাটাবার সহায়তা করছিলেন। তিনি ঐ কর্ম ব্যাপদেশে বাংলার মান্যবর গভর্নর বাহাদুর প্রমুখ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বক্তিবর্গের নিকট হইতে মঠের আনুকূল্যে শেষ নিষ্পত্তি করিয়ে নিয়ে ষ্টীমারে চড়ে ফিরছিলেন। সেদিন ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, শনিবার। ষ্টীমারের জেটীর উপর কলিকাতা বাগবাজারগামী স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দেখা। স্বামী সহাস্যে বল্লেন,—Victory to you Tantine! টানটীন্, তোমারই জয়জয়কার। লড়াই তুমিই জিতলে। জো তখনই দাঁতে দাঁত দিয়ে দৃঢ়স্বরে চেঁচিয়ে বিবেকানন্দের গগনস্পর্শী দেউলটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বল্লেন,—Victory to *me*—Svami! Victory to that piece of Solid Rock which is seated over there! আমার কিসের জয়? ঐ অচল অটল নরেন্দ্রাদ্রিরই জয়। ছাখো ছাখো, চেয়ে ছাখো, সে ঐ মঠে এখনও বসে আছে। স্বামী ঐরূপ প্রাণদ, সহজ, বিশ্বাসের সত্য উক্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার সুবিশাল বুকখানা যেন আরও চওড়া—প্রশস্ত হয়ে গেল। মুখে মাধুর্য শতগুণ ফুটে বেরুল। তিনি সামান্য ক্ষণ নির্বাক্ রহিলেন।

বিবেকানন্দ বেলুড়কে যেভাবে গড়তে চেয়েছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে কার্যে পরিণত হতে চলেছে। ঠাকুরের মন্দির এখনও তাঁহার প্ল্যান অনুযায়ী গড়ে উঠে নি। ১৯৩৪—যেখানে এখন ঠাকুর পূজা পাচ্ছেন সেটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। জো কল্পনার নয়নে বেলুড় মঠের ভবিষ্যৎ মহিমা ও সম্প্রসার,—নবজাতি সংগঠনের সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতীকরূপে, সবই দেখতে পান বলিয়া বিশ্বাস করেন। আর সেই পথে ঐ মঠকে এগিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণ কাজ করেন। বড়গলায় বল্লেন, ওরে দেখবি শিগগিরই সেইদিন এলো বোলে, যেদিন এই গঙ্গার তীর থেকে সুরু করে তোদের,—আমাদের এই মঠ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। And you have your Ramakrishna Temple on that central place, Grand Trunk Rd! আর ঐ সদর রাস্তার বুকের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির তোয়ের হবে।

মানুষকে এই দীর্ঘ জীবন ধ'রে যাঁর ভাব, যাঁর আদর্শ বেঁধে রাখতে পেরেছে সেই মানুষ যে মহাশক্তির মহা-আকর সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বিবেকানন্দের কীর্তির এই একটা দিক। জোর সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন, বিদেশে যখন আমাদের দেখবার কেউ ছিল না, তখন ইনি ও এঁরা আমাদের কতো করেছেন।

শ্রীবিবেকানন্দকে কখনও কখনও একান্ত আপনার ঘরোয়া লোক ভাবতে ইচ্ছা হয়। বাহিরের নামযশের ভেতর তাঁর যে স্বভাবসুন্দর সাদাসিদে ভাব, সেটা অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। শিষ্যসন্তানদের সম্বন্ধে তিনি সর্বদা কতটা চিন্তান্বিত থাকতেন, তাদের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি, সংসারের সব খবর জানবার জন্যে কতটা আগ্রহযুক্ত ছিলেন, আর কতটা শিশুর মত সরল ছিলেন, তা' কতকগুলি পত্রের (এখনও অপ্রকাশিত) স্মৃতি হইতে খণ্ড খণ্ড অংশ উদ্ধার (তর্জমা) করিয়া দিলে বুঝা যাইবে। বিবেকানন্দ বিলীনা ভগ্নী কৃশ্চিনা আমাদের অপার স্নেহ করিয়া,—৮নং বসুপাড়া গৃহেই, তাঁহাকে লিখিত পত্রগুলির টাইপ কপি পড়িতে দিয়াছিলেন।

—গুরুর নূতন স্থান, এতদিনে হয়েছে (বেলুড়মঠ)—সেটা আমার একান্ত বাঞ্ছিত ছিল। মাথার এক মস্ত বোঝা নেমে গেছে।… …তোমাদের ওখানে বড় গরম লিখেছ। এখানেও খুব গরম।……কাঁঠাল বলে একরকম ফল এখানে আমাদের বাগানে, ফলেছে। তার এক একটা এত বড় যে, একজনে অতিকষ্টে তাকে ঘরে বয়ে নিয়ে আসে। ইচ্ছে হয়, তোমায় একটা পাঠাই, কিন্তু পথে যেতে যেতেই যে নষ্ট হয়ে যবে!

আর মঠের সামনে ছোট ছোট অসংখ্য জেলে ডিঙিতে ইলিশ্ মাছ ধরছে। এ মাছের আস্বাদ খুব চমৎকার! আবার যা মা গঙ্গায় জন্মায় তার আর তুলনা নেই। কিন্তু, এও তোমাকে পাঠাবার যো নেই।……গরমে রোজ ঘোল খাবে। ঘোল এই ভাবে তৈয়ের করে নেবে।……।

—তোমার শরীর সম্বন্ধে খুব খুঁটিনাটি সংবাদ দেবে। আর সকলের কথা লিখেছো, নিজের কথা লেখো নাই কেন?—তোমার শরীর একে স্বভাবতঃ দুর্বল। শরীরের উপর খুব যত্ন নেবে। ওটাকে অযত্ন কর্‌লে চল্‌বে না। সহরের বাগানে সন্ধ্যের সময় গিয়ে তারের দোলনায় দোল খাবে। তা হ'লে ঝিরঝিরে হাওয়ায় ক্লান্তি কেটে যাবে।

—তোমার মাতৃ-বিয়োগের সংবাদ পেয়ে, দুঃখিত হলুম। কিন্তু তোমাকে

সান্ত্বনা দিয়ে, অবমাননা করব না। আমি জানি, তোমার চমৎকার সদ্‌গুণ, ঈশ্বর নির্ভরতা আছে। আমি তোমায় মহামায়ার পাদপদ্মে ফেলে দিয়ে, নিশ্চিন্ত আছি। আর তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় গরবের কথা আমার কাছে এই, যে তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার ক'রে বোনগুলোকে তাদের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছ, দিচ্ছ। মায়ের সেবা করেছো।

এবার তোমাদের দেশে আর বক্তা সেজে যাবো না। অত্যধিক পরিশ্রম করে বড় ক্লান্ত, কাতর, বড় কাবু হয়েছি। এবার গিয়ে কোন কথা কইব না। এবার ছুটি ভোগ করবো। খাবদাব বেড়িয়ে বেড়াব। নিশ্চিন্ত হয়ে, যাতে তোমাদের বাড়ীতে সেই বিশ্রাম পাই, সেই ব্যবস্থা তুমি করবে। এখন থেকে লাগো। প্রতি মাসের আয় থেকে, কিছু কিছু ক'রে, আমার জন্যে জমাবে। বুঝলে ?—অন্যথা না হয়। (কৌশলে কি ইহা মিতব্যয়িতার উপদেশ ?)

সিস্টার ক্রিষ্টিন ২৭শে মার্চ ১৯৩০ নিউইয়র্কে তনুত্যাগ করিয়া, গুরুপাদপদ্মে বিলীনা হইয়াছেন। দেহান্তক্ষণে মুখে স্বর্গীয় হাসি। তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার শরীর হিন্দু মতে পোড়ানো হইয়াছিল। ইনি ১৮৯৪তে মার্কিনের ডিট্রইট সহরে প্রথম স্বামীজীর দর্শন লাভ করেন। সহস্র দ্বীপোদ্যান পার্কে বললেন,—যদি আজও যীশু বেঁচে থাকতেন পৃথিবীতে, তা হলে তাঁর কাছে গিয়ে আমরা বলতুম, হে নাথ, তুমি আমাদের শিক্ষা দাও।—তোমার (স্বামীজীর) কাছেও আমরা সেই ভাবেই এসেছি।

বিবেকানন্দ বললেন, "বটে, কিন্তু বাপু, যদি যীশুর মত আমার অসামান্য অধ্যাত্ম-শক্তি থাকতো, তা হ'লে আর বলতে হোত না। এই মুহূর্তেই আমি তোমাদের মুক্ত ক'রে দিতুম।"

ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়া, আচার্যদেব পরে বলেছিলেন,—আমার শিষ্যবৃন্দ যাঁরা শত শত মাইল পরিভ্রমণ করে, আমাকে খুঁজতে এসেছিলেন,—তাঁরা বর্ষার বারিপাতের ভিতর আঁধারে এসেছিলেন।

সিস্টার ক্রিষ্টিন্ যোসেফিনের সঙ্গী,—প্রায় সমবয়সী। স্বামীজী বলেছেন, ক্রিশ্চিনার মত পবিত্র আধার ও-দেশে বিরল দেখেছেন। এঁর পবিত্রতার সঙ্গে স্বামীজী ফুলের উপমা দিয়ে গেছেন। জো এঁকে খুব ভালবাসতেন। বেলুড়ে কিছুদিন কাছে রেখেছিলেন। ক্রিশ্চিন এদেশী ঠাকুরমায়ে রূপান্তরিতা হয়েছেন, দেখেছি। আর বিবেকানন্দের লাল পদচিহ্ন একটুকরো কাপড়ে তুলে নিয়ে সেটিকে বুকে রেখে, অসুস্থ অবস্থায়, শুয়ে ঈশ্বর চিন্তা করছেন দেখেছি।

জপতপরতা। লেখাপড়ায় বেশ পাকারকমের জ্ঞান। শিক্ষা-বিজ্ঞানে, হাতে নাতে শিখাইবার ক্ষমতায় বেশ পোক্ত। আমাদের মেয়েদের নিয়ে অনেককাল কাজ ক'রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ব'লে, আমাদের মাতৃসমাজের অভাব অভিযোগ, জীবনগতি বেশ সুন্দর আয়ত্ত ছিল। বাংলা জানতেন, বলতে পারতেন, পড়তে পারতেন, বঙ্কিমবাবুর বই কিছু কিছু পড়তেন। আরও অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষায় দখল ছিল। তবে কেতাব-টেতাব এঁর হাত দিয়ে বেশী বেরোয় নি ব'লে, লোকসমাজে তত সুপরিচিতা নহেন। কিন্তু দেখিলাম, কি সুন্দর নিজেকে চেপে রাখবার ভাব। আচার্যের একটি চমৎকার স্মৃতিকথা ইংরেজীতে লিখেছিলেন। টাইপ্ কপি পড়তে দিলেন! বললেন—"বশীকে দিয়ে যাচ্ছি। আমি বিদেহ হলে ছাপাবে।" সাময়িক পত্রে এইগুলি ছাপার হরফে পরে পড়েছি।

ক্রিষ্টিন্‌কে লইয়া বাংলাদেশে পুরস্ত্রী-শিক্ষা কার্য বিবেকানন্দ চালাইয়াছিলেন। ইনি মার্কিনের একজন বহুকালের অভিজ্ঞা স্কুল-শিক্ষয়িত্রী। ১৯০২ সালের প্রথমভাগে কলিকাতা আগমন করেন। ১৯০৩ সনের শরৎকালে নিবেদিতা ইঁহারই সাহচর্যে বালিকা বিদ্যালয়ের আরম্ভ বাগবাজার বসুপাড়ায় করেন। ভারত-প্রথিতা নিবেদিতা ইঁহারই সহকর্মিণী। শেষজীবনে দেখিলাম সিস্টার ক্রি'র ভিতর অতুল অন্তর্মুখীনতা প্রকট। এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীর চিরব্রহ্মচারিণী মানসকন্যার যে এরূপ হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধই। নিবেদিতা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"আজ পর্যন্ত বোসপাড়ার বালিকা-বিদ্যালয়ের যে সাফল্য হয়েছে, তার জন্য ভগ্নী ক্রিষ্টিনের সততা এবং নূতন কর্ম সুরু করিবার উদ্যমই দায়ী।" অবশ্য নিবেদিতার ত্যাগ ইহার শ্রেষ্ঠ পাথেয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ক্রি ১ম মহাযুদ্ধের পূর্বে পাশ্চাত্যে চলিয়া যান, ১৯২৪ এ ভারতে আসেন।

স্বামীজী অনেক ছাপ রেখে গিয়েছেন। অশীতি-উর্ধ্বা মাতা সেভিয়র পত্নী। তিনি যখন মায়াবতী হিমালয়ে থাকতেন, তখন জপমালা নিয়ে হিন্দুস্থানী চালে নাম জপ করতেন। কোন বালক সন্ন্যাসীকে একদিন বললেন—"ছাখ্ আমি বিবেকানন্দ—নাম জপ করি। তিনিই যে ক্রাইস্ট্ স্বয়ং!"

জগৎপ্রসিদ্ধ গায়িকা ফরাসী মহিলা মাদাম্ কাল্‌ভে, বিবেকানন্দকে ঈশার আসন দিয়েছেন। ইহা নিছক গুরুভক্তি নহে। গুণেরই আদর। আর, মিস্ নোব্‌লকে বিধিমত ব্রহ্মচর্যদানে, নূতন ভারতীয় নামে বিভূষিত করিয়া,

একেবারে খাস হিন্দুতে তিনি পরিণত করলেন। তিনি নিশ্চিতই কোন যাদুমন্ত্র জানতেন। বিবেকানন্দ একখানি পত্রে, তাঁহার বিদেশী ভক্তবৃন্দকে লিখেছিলেন—যদি পরনে ত্যানা, আর সাধনে মহাসাগরের মত বিশাল পয়গম্বরকুলকে দেখবার বুকের পাটা থাকে, সাহস থাকে, ভারতে এসো! নতুবা, এসে কাজ নেই।

বিলাস-ব্যসন-বিভূষিত পাশ্চাত্য হ'তে এনে, একেবারে এক নগণ্য অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র হিন্দু-পল্লীর আবাসে কলিকাতায় নিবেদিতাকে ভারতের প্রাণের সন্ধান দেবার জন্য শ্রীগুরু তুললেন। ভারত কি চক্ষে ভগ্নী দেখেছিলেন, তা তাঁর অমৃতময়ী সাধনাময়ী বাণীর ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে, আজও যিনি ইচ্ছা করবেন, তিনিই দেখতে পাবেন। স্থূলে নিবেদিতা নাই বটে, কিন্তু সূক্ষ্মে তিনি এখনও বাংলার কুটীরে কুটীরে তুলসীমঞ্চের মাটিতে, হাতে যাগ-পিদিম ধ'রে, মায়ের মঙ্গল-আরতি করছেন—ঘন ঘন গড় করছেন, কল্পনা করিতে ইচ্ছা যায়। সত্য সত্যই, হে বিবেকানন্দ, তোমার নিবেদিতা ভারতমাতার পুণ্যবেদীতে প্রস্ফুটিত নির্মল কুসুমের মত সত্য শিব-সুন্দরের পূজায় উৎসৃষ্টা। হাঁটুগেড়ে শাড়ী পরে ব'সে উদ্বোধনে বাংলার দুলালীদের সঙ্গে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করে জীবন সার্থক করেছেন। পুস্তক মারফতে তাঁর জ্ঞান দেশ বিদেশে সুপ্রথিত। চুয়াল্লিশে দেহান্ত হ'ল। তখন রজোগুণের পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁহার ভিতরে। কাঁধে জোয়াল নিয়েই—ক্রুশ তোমারই দেওয়া, বহনের শক্তি—তাও তোমার,—বলতে বলতে শিবক্ষেত্রে দুর্জয় লিঙ্গে ১৯১১ তে শিব-সান্নিধ্য পেলেন। অলক্ষিতে যেন বিবেকানন্দ বললেন, সাবাস বেটী আমার!—চমৎকার খেলা খেলেছিস্।

উদ্বোধনে বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম, শশী মহারাজ শয্যাশায়ী আছেন। একদিন শুনিলাম, তিনি চীৎকার করিয়া একজন সমাগত ভক্তকে বার বার বলছেন, "বল,—নরেন শিব,—নরেন শিব,—নরেন শিব।"

নরেন্দ্র শিব—অংশে জন্ম লইয়াছিলেন।

শৈশবে দেখা আছে, নিবেদিতা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বসে, শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সঙ্গপ্রাপ্তা শ্রীযোগীনমাতার কাছে, সাগরেদের বিনম্র মুদ্রায় ভারত কথা, পুরাণগাথা কত দিন শুনেছেন ও পুস্তকের মালমসলা সব সংগ্রহ করেছেন।

এমনি ধারা, ভারতের ভিতরে ও বাহিরে, মানুষের জীবন নিয়ে, তিনি—ছিনিমিনি খেলে গেছেন! সত্যের, সতের, কল্যাণের মার্গে, কত জীবন

যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন, তার আর ইয়ত্তা নাই! এবং সবটাই, সুশিল্পীর মত,—প্রত্যেক লতাকে তার প্রকৃতি,—তার প্রবৃত্তি, তার আকৃতি, পূর্ণভাবে বজায় রেখে গঠন দিয়ে গেছেন।

একজনের কাছে এক পত্রে বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় মূল্যবান্ একটি কথা অতি সহজভাবে, অকপটে, লিপিবদ্ধ করেছেন। হে বিবেকানন্দ-মুগ্ধ বাংলার তরুণ! আজ আপনাদিগকে সেই কথার ভাবটি শুনাইতে চাহি। তুমি আমি যতই হীন হই, আমাদের নয়নমণি, মাথার মুকুট, বাংলার দুর্দিনের গরব, যে কি জিনিষ ছিলেন, তার সন্ধান ইহাতে পাইবেন।—

Do you know why I have nothing to worry about?—nothing to grumble, complain of?—That's because, even my most wicked deeds in life, were done *for others, not for me.*

জীবনে আমি সবচেয়ে সুখী। কারুর বিরুদ্ধে গজ্‌গজ্ করবার আমার কিছু নেই। অভিযোগ, নালিশেরও কিছু নেই। যা' কিছু খারাপও করেছি, তাও পরের জন্য। অপরের স্বার্থ-সিদ্ধি তা'হতে হবে বলে। নিজের জন্য কিছু নয়।—ইহাই শ্রীবিবেকানন্দের মর্মের ইতিকথা। এরূপটি না হলে রিক্তহস্ত, ন্যাংটার দ্বারা অত কাজ করা সম্ভব হ'ত না। এখানেই তাঁর অত্যদ্ভুত সাফল্যের কীর্তিস্তম্ভ—পাকা বনিয়াদ। আর কত বড় অসীম সাহসী হ'লে বুকঠুকে একথা বলতে পারে। ক্রিষ্টিন্‌কে লিখিত চিঠি এখনও প্রকাশ হয় নি। ভাবার্থ মাত্র দেওয়া গেল। হে তরুণ তোমরাই জাতির আশ্রয়স্থল। এই সব সূত্র ধরিয়া স্বামীর জীবন আলোচনা করিলে খেই হারাইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে কয়েকটি স্মৃতি-কণা

যিনি যেটুকু স্মৃতি পেয়েছেন আজ তাই-ই তাঁর পরম সম্পদ। সুখের দিন বলে গণনা করছেন। ডাক্তার দুর্গাবাবুর চুল পেকেছে। তিনি একদিন কথায় কথায় শ্রীনরেন্দ্র প্রসঙ্গে বলেছিলেন—একবার ট্রেনে তিনি যাচ্ছেন দার্জিলিংএ, বাঁড়ুয্যেদের সঙ্গে। আমি বাড়ুয্যেদের তুলে দিতে গিছলুম। একটা লম্বা

গেরুয়া, আলখাল্লা পরা। পায়ে একজোড়া মাদ্রাজী শ্লিপার। যেন কাউকে 'কেয়ার' নেই। আলুথালু অবস্থায়—চেটাং চেটাং করতে করতে একখানি ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে উঠলেন। সাহেবগুলো, বাঙালী, হিন্দুস্থানী—স্টেশনে যতলোক ছিল, সব হাঁ করে চেয়ে রইল। ব্যক্তিত্বের অকাট্য আকর্ষণ Magnetism of personality.

আর একবার আমরা জনকয়েক কলেজের ছোঁড়া বিকেল নাগাদ, চড়ুই-ভাতি করতে বেলুড় গেছি। নীলাম্বর মুখুয্যের, গঙ্গার ওপর, বাগানবাড়ীতে তখন ভাড়াটে বাড়ীতে মঠ। স্বামীজী দেখেই খুব খুসী। গুপ্ত মহারাজ (সদানন্দ) লম্বা চওড়া খুব বলবান্ সুন্দর চেহারা; Lawnটায় পায়চারী কচ্ছিলেন—যেন কোন দেবতা। তাঁকে তখনি বল্লেন—ওরে গুপ্ত, এই ছোকরারা সব এসেছে। এদের তাড়াতাড়ি একটা খাবার ব্যবস্থা করে দে। আমরা বল্লাম—না। আমরাই করে নেব এখন। যা হোক, গুপ্ত মহারাজ খুব Expert পটু ছিলেন। ঘণ্টাখানেকের ভেতরে চমৎকার খিচুড়ি ও মাংস করে এনে হাজির। স্বামীজী তাঁর সেই Peculiar strong (নিজস্ব) চড়াস্বরে বললেন, "নে সব খেয়ে নে।"—যেন কত আপনার!

আর একবার কি একটা খাওয়াদাওয়া ছিল। আমি এমনি গেছি। অতি সহজভাবে বললেন,—"আয়!—ওরে একে, একখানা পাত দেতো। বোস্! খা!" তাঁর Voice গলার আওয়াজ—সে একটা চমৎকার জিনিস। অমন কারু শুনি নি। কথা একবারে লোকের Heart এ (হৃদয়ে) পৌছতো। ধাক্কা দিত। গঙ্গার স্টীমারে যেমন ভক্ ভক্ ক'রে স্টীম ছাড়ে, সেইরকম, এক একটা impression দিয়ে যেতো। ভুলতে পারা যেত না। গাঁথা থাকত। যেন বুলেটের মত থাপে থাপে লোকের আঁতে গিয়ে বসছে। আর ঘা মারছে।

নীলাম্বরবাবুর বাগানে একদিন। আমরা তখন গেছি। এমনি; ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছু বুঝি নি। বিশ্ববিখ্যাত য়ুরোপে নামকরা বিবেকানন্দ দেখতে গেছি। কি চিঠি-পত্তর লেখাচ্ছিলেন। বড়ো ব্যস্তসমস্ত। বাবুরাম মহারাজ এসে বললেন, "চান্ করবে চলো। বেলা হয়েছে ঢের।" বললেন, "যাচ্ছি, চ।" তারপরেই উঠলেন।

কিছুক্ষণ পরে, কামারপুকুর অঞ্চলের একটি পল্লীগ্রামের,—আস্ত গেঁয়ো-লোক যাকে বলে, একেবারে ঠিক তাই,—এলো। ঠাকুরের আমলের লোক, মালুমে বোধ হ'ল। দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করতো। অত বড় যে বিবেকানন্দ

—তিনি তা যেন এক নিমেষে ভুলে গেলেন। তার সঙ্গে সহজ, সরলভাবে, আগেকার ঘরওয়ানা রকমে ব'সে আলাপ-সালাপ হাসি ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগলেন। ঠাকুরের দেশের লোক বলে খুব খাতির। খাবারদাবার ব্যবস্থা—করলেন। সে লোকটি ত গোড়াগুড়ি একটু অবাক্ অবাক্ ভাব দেখাতে লাগল তারপর সবাই এক হয়ে, মিলে মিশে গেল। আবার যখন গম্ভীর হতেন কার াধ্য এগোয়।·········আমাদের সামনে ত দেখলুম খুব active লোককে ালি কাজ করতে, organise করতে বলছেন। রজোগুণ·········বেলুড় ঠের গঙ্গার ধারে বারান্দায় একদিন দেখি, একা পায়চারি করছেন। আর গুন্‌গুন্ করে আপন মনে গাচ্ছেন—পিলেরে অবধূত হো মাতুয়ালা, পিয়ালা হরি সকরে। ছবি! ছবি!

* * *

সারদানন্দ স্বামীর পূর্বাশ্রমীয় ভাই নরেশ। অল্প বয়স। যাবেন জাপান য়ে মার্কিনে। সিংহের মত বেলুড়ে 'লনে' পায়চারী করতে করতে বলছেন,—যা—বাইরে। চোখ ফুটুক। ঘুরে দেখে আয়। খুব কাজ কর্। কিন্তু, ারতের Spirituality (অধ্যাত্মনিষ্ঠা) ছাড়িস্ নি। তা হলেই মুস্কিলে ড়বি।···············(সারদানন্দের দিকে ফিরিয়া) কিরে শরতা? তোর এই াইটাকে সাধু হতে বল না?" সারদানন্দ বলছেন,—"আমি কি জানি, ওর খন সময় হবে,······হবে।"

* * *

আর একজন গায়ক। ভক্ত পুলিন। বলছেন, মারী পাহাড়ে স্বামীজী iabetes এ ভুগে change এ গেছেন। সেইখানেই প্রথম দেখা। শরীর াহিল। —আমরা একটা বাঙালী মেসে থাকতুম। সেখানে একদিন বেড়াতে াছেন। সঙ্গে গুপ্ত মহারাজ আছেন। বদ্যিতে তাঁকে গান করতে মানা রেছে। কিন্তু, আমার ঘরে একটি তানপুরা দেখে, ভারি খুসী হয়েছেন। বেঁধে াইতে আরম্ভ করলেন—"গাও জীব জন্তু আদি যে আছ যেখানে।" গানটার ইখান থেকেই ধরলেন। গুরুগম্ভীর জমজমাট, খাসা গলা। শুনেই মনে হল, চরাচর এমন গলা শোনা যায় না। গুপ্ত মহারাজ হুঁস্ করিয়ে দিলেন মহারাজ—তবিয়ৎ ভাল নয়। আপনার গান গাওয়া মানা আছে।" "আরে, রখে দে তোর ডাক্তার-ফাক্তার।"

আমার শরীর দেখে—(বক্তা টকটকে গৌরবর্ণ। [illegible]বর্ণ বাঙালীর চেয়ে

বেশ দীর্ঘকায়। সুগঠিত সুচারু, সুন্দর দেহ, সুপুরুষ। বহুলোকের ভিতর দাঁড়াইয়া থাকিলে অগ্রে তাঁহারই উপর নজর পড়িবে।)—ও গান শুনে ভারী খুসী হয়েছিলেন। আর বলেছিলেন;—"বাবা! ব্রহ্মচর্য? ব্রহ্মচর্যই আসল। সত্যেন লভ্য স্তপসাহ্যেষ আত্মা… ‥ব্রহ্মচর্যেন নিত্যং"—কি সুন্দর, শুদ্ধ, সংস্কৃত আবৃত্তি!

* * *

পরমহংসদেবের চরিত—বিশ্লেষণ যতই করা যাচ্ছে, যতই তাঁর সম্বন্ধে ভাবা যাচ্ছে, ততই একদিক দিয়ে মনে হচ্ছে, তাঁর মত কর্ম-কৌশলী—'কাজের লোক' বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি দুনিয়ায় দুটি মেলা ভার। যে, যেভাবের কথা ধরতে পারবে, পালন করতে পারবে, তার কাছে মাত্র তদ্ভাবের কথা কইতেন। যাদের সংসার-ত্যাগীরূপে ভবিষ্যতে জগতের সামনে দাঁড়াতে হবে, তাদের কাছে খালি ত্যাগের মহিমা, ত্যাগের মাহাত্ম্যকথাই প্রায় বলিতেন। তাঁহারই বালক গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) একদিন কথায় কথায় বললেন—বলরামবাবুর বাড়ীতে বেশ মনে পড়ে একদিন হঠাৎ বলে উঠলেন (আমরা সব চারপাশে)—"কামিনীকাঞ্চন হ্যাক্—থু! হ্যাক্—থু! হ্যাক্—থু!" অনেক বার একটি আওড়াতে লাগলেন। শেষে থুথু তাঁর মুখ থেকে মেজেতে পড়তে লাগল। আমাদের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়ে দিলেন—ওজিনিস দুটো কি জঘন্য। হাজার লেক্‌চারেও ঐরূপটি হবার উপায় নাই। তাঁর অন্তরের সব শক্তি ঐ কথাগুলির ভেতর ফুটে বেরুতে লাগল। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে—বড়দরের বদ্ধবিষয়ী কেউ কথা কয়ে উঠে গেল, আমায় বলেছিলেন—ঐ কোণে জালায় গঙ্গাজল আছে, ছিটিয়ে দে,—শালা, কামিনী-কাঞ্চনের দাস! ঐ জায়গাটায় বসে সাত হাত মাটি নোংরা করে দিয়ে গেলো।……তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়ে ভক্তকে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে দিতেন। কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়ে এক ভক্তকে বললেন—শিব ছাখ্। সে সত্য সত্য দেখলে,—শিব, বিরাট, চৈতন্যময়, মন্দির ফুঁড়ে যেন উঠে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি ঐ কথা উচ্চারণ করে, শিবের দিকে আঙুল বাড়িয়ে—সমাধিস্থ! ভক্তটি প্রায় পনেরো মিনিট ঐ ভাবে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে রইল। ……কাশীপুর বাগানে তাঁর শরীর যাবার পর, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, চাঁদের চারপাশে এক জ্যোতির্মণ্ডল হয়েছে। শরীর ঠিক গেছে কিনা, তখনও সকলের সন্দেহ। চন্দ্রমণ্ডলের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। স্বামীজী সকলকেই ঐটি লক্ষ্য করতে বললেন।

অখণ্ডানন্দের মুখে, স্বামীজীর সম্বন্ধে আর একটি কথা এইখানে উল্লেখযোগ্য। স্বামী কখন কখন বলতেন, ওরে আজ আমার খাবার বন্ধ। শরীরে বিকারভাব এসেছে। কি সুন্দর সরলতা!

*   *   *

স্বামীজীর প্রসঙ্গে যোগীন-মার কয়েকটি টুক্‌রা কথা মনে পড়িতেছে। —আহা! তাঁর সেই সদাহাস্যময় মুখখানি মনে আসছে। যেন চোখের সামনে ভাসছে। জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। বেলুড় থেকে সকাল সকাল তাড়াতাড়ি অন্নপূর্ণার ঘাটে নেমে, আমাদের বাড়ী ঢুকলেন। ফটক পেরিয়ে, বারবাড়ীর উঠান থেকেই, ডেকে হেঁকে, চীৎকার ক'রে বলছেন, ও যোগেন-মা, আজ বেলায় কাজ সেরেসুরে এসে তোমার এইখানেই খাবো। ভাল করে এই এই রাঁধবে (বিশেষ লেখকের স্মরণ নাই)·········আবার একদিন বাবুরামকে রঙ্গ করে বলছেন,—ঢ্যাপো, ভেঁপু! —তোমার ও খালি হায়রে লিতাই, হায়রে লিতাই, আমার এ মঠে চলবে না। এখানে পড়াশুনা করতে হবে।······আমেরিকা থেকে ফিরে এসে, একদিন গল্পে গল্পে আমাদের বলেছিলেন,—"ওগো, অত নাম-যশ সম্মান-খাতির কি আমার শক্তিতে হয়েছে? না, ওসব হজম করাই আমার ক্ষমতা? আমি সেই মস্ত বড় সভায় বলতে দাঁড়িয়েই—অতলোক একসঙ্গে—গিস্‌ গিস্‌ করছে দেখে—কি যে বলব, কিছুই বুঝতে পারি নি। কখনও অত লোকের সামনে কথা বলা অভ্যেস ছিল না। একদম তৈরী ছিলুম না। আমার বাহ্যজ্ঞান চলে গেলো। আর দেখি কি, এই শরীরটার ভেতর ঠাকুর এসে, যা বলবার বলে যাচ্ছেন। যখন বলা শেষ করে বসে পড়লুম, তখনও আমি জানি না, আমি কি বললুম! আমি যেন অবশ!"

*   *   *

সারদানন্দ বলিয়াছিলেন,—স্বামীজী থাকতে থাকতেই, আমাদের ভেতরকেহ কেহ, তাঁর কাজকর্ম অন্যভাবে দেখতে আরম্ভ করেন। আমি তখন westএ (পাশ্চাত্যে)—এসে শুনলুম, একদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে, যোগেন স্বামীজী প্রভৃতি, এঁরা সব ঐ কথা বলাতে, তিনি অভিমান ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—যাঃ। ওরে, যোগে, তোরাও এই কথা বলছিস!—আর শরীর রাখব না। ছেড়ে দেবো।—এই বলে, নির্জনে বসে রইলেন। কারু সঙ্গে কথাবার্তা নেই। শেষে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আবার এসে তাঁদের বকাবকি করেন,—সর্বনাশ! তোমরা আবার এ কি করলে? এই

পাগল ক্ষ্যাপালে ?—তিনিই ঠাণ্ডাঠুণ্ডি করেন। আর বাস্তবিকই, যাঁরা তাঁর criticism (কটাক্ষ) করেছিলেন, তাঁদেরই বা দোষ কি ? তাঁরাও দেখলেন (মোটামুটি)—স্বামীজী আমেরিকায় গেলেন,—যে বক্তৃতা প্রভৃতি করলেন, তাতে বড় একটা ঠাকুরের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। যেন নিজের মহিমাই গেয়েছেন ! .

আর ত্থাখো, একথা ঠাকুরও বলে গেছেন। তখন ঠাকুরের সেই কয় রাত্র ঘুম হয় নি। মুখ চোখ লাল—flushed হয়ে গেছে। ঘরে আমরা সবাই বসে আছি। স্বামীজী ঢুকতেই তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, হাঁ, এঁর মত কেউ নেই। ত্থাখ্ ! তোকে এখন কেউ বুঝতে পারবে না। তুই ঠিক থাক্। তিন বার বললেন।

⋯ ⋯স্বামীজীর তখন দেওঘরে অসুখ। আমি attend (সেবা) করছি। রোগা হয়ে গেছেন। (এই সময়েরই একখানি ছবি আছে, সামনে ঝোঁকা, হাত দুখানির ওপর ভর দেওয়া, ফতুয়া পরা, দেখলেই মনে হয়, স্বামী অসুস্থ) আর ওরই ভিতর পাশ মোড়া দিচ্ছেন শুয়ে শুয়ে, আর বলছেন, দেখছিস্, এই ত্থাখ্ ! এটাকে বলে, গরুড়াসন, এটাকে বলে অমুক আসন ইত্যাদি। একদিন খুব Inspired (ভাবে গদ্‌গদ) হয়েছেন, তখন কার সাধ্য কোন কথার প্রতিবাদ করে ? বলছেন গাল দিয়ে, অমুকের কি দরকার ছিল, আমাদের কাজ পণ্ড করবার ? (যত শান্ত করবার চেষ্টা করি, ততই বেড়ে চলে।) ঠাকুরের উদার ভাবকে একটা বদ গোঁড়ামি কিম্ভূতকিমাকার দাঁড করালে। বললে, ঠাকুর অবতার, এটা আগে বলা চাই। কিন্তু আমাদের Method (কাজের প্রণালী) অন্য রকম। তাঁর Character ভাব দিতে হবে। তারপর লোকে আপনাআপনিই বলবে।

স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কথার টুক্‌রো সারদানন্দ একবার পূর্ণানন্দকে বলেছিলেন,—

⋯একবার স্বামীজীর শিষ্য শান্তিরামের বড় অসুখ। প্রাণ টেঁকে কিনা সন্দেহ। তার মা অত্যন্ত কাতর হয়ে স্বামীজীকে খুব জিদ করে ধরলেন, কিছু মিছু করে শীঘ্র শীঘ্র তাকে আরাম করে দিতে। আমাদের সামনেই তিনি খানিকটে গঙ্গাজল আনতে বললেন, একটা বাটি করে। তারপর সেই জলটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আশ্চর্য ! জলটা গরম হয়ে তা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। তিনি বলিলেন, যাও, ওকে খাইয়ে দিও একটু একটু করে। বাকী

যেটা থাকবে, ঘরে রেখে দিও। বাড়ীর কারুর শক্ত ব্যারাম হ'লে ব্যবহার করবে—তা বুঝলে, এই দেখনা, Miracle (অলৌকিক ক্ষমতা) যে কথা তুমি তুললে, তা—তাঁর যথেষ্টই ছিলো। তবে সব জায়গায়—ওগুলির ব্যবহার করতেন না। আর ঠাকুর'ও নিষেধ করতেন।)

—ইহা ছাড়া আমরা বিবেকানন্দের, পাশ্চাত্যদেশে ক্রিস্টিনে প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া,—এইভাবে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দান সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তের কথা অবগত আছি—তাঁকে তিনি—বলিয়াছিলেন, "ছাখো, খুব যখন কষ্ট হবে, দিন চলে না, ঘরে খাবার নেই, খেতে পাচ্ছ না, খালি তখন এই ব্যাগটি খুললেই অর্থ পাবে। এর অপব্যবহার করলে, কোন ফল পাবে না। সাবধান।—পাঠকের এই সব বিশ্বাসে আসিবে কি না, কে জানে?

* * *

স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌরবাবু বলিতেছেন। তখন তাঁর বয়স পনের ষোল। বেলুড়ে থাকতেন।

(বেলুড় মঠে তখন—তিনি থাকতেও বেশী লোক সমাগম হোত না। গিরিশ-স্মৃতি-মন্দিরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালেই তখনকার মঠের ফটক। এখনকার মত পাকা নহে। রাত্রে ঠাকুরের ভোগ নামিয়াছে। আমরা সবে খেতে বসেছি। হঠাৎ মালি বলিল, এক সাহেব আসিয়াছেন। তখন দশটা। সাহেব চাবির জন্য অপেক্ষা করতে পারিলেন না। তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া মঠভূমির উপর ঝম্প প্রদান করিলেন। মজার সাহেব, বাবরী চুল—টেরী। ঠিক ছবির মত। সাহেবী পোষাকেও চমৎকার মানিয়েছে! "ওরে, বাবুরাম, কি আছে নিয়ে আয়। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। আমি পালিয়ে এলুম্।" সে রাত্রে হইয়াছিল—খিচুড়ী আর মঠেই উৎপন্ন কাঁচ-কলার ডান্‌লা।

বাবুরাম মহারাজ আহ্লাদে আটখানা। "কি খাবে? একটু বোস না, লুচি ভাজিয়ে দিচ্ছি"।—"আরে, না, না। ঐ বেশ হবে। অনেক দিন—খিচুড়ি খাই নাই।")

সারা রাত গল্পে কেটে গেল। Main buildingএ বড়দার ঘরের দিকের ঘরখানিতে সবাই জমায়েৎ। স্বামীজী ঐখানে একখানি চৌকির উপর বসিয়া গল্প জমাইলেন। গল্পের রাজা।

সকালে নাপিতের ডাক পড়িল। চুল কাটিয়া ফেলিলেন। যে ভারতীয় সন্ন্যাসী—সেই ভারতীয় সন্ন্যাসী।

অল্প লোক—তখন বেলুড় মঠে। কিন্তু কি জমাট! ১৯০১এর কথা মনে হচ্ছে। সারারাত্র প্রহরে প্রহরে শিবপূজা—ঠাকুরঘরে হইতেছে। আর ঠিক তারই নীচে বারাণ্ডায়, পাখোয়াজ সঙ্গতের সহিত তানপুরা হস্তে স্বামীজী গান গাহিছেন। গলাটি যেন একটি তানপুরা—চমৎকার। যেমন গম্ভীর, তেমনি সুমিষ্ট। (মনে হইতেছে—স্বামীজীর গলার উদাহরণ দিয়া সারদানন্দ মহারাজ বলিতেন—গলার জোয়ারী খুলিয়া গেলে, গলা হইতে একটি অপূর্ব রেশ বাহির হয়। ইহা স্ব-সংবেদ্য। ধাতবিক পদার্থের উপর আওয়াজ করিলে যে রেশ উঠে, গলা হইতে তখন, তাহাই উঠিতে থাকে।) শিব হইয়া শিবের নাম গানবন্দনা, ভজনে সকলকে মোহিত করিলেন। (আর একটি ভক্ত বলেছিলেন, ঠিক এইভাবে একদিন, বিভূতি মাখিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে তিনি স্বরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা গাহিয়াছিলেন। গিরিশবাবুকে জোরপূর্বক লাল কাপড় পরাইয়া 'ভৈরব' সাজাইয়াছিলেন। নীলাম্বরের বাগানে। পাঁচজনের ভিড়ের মধ্যে গোপালের মা বলিলেন, তোমরা সবাই একটু সর, আমি শিব দর্শন করি।) নির্মলানন্দ ও আত্মানন্দ পাখোয়াজ বাজাইলেন। সারারাত আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। কি পবিত্র, কি মধুর, কি স্বর্গীয়!

তিনচার দিন মঠের তিনটি পাইখানার ময়লা সাফ্ হয় নাই। মেথর আসে নাই। তাঁর নাকে দুর্গন্ধ গিয়াছে। সটান ময়লার বালতি নিজে বহিয়া লইয়া—টালী খোলার দিকে, ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। ছেলেদের শরীর খারাপ হবে, এই ভাবনায় অস্থির। তাঁকে ঐ কাজ করতে দেখে যাঁরা যাঁরা এগিয়ে এলেন, তাঁদের সবাইকে ভীষণ দাবড়ি দিলেন। বল্লেন, এখন কেন? এতক্ষণ করতে পারো নি? একটি বালক একটি বালতি করিয়া জল ঢালিতে লাগিল। তিনি ঝাঁটা দিয়া, অতি সহজভাবেই সব পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কোন দ্বিধা নাই। কোন সঙ্কোচ নাই।

একাই ছিলেন একশো। আর কোন লোক আমাদের চোখে ঠেকে না আর এঁদের পরস্পর গুরুভাই গুরুভাইকে কি অদ্ভুত বিশ্বাস! কি ভালবাসা! মার পেটের ভায়েরাও এমন হয় না। কেউ মঠের কাজকর্ম সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বল্লেন, আমি কিছু জানি না। রাজার কাছে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যাও। তাঁর মন আমাদের মত দোকানদার ছিল না রাজাকে যে মঠাধীশ করেছেন, তো ষোল আনা মনে প্রাণে জানেন, রাজাই রাজা। আর নরেন তাঁর প্রজা (আমরা ইহাও শুনিয়াছি—পাশ্চাত্য হইতে

আসিয়া তাঁর কোন অভাবগ্রস্ত পূর্বাশ্রমীয় নিকট-আত্মীয়কে কিছু অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হইলে, রাজার মারফত পাঠাইয়াছিলেন।)

* * *

কৃষ্ণলাল মহারাজ বলেন—১৮৯৯, গিরিশবাবুর বাড়ীর সামনের গোলবারান্দা ওয়ালা ভাড়া বাড়ীতে যোগীন-স্বামীর দেহ গেল। বেলা তখন তিন্‌টে। মা (সারদা মা) উপরে আছেন,—স্বামীজী যোগেন মহারাজের দেহ আরতি করলেন। মিষ্টি ভোগ দিলেন। স্বামীজী শ্মশানে গেলেন না। গিরিশবাবুর বাড়ী বসে রইলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) গেলেন। স্বামীজী বললেন, এই কড়ি খসলো, এর পর একে একে বরগা প্রভৃতি খসে পড়বে। যতক্ষণ না প্রাণবায়ু গেল, স্বামীজী নিকটে ব'সে রইলেন। কোন নামটাম চেঁচিয়ে করলেন না। Silently pass করতে দিলেন। যোগীনস্বামীর মা (গর্ভধারিণী) দেখতে এসেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলে যেতে বললেন। ···

একদিন মার বাড়ী স্বামীজী খাবেন। বোস্‌পাড়ায়। কলায়ের ডাল হয়েছে শুনে, ভারি খুসী। খুব ভালবাসতেন। কোন লোকের সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বল্লেন, এর চাউনি ভাল নয়। তুই সাবধানে থাকবি। কোন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে যখন যোগেন স্বামী তার ভার নিলেন তখন স্বামীজী নিশ্চিন্ত হলেন। নেয়াপতি ডাবের ভিতর চিনি দিয়ে, সেই ডাবের খোলে বরফ দিয়ে খেতে ভালবাসতেন। বলরামবাবুর বাড়ীতে একবার দিলুম। খেয়ে ভারা খুসী। বল্লেন আঃ—চমৎকার। নে তুই খা। আমি খাচ্ছি। আবার বালকবৎ বলছেন,—আমায় আর একটু দেনা। এঁটোর জ্ঞান নেই। পশ্চিমে বেড়াবার সময় একপাতে নিয়ে খেতে বসেছেন।

আমরা মার বাড়ীর দ্বারী ছিলাম বলে, আমাদের তামাসা করে, কালীঘাটের পাণ্ডা বলতেন। শুদ্ধানন্দও বলেন, লাহোরে জগদ্‌বিখ্যাত স্বামীজীকে দেখলাম একটি নগণ্য ক্ষুদ্র ছোকরা ব্রহ্মচারীর উপর মায়ের মত যত্ন। এই হৃদয়বত্তাই বিবেকানন্দের বিশেষত্ব। ছোটর উপরও নজর। ছোটর উপরও প্রেম। একদিন কফির দানাগুলি বেশী ভাজা হইয়াছিল বলিয়া, সেবক কানাইলালকে, সেবার ত্রুটির জন্য স্বামীজী কানমলিয়া দিলেন। কানাই লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে ছিলেন। কর্তা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া হাসিতে হাসিতে বললেন—"দেখতে পেয়েছি, কানাই। আর কেঁদ না, বাবা!" তার পর গলা

জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সহিত বলিলেন—"ওরে কিছু মনে করিস্ নি। তোদের ভালবাসি, তাই এমন ক'রে ফেলি। তোরা আপনার লোক।"

কানাইলালের লজ্জা হইল। রাগ, অভিমান, ভালবাসার তপ্ত সংস্পর্শে বরফের ন্যায় গলিয়া—জল হইয়া গেল! স্বামীজী ভালবেসে কানাইলালের ন্যায় বহু চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। সেই দৈবী ভালবাসার আওতায় আসিয়া আপনাদের মহদ্ব্রহ্মসত্তা সম্যক্ ফুটাইয়া তোলা, অশুভ সংস্কারের চাপে হয়ত সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কৃষ্ণলাল মহারাজ বলেন,—তাঁর সঙ্গে যোধপুরের ম্যানেজারের বাসায় আমরা আছি। হরিদ্বার থেকে একজন সাধুর কাপড়পরা লোক এলেন। এক ঠোঙা জিলাপী স্বামীজীকে দিলেন। তিনি কিন্তু, কাউকে খেতে দিলেন না। রাজার হাতিকে খাওয়ালেন। আগত ব্যক্তি আশ্রম করবেন বলে, টাকার জন্য এসেছেন। ইচ্ছা, রাজার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়া কিছু পাইয়ে দেন। স্বামীজী নিজের সীমা বুঝতেন। তাঁর সঙ্গে ম্যানেজারের স্ববাদ। রাজাকে ওপরচড়াও হ'য়ে কিছু বললেন না। সেভিয়ারকে বললেন, দশটাকা দিতে! এই পর্যন্ত। স্বামীজী গুজ্ গুজ্ ভাব পছন্দ করতেন না। পরিষ্কার জবাব, স্পষ্ট কথা এবং দোষ স্বীকার পছন্দ করতেন। গিরিশবাবুর নাটকে আছে, ফাঁড়াদারের চার চোখ। স্বামীজীরও এই রকম ছিল। তিনি নিজেও বলতেন—আমার পেছনে দুটো চোখ। সামনে দুটো। প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে কলম্বোতে Diabetes রোগ প্রথম দেখা দেয়। তার পূর্বে শরীর বেশ চমৎকার ছিল। শেষে রোগা হয়ে গেলেন।

(স্বামীজীর জীবনে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ভক্তিধারার সম্বন্ধে, একবার পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন,—ঠাকুরের দেহত্যাগের পর, রোজ সকালে তাঁর বালিশ রোদে শুকুতে দিয়েছি। রোজই চোখের জলে ভিজে থাকত। ঠাকুরের জন্য আকুল নির্জন ক্রন্দন।)

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের মনের উদারতা ছিল অপরিসীম। পরমহংসদেবকে যদি কেউ অবতার বোলে না মানেন, তার জন্য তিনি কোন খেয়াল করিতেন না। তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠের আশ্রয়প্রাপ্ত প্রায় সকলেই পরমহংসদেবকে যুগাবতার বলিয়া মানেন। কিন্তু কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যদি অবতারতত্ত্ব না মানিয়া আত্মজ্ঞানকে স্বীকারে ইচ্ছুক থাকিতেন বা থাকেন, আমাদের মনে হয়,

তাহাতে স্বামীজীর আপত্তি হইত না। যদি কেহ ঠাকুরঘর বা ঠাকুরপূজা না পছন্দ করেন এমং ব্যক্তিরও সম্মান আপ্যায়নের অভাব হইত না। তাঁহার ন্যায় উদারমনা ব্যক্তিই আরও বলিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রতি মঠে সামর্থ্য মত ছাত্র রাখা হবে। তাদের মানুষকরা হবে। সৎশিক্ষা দেওয়া হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়াই তাহাদিগকে স্বাবলম্বীরূপে গঠন করা হবে। তাদের সঙ্গে কোন কড়ার থাকবে না। তাদের ইচ্ছা হয়, তারা মঠে যোগ দিয়ে সাধু হবে। কিম্বা সৎগৃহস্থ হবে। অধ্যাত্ম ধর্মের কি সুন্দর ব্যাখ্যাই না আচার্য বিবেকানন্দ তাঁহার জ্ঞানগ্রন্থে দিয়া গিয়াছেন।—আমি জীবনে অনেকগুলি অধ্যাত্মবলে বলীয়ান্ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। তাঁহারা প্রত্যেকেই বিচার-শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু, আমরা সচরাচর ভগবান বলতে যা বুঝি তা তাঁরা মানতেন না। আমার মনে হয়—তাঁরা আমাদের চেয়ে বেশী ভগবান্ বুঝতেন। ধর্ম বলতে—এই সব ভাবগুলিই তাহার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ঈশ্বর, অরূপ ঈশ্বর, অসীম ঈশ্বর, নৈতিক নিসর্গবিধি, আদর্শ মানবতা। এইভাবে ধর্মগুলি যখন উদার হইবে, তখন সেইগুলির লোকহিত-সামর্থ্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। (ইং জ্ঞানযোগ ১৪ পৃঃ)

তাঁহার অনুগামী স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কার্যকলাপে এইভাব খুব পরিস্ফুট দেখা যাইত। (কোন গরীব পুত্রশোকাতুর ব্যক্তি একবার তাঁর কাছে জুড়াইতে আসেন। তিনি তাঁকে বললেন,—শুনেছি এই অবস্থায় তীর্থভ্রমণ ভাল। আপনার ত' দূর তীর্থে যাওয়া, অবস্থায় কুলোবে না। অল্প ভাড়ায় দক্ষিণেশ্বর স্টীমারে যেতে পারেন। (তখন স্টীমার চলাচল ছিল) কলকাতার কাছে। আর সেখানে গিয়ে বসবেন, যদি সেটাকে তীর্থ ব'লে মনে হয়।)

আরও দেখা যাইত, নিজের মেজাজ খারাপ না করিয়া, তিনি পরমত-সহিষ্ণুতা যথেষ্ট প্রকাশ করতেন। যে সব ছেলেরা তাঁর খাইয়া মানুষ, তাহাদের কাহারও উপর, কোনদিন নিজের মত, জোরপূর্বক চাপান দিতেন না।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভীতি ভ্রংশী আচার্য বিবেকানন্দ

আদর্শের প্রতি অটুট মমতা ও টান থাকলে, নিঃস্ব হয়েও বড় বড় কাজ করা যায়। খাঁটি জীবন-বলির বিনিময়ে, কাজ হতে বাধ্য। তবে অনেক সময়, যথাযথ কালের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অনেক জিনিস, বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে প্রতিষ্ঠিত, সাফল্য মণ্ডিত হইতে দেখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মহত্মুদার জীবন, ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

শ্রমজীবীরা দুনিয়া জুড়ে কি করছে, চেয়ে দেখলে স্তম্ভিত হ'তে হয়! আরও করবে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ। পুরাণবর্ণিত শূদ্র বা কলিযুগ আমাদের দ্বারে দ্বারে, জগতের সর্বত্র দেখা দিয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের কেহ কেহ এই কলিযুগের অর্থ (কলিযুগ কথাটি পারিভাষিকভাবে লইয়া) 'লৌহযুগ' করিয়াছেন। বিজ্ঞানের পীঠস্থানে, ব্যবসার ক্ষেত্রে এখন লৌহ-ইস্পাতের ব্যবহার সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কামার, কুমার, ছুতার, হাড়ি, মুচি, মেতুয়া, মেথর—এরাই উঠছে। উঠবে। এই সাধারণ গরীবেই প্রথম ফরাসী বিপ্লব বাধিয়েছিল। তারপর একে একে কত রাজমুকুটকে পর পর, যুগে যুগে ধূলি-ধূসরিত করেছে। বোর্বনিজম্, জারডাম্, কাইজারডাম্—আর সর্বপ্রকার একচ্ছত্রাধিপত্যের ভাবকে দমিয়ে দিয়েছে। দিচ্ছে। অর্থৈকসম্বল ধনী মহাজনদের কাঁপিয়ে, কাঁদিয়ে দিচ্ছে। যত রকমে, জগতে দাসপ্রথা মাথা তুলেছে, তুলছে—সবার উচ্ছেদসাধনে দেশে দেশে গণশক্তি সচেষ্ট হয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে আসবে। অন্যায় অবিচার বেশী দিন প্রকৃতি সহ্য করে না। তাই ফরাসী রাজা ষোড়শ লুই রাজপ্রাসাদে পারিষদ-পরিবৃত হয়ে, স্তম্ভিতভাবে একদিন রাজ্যের সব সাধারণ প্রজাদের তাঁর বাড়ী ঘেরাও করতে দেখে আশ্চর্য চমকিত হয়ে, অপ্রিয় সত্য শুনতে বাধ্য হয়েছিলেন,—না রাজা, এ বড় বিরাট ব্যাপার। ছোটখাটো দু'দশ জনের গোলমাল নয়। এ ভয়ঙ্কর। এ রুদ্র। দেশশুদ্ধ সবাই ক্ষেপে উঠেছে। সাবধান!

যুবক বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ভাববাহী, সুকবি সত্যেন্দ্র, সাহসী তেজী সৈনিকের মত—মেঘমন্দ্র স্বরে বিবেকানন্দের ন্যায়ই বলিয়াছেন,—

অন্ধকারের বুক চিরে—ও কাদের সিংহনাদ ?
ভয়ের আঁধার ছিন্ন করা—জাগলো কি আহ্লাদ !

দুস্থের দরদী ন্যায়বিচারকারী প্রজারঞ্জনকারী রাজশক্তির উচ্ছেদ আশঙ্কা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। কারণ, যতই আমরা সব "সমান—সমান" বলি, গুণীর যোগ্য আদর প্রত্যেক মানুষ দিতে বাধ্য। দুনিয়ার অনেক দেশ বহুতন্ত্র ছাড়িয়া একতন্ত্র শাসন চাহিয়াছে। নামে কিছু আসিয়া যায় না, সুশাসন চাই।

দরিদ্র দেশকর্মী ও আত্মোন্নতিকামী ব্যক্তিকে বিবেকানন্দ বলছেন,—দরিদ্র তুমি, তাতে কোন ক্ষতি নাই। তুমি অজেয় হবে। তবে, কথা আছে,—তুমি কি সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য ? তা' যদি হও, তোমাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। বৎস, পবিত্র হও। প্রভুর প্রতি বিশ্বাস রাখ। ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা গরীব বটে, আমরা কেউ নই—সব ঠিক, কিন্তু, এইরূপ লোকেরাই প্রভু ভগবানের যন্ত্ররূপে কাজ করেছে। "Are you perfectly unselfish ?—If so. you are irresistible···Be holy. Trust in the Lord. We are poor, my brothers, we are nobodies. But such have been always the instruments of the Most High."

বড় বড় কাজ এরাই করেছে। গরীবের দোরে শ্রীঈশা। গরীবের দোরে শ্রীচৈতন্য—গরীবের দোরে শ্রীরামকৃষ্ণ। টাকা আপনি এসে, এঁদের সবাইয়ের পায়ে লুটোপুটি খেয়েছে। এঁরা কিন্তু, টাকার গোলাম হন্‌নি কেউই।

*　　　*　　　*

ভবিষ্যৎ খতিয়ে দেখি না। দেখ্‌বার জন্যে আগ্রহও করি না। I do not see into the Future nor do I care to see. সেই চলাপথের পায়ে ধূলাওয়ালা, সংসারের পোড়-খেকো, ঠেকে শেখা, পরমাভিজ্ঞ আচার্যকে; কে যেন কেন ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। তিনি ভুগেছিলেন,—বড্ডই ভুগেছিলেন। প্রতারণা, শঠতাময় সংসার দেখে নিয়ে, তারই উপর বীরের মেত সত্যের সিংহাসন পাতবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। পর্বতপ্রমাণ বাধার সমক্ষে, কর্সিকার পৃথিবীপ্রথিত বীরেন্দ্রসিংহের ন্যায়, তিনিও একদিন বলতে পেরেছিলেন,—'অসম্ভব' শব্দটা নিরেট বোকা লোকদেরই অভিধানে দেখতে পাওয়া যায়। শুধু মুখে বলা নয়, কাজের দ্বারা, আত্মোৎসর্গের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তিনি পৃথিবীর লোকদের একথা বলতে পেরেছিলেন। সেই জন্যেই, ন্যাপলিঁও

ক্ষণজন্মা। নরেন্দ্রও তাই। সেইজন্য তিনিও বড়। তিনি মহান্। তিনি আমাদের সাহস,—আমাদের আশা,—আমাদের আদর্শ।

ফলাফলের দিকে এ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে ইচ্ছা হয় না। "প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়।······মন্ত্রতন্ত্র······বুদ্ধির বিভ্রম,—প্রেম প্রেম—এই মাত্র ধন।" বড় মর্মস্পর্শী বাণী। তিনি ফরাসীর গৌরব ভিক্তর য়ুগো কথিত সেই শ্রেণীর অতিমানব, যারা শুধু কল্পনার অতি প্রাকৃত আলোকে পৃথ্বীর উপরে, দারিদ্র্যের অভাবের নির্মম স্পর্শের উপরে; ঘুরে বেড়ান না। "Got the roadside dust on their feet"—তাঁর পাদপদ্মে পথের ধুলো মাখা ছিলো। তাই বড় ভাল লাগে তাঁর কথা, bread, bread!—ভাতরুটি ডালভাত। যে ভগবান্ দু' মুঠো খেতে দিতে পারেন না ইহালোকে, তাঁকে মানি না। তাঁকে অবিশ্বাস করি। কালীর পাদপদ্মে সদা সমাহিত পরমহংস কেউ সাধু হ'তে এলে বলতেন, "কি গো, তোদের ঘরে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা আছে ত?" এর চেয়ে Practical অভিজ্ঞ কাকে বলবো?

তবু, বীরত্ব কি অস্বাভাবিক রকমের। অসম সাহস। আদর্শ-প্রীতি প্রচুর। যেটাকে ভাল বলে বুঝেছি, সকল ঝড় ঝাপটা মরণ পণ করে, শত বাধা-বিপত্তির ভেতর সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবার ক্ষমতাই ছিল দুর্লভ বিবেকানন্দ চরিত্রের একটি প্রধান দিক। বাংলার তরুণশক্তি, ইহাই শ্রীবিবেকানন্দের জীবন-সম্পদ। ইহাই তোমার আমার পিতৃধন। পথের পাথেয়।

আমরা ভয়ে ভীত, সত্য। সবাই নহি। অন্ততঃ কেহ কেহ। কিন্তু, ভীতদের ভবিষ্যতের আশার কথা আছে। গান্ধী মহারাজ লিখেছেন, প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত ভয়-তরাসে ছিলেন। অন্ধকারে ঘাবড়ে যেতেন। ভূতের ভয় পেতেন। সাধকাবস্থার এই সব দুর্বলতা, বিষ্ণুভক্ত তিনি,—নারায়ণের কৃপায় একদিন তাঁহা হইতে দূরে পালাইয়া গেল। সমগ্র ভারতে তিনি "অভীর" একটি চমৎকার নিদর্শন। শিবস্থানে জীবনের আশঙ্কার আবহাওয়ায় পড়লেন। হাওয়া গাড়ী ছেড়ে পায়ে হাঁটা সুরু করলেন। যিনি বা যাঁরা আঘাত করিতে বা প্রাণ লইতে চান, বীরের মত তাঁদের সুবিধা দিলেন। বাধার সামনে সরু বুক দরাজ করে ধরলেন। একটি বড় আদর্শধারায় আমাদের এই ছোট জীবনের স্রোতটিকে মিলাইয়া ভাসাইয়া দিলে, অলক্ষিতে অতর্কিতে শক্তি আসিয়া জুটে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এমনি একটি যুগভাবধারা বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এই এখনকার অতি হীন মানুষকেই কালক্রমে একদিন মহতো

মহীয়ান্ করিয়া দেয়। ভাঙা নৌকাটি সেরে নিয়ে, তাঁরাই তাঁদের ভরা বা বোঝা চাপিয়ে দেন। তৈরী-জিনিষ সব সময়ে কি পাওয়া যায়? ঐরূপ আশা করা অনভিজ্ঞের লক্ষণ। (কোন একটি মঠের মহান্ত, একদিন শরৎ মহারাজের সামনে খালি বলতে শুরু করলেন,—"আপনি যে ছেলেটিকে দিয়েছেন, বড় একগুঁয়ে। কথা শোনে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি সব শুনে বললেন, "ত্থাখো, সবাই কি একেবারে তৈরী হয়ে, নির্দোষ হয়ে, তোমাদের কাছে আসবে? তোয়ের ক'রে নিতে হবে। আমি কি Perfect সর্বাঙ্গসুন্দর কর্মী তোমার জন্য গড়বো?" আমরা বলি, সব অসম্পূর্ণতা লয়েই দ্বারে এসেছি। তোয়ের আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দই করিয়া লইবেন। নিঃসন্দেহ।)

বিবেকানন্দ নিজে মোটেই ভয় করতেন না। যেখানে দাঁড়াতেন সেখানকার আশে পাশে ফুলের সুগন্ধী সুবাসের মত অভীঃ-ভাব ছড়িয়ে পড়তো। লিখছেন —"নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ॥ Avalanche (বরফের চাঁইএর) মত দুনিয়ার উপর পড়্। দুনিয়া ফেটে যাক্ চড়্‌চড়্ করে। হর হর—মহাদেও। উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং।" নিজ পত্রের এই জোরালো উপদেশ বর্ণে বর্ণে জীবনে পরখ করে, চোখে আঙুল ফুটিয়ে, তার যাথার্থ্য দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। "মহা হুঙ্কারের সহিত কার্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? ডর? কার ডর? কাদের ডর?" গুণগ্রাহী মার্কিনেরা তাঁর নামের আগে একটি এই ভাবসূচক বিশেষণ যোজিত করেছিলেন। "Cyclonic Svami"—ঝঞ্ঝাবাত্যার বীর-মূর্তি স্বামী।

স্বদেশপ্রেমের একটি গানে সুন্দর আছে—"জুজুর ভয় কি আর আছে?" —তা বাস্তবিক, এই তেজী, সুপিতার সুপুত্রের, এই ডানপিটে ছেলের ধাতে, ভয় নামক বস্তুটি একদম ছিল না।

তাল ঠুকে, বুক ফুলিয়ে, বীরের মত এসেছিলেন। বীরের মত চলে গেছেন। বিশ্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-মহাযজ্ঞে নরেন্দ্রই দিগ্বিজয়ী যজ্ঞবাজী। (ফরাসী মনীষী সুন্দর উপমা দিয়েছেন—এই জোয়ান বীর, গ্রীক বীর হারকিউলিসের মত, দুনিয়া শুদ্ধ চষে এসে, পথক্লান্ত শরীরটি, বেলুড়ে গঙ্গাতীরে, চিতার আগুনে সমর্পণ করবার জন্য, উতলা হয়ে ছুটতে ছুটতে জীবনের পরম ব্রত শেষ করে, ফিরলেন।) কি চমৎকার চিত্র! ফরাসীবীর ন্যাপোলিঁও বলতেন, "আমি একটা উল্কা। আকাশে হাউইয়ের মত কে যেন আমাকে ছেড়ে দিয়েছে—

পৃথিবীকে চমক্ লাগাবার জন্ম।" বিবেকানন্দও ঐরূপই বলতে পারতেন। একদিন বলেছিলেন,—"আর একটা বিবেকানন্দ না হ'লে, এ বিবেকানন্দের সবটা বুঝতে পারবে না।"

একবার বলেছিলেন, "তোদের মত ভুগে ভুগে, কি ঢিমে তেতালায় মরব ? যখন কাজ শেষ হবে, ঝাঁ করে চলে যাবো।" তাঁর অনুপম অনিন্দ্যসুন্দর সুকণ্ঠ ছিল। স্পষ্ট বলতেন,—যে আসরে তানপুরো ধরবো, সে আসর জ্বলে যাবে। আর কাউকে পাত্তা পেতে হবে না। বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন,—"আমি কি শুধু বাক্যির ঝুড়ি বলে যাই ? যারা শোনে, তাদের ভিতর শক্তি দিয়ে দি। তাদের মনকে অনেক উঁচু প্লেনে (ভূমিতে) তুলে নিয়ে যাই।" (পাকা অধ্যাত্ম খেলুড়ের মত)—৯ই জুলাই ১৮৯৭ সালের পত্রে লেখা দেখছি—"অন্ততঃ ভারতের লোকের কল্যাণের জন্ম এমন একটি যন্ত্র বসিয়ে গেলাম, কোন শক্তি যাকে হটাতে পারবে না। —আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাবো। জোর তিন চারি বৎসর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমি বুঝতে পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে।" পাশ্চাত্য থেকে ১৮৯৫ সালে বসন্ত ঋতুতে একটি কবিতায় লিখছেন,—আজিকে এ খেলা হোল গো সাঙ্গ। খোল গো, খোল গো, জননী আমার, খোল গো দুয়ার। ··· সংসারের বাসনার স্রোতে রেখো না গো মোরে আর। দয়াময়ী মা আমার ! এ বড় বিষম বন্ধন, কর মা, কর মা মোচন। ক্রীড়ারে করেছ তুমি পীড়ার পরম ভূমি। খেলিতে পারি না আর, কঠিন খেলা মায়ার (ইংরেজী হইতে ভাব অবলম্বনে)।

হে বঙ্গের কল্যাণ তপস্বী !। তোমার ঐ নরেন্দ্র-তনুর উপর যথেষ্ট পরিশ্রম মা করাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু তুমি শুনিতে পাইবে কি না জানি না, তবু তোমাকে বলি, তুমি ত ঘুমাইতে পারিবে না। আমরা যে নিদ্রিত। আগে আমরা জাগি। তারপর হে অশরীরী আচার্য্য, তোমার পালা পড়িবে। তুমিও ভলান্‌টিয়ার (স্বেচ্ছাসেবক)। আমরাও তাই। একই খেলার খেলুড়ে। বাংলার তরুণ, বাংলার অরুণ আলোয় আলোকিত বালকবৃন্দ, তাহাদের কোমল নরম হাত তোমার—শ্রীমুখমণ্ডলে বুলাইতে বুলাইতে সযতনে সোহাগে হৃষ্টচিত্তে "ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসীর" গান আধ আধ স্বরে গাহিতে গাহিতে—তোমাকে ঘুম পাড়াইবে ! সখা, সবুর কর এখন। আমাদের ঘুম ও জাগরণ যে পরস্পর পালা করিয়া করিতে হইবে। এরূপ অলিখিত চুক্তিতে যে তুমি আমাদের নিকট বাঁধা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পথের বাধা—অজ্ঞান ও মায়া—আপদ ও বিপদ

বলা বাহুল্য, সংসারে থাকিয়াও আদর্শের জন্য লড়া যায়—আন্তরিকতার সহিত আত্ম-উপলব্ধির চেষ্টা করা যায়। একটি যুবক, যুবা বয়সেই বিবাহিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভজিত। গীতা পাঠ করিত। শ্মশানে চুল্লীর উপর চড়িবার দিন ঘনায়মান—তাঁর অতিবৃদ্ধ পিতা।—যাঁর ভুরুতে পর্যন্ত পাক ধরিয়াছিল। তিনি তীব্র তিরস্কার ও শ্লেষের সহিত, উপযুক্ত পুত্রকে বল্লেন একদিন, ছাপোষা বাঙালীর ছেলে। এত সকাল সকাল মন্ত্র নেওয়া কি বাবা? আর এখন থেকে গীতা কিরে? সেই চিতায় শুতে যাবার আগে—গীতা।—গুরু, গঙ্গা, গীতা, নারায়ণ,—তখন। যখন মর মর হবি। এখন জ্যান্তে—সংসার সেবা কর্। কাঞ্চন সেবা কর্। তবে ত হবে। সব দিক বজায় থাকবে। যুবক অবসর সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করিতেন। বাবা বল্‌তেন—জিওমেট্রি গ্যালো। অ্যালজেবরা গ্যালো—রামকেষ্ট পড়ে কি চতুর্ভুর্জ—কি ধিনিকেষ্ট, হবে বাবা? দৈত্যকুলে আত্মসাধনরত দুর্লভ শিশুর উপর বাধার পাষাণ প্রাচীর পড়িল যে দিন,—প্রহ্লাদ চরিত্রের মাধুর্য, বীর্য ফুটিয়া উঠিল সেইদিন। বালক দমিল না। সে জানিত যৌবনেও মরণ আসে। দিনের পর দিন, সে—পরম-অহিতৈষী পিতার বারণ সত্ত্বেও, প্রাণের রামকৃষ্ণকে ভজিতে ছাড়িল না। সত্যস্বরূপ রামপূজায় গর্ভধারিণীর বাধা অমান্য করেন ভরত।

আমাদেরও তদ্রূপ, যে যেখানে আছি দমে গেলে চল্‌বে না। কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। চলতিকথায় বলে, কেষ্ট পেতে গেলে কষ্ট গোড়ায় পাওয়া চাই। যুগকবির চমৎকার বাণী—"আপনজনে ছাড়বে তোরে, তা বোলে ভাবনা করা চল্‌বে না।·········যদি কেউ না ধরে আলো রে, ও তুই আপন বক্ষপাঁজর জ্বেলে পথ চল রে।" অধ্যাত্ম ধর্মসাধনের পথ চিরকালই কঠিন। সব জ্ঞানীতেই এই কথা বল্‌ছেন। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে ······যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।—ক্লেশো অধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং।" হাজার হাজার মানুষের ভেতর দুএকটা সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। আবার চেষ্টারত যারা তাদের ভেতরও দুএকটা কচিৎ আমার তত্ত্ব জানতে পারে।···যারা অব্যক্ত নিগুর্ণব্রহ্মে মনোযোগ দিয়েছেন, তাঁদের ক্লেশ

আরও অধিক।—শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের ইহাই এ সম্বন্ধে বচন। বাংলার বৈরাগী-সাধক প্রাণের একতারা বাজাইয়া ঘরে ঘরে এই গাথাই, ভাষায় গাহিয়া বেড়ান—"অহর্নিশি দুর্গানামে ভাসি, দুখরাশি তবু গেলো না।"

রসুলউল্লা শ্রীমহম্মদকে অসংহত আরববাসীদিগের ভিতর, নিজসাধনময় একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করিয়া, সংহতিশক্তি ও সঙ্ঘ নিয়ামকতা অনায়ন করিতে হইয়াছিল—দুর্জয় বাধার সমক্ষে বীরের ন্যায় রণরত হইয়া। আর ব্যক্তিগত জীবনোপলব্ধির জন্য বহিরান্তর দ্বন্দ্ব ত হাতের পাঁচ-রূপে ছিলই।

ভগবান ঈশাও প্রিয়তম শিষ্যদের সহিত শেষ নৈশ ভোজের পর, আপনার অপঘাত মৃত্যুর করাল ছায়া বেশ অনুভব করেছিলেন পূর্ব হইতে। খ্যাঁটির চরম হয়েও দুঃখের চরম তাঁকে নিতে হয়েছিল! সনাতন বিধিনিষেধ-মাত্র সম্বল ইহুদি সম্প্রদায় শ্রীঈশার অত্যদ্ভুত অধ্যাত্ম প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া প্রচার করেন—ও লোকটার ভেতর শয়তানের ভর—ও পাগল, ওর কথা শুনো না—He hath a Devil and is mad. শ্রেয়পথে বহু বিঘ্ন। শ্রীকৃষ্ণের স্থূল শরীরটা অপঘাত মৃত্যু কবলিত। আর ছয় মাস অন্নত্যাগ করিয়া গলায় ক্যানসার রোগগ্রস্ত শ্রীরামকৃষ্ণের তনুত্যাগ যেন নব-ঈশার জীবহিতরূপ ক্রুশের উপর আত্মবলি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সব প্রথম জনমদুখিনী সীতাদেবীর দর্শন হয়েছিল। তাই বুঝি জীবনটা দুঃখে দুঃখেই গেল। বুদ্ধ শঙ্কর, বিবেকানন্দ—কারুরই দুঃখের হিস্তে কম্‌তি হয় নাই। সকলেরই দুঃখ হয়েছিল 'মাথার ভূষণ'—জমাট-দুঃখ দৈন্য জ্বালা সবাইকে সইতে হবে—যারা তাঁকে—মরিয়ম-প্রাণ ঈশাকে—সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে ভালবাসবেন।—একথা স্পষ্টাক্ষরে বিদায় বেলায় স্থূল জীবনের গোধূলি লগ্নে বেদনার সহিত, কিন্তু মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ না রেখেই তিনি বলছেন—নিজ জীবনের দুঃখান্ত নাটকের বিয়োগান্ত যবনিকাপতনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তিনি অধ্যাত্মরস-পিপাসু নিখিলকেই বলিয়া গেলেন—In the world, ye shall have tribulation. But be of *good cheer*. দুঃখ পাবে—বিপদ পাবে—কিন্তু বৎসগণ—আনন্দ করো। মনের স্ফূর্তিতে থাকো।

আরও বলেছিলেন, পাখীর নীড় আছে, শিয়ালের গর্ত আছে, ঈশ্বরের সন্তানের মাথা গুঁজে থাক্‌বার জায়গা নেই! মায়ার ইহাই প্রহেলিকা। মহাত্মা তুলসীদাসও দুঃখে বলেছিলেন,—সতীকো ধোতি ন মিলে। কস্‌বিন্ পিহিনে খাসা।" গোরস গলি গলি ফিরি করিয়া 'বিকিকিনি' করিতে হয়। কিন্তু, মদিরা 'বৈঠ্‌' বিকায়! শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রাণ নরেন্দ্রের চরম কথা—যারা ধর্ম করুতে

আসে, তাদের ভেতর শতকরা আশিজন ভ্রষ্ট হয়ে যায়। পনেরো জন ক্ষেপে যায়। আর বাকী পাঁচজন ঠিক্ ঠিক্ পথে পৌঁছোয়।

অন্য রাজ্যেও যাঁরা কাজের প্রতি ভালবাসা মমতার দরুন আপনাদের সব সমর্পণ করেন, অনেক সময় তাঁদেরও অন্তহীন শারীরিক কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়। কবি মিলটন শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যিনি ইউরোপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস-চর্চা, অনুসন্ধান, গবেষণা শিখাইয়াছিলেন—সেই বিদ্যার সাগর র‍্যাঙ্কি সাহেবের কথা ধরুন। পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্য-ইতিহাসে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি জাতিতে জার্মান। শেষ জীবনে তিনিও প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন হন। তিনি তিরাশি বৎসর বয়সে 'বিশ্ব-ইতিহাস' লিখতে শুরু করিয়াছিলেন। সেই কাজ তখন আরম্ভ করিয়া,—সতেরো খণ্ড শেষ কর্‌লেন। আদিযুগ থেকে সুরু ক'রে মধ্যযুগ পর্যন্ত নেমে এলেন। আর পার্‌লেন না,—প্রকৃতির ডাকে কলম বন্ধ কর্‌তে হ'ল। তিনিই র‍্যাঙ্কি,—তিনিই আশ্চর্য লৌকিক বিদ্যা-অনুরাগী র‍্যাঙ্কি। একানব্বই বৎসর বাঁচলেন।

বিথোভেন, যিনি গানে নয়া যুগে জার্মানীকে জাগিয়েছিলেন, তিনি এই সাধনেই আপনার প্রাণমন নিঃশেষে সমর্পণ করেছিলেন।—তাকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ-শক্তিটাই হারিয়ে ফেলতে হয়েছিল! এমনও সব অবস্থা মানুষের হয়ে থাকে! হে সাহসী আত্মা! তোমার বিশ্রাম নেই।—Brave souls, no rest for thee.

আদর্শের জন্য ফ্রান্সের জীয়ান দ্য আর্ক, লাতিমার্, ক্র্যান্‌মার, ব্রুনো ইত্যাদিকে পুড়ে মর্‌তে হয়েছিল। জ্ঞানী গুরু সোক্রাটেস্‌কে বিষ পান কর্‌তে হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসের এই বৃদ্ধ গুরুজী অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে, ছেলেদের মত, যুবাজনোচিত মানসিক উৎসাহ নিয়ে বাজনা বাজানো শেখা সুরু করেছিলেন। গ্যালিলিও কারার যন্ত্রণা স'য়ে ছিলেন। এ দেশেও, কারাগার, লাঞ্ছনা, রণভূমি, সবই, রাজপুত মহারাষ্ট্র, শিখ-ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে লেখা আছে। কবিগুরু সুন্দর বলেছেন,—আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত দ্বন্দ্বময় উচ্চাবচ জীবনপথে নিরাশার নৈশমেঘ ঘেরিয়া আসিলে, সেই বাণী স্মরণে আন্‌তে হবে।

"ও তোর আশা লতা পড়্‌বে ছিঁড়ে,
হয়ত রে ফল ফল্‌বে না,
ও তুই বারে বারে জাল্‌বি বাতি
হয়ত বাতি জ্বলবে না।

তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে,
হয়ত' দুয়ার খুল্‌বে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।")

বিথোভেনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লোকে বলতে পারে, লোকটা এমন সুরবিদ্যা আলোচনা কল্লে গো, যে শেষে কানের মাথা একদম্ খেলে! আর শুন্‌তে হল না। একদম্ কালা বনে গ্যালো। কিন্তু হে অবুঝ হুজুগপ্রিয়! সুর সাধার চরম উদ্দেশ্য যে তখন সাধকের পূর্ণ হয়ে গেছে। সুর যেদিন বাহির হইতে গিয়া অন্তরের অন্তরে বাজিয়া উঠে, সেই ক্ষণ,—সেই মুহূর্ত, সেই দিনটাই তো জীবনের মাহেন্দ্র যোগ, পরম পুণ্যাহ্। গাইতে গাইতে যখন ভেতর ভরপুর হয়, তখন তম্বুরা হাত হতে খসে পড়ে। তম্বুরা ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেথায় বাজনা অনুক্ষণ বেজে উঠে। বাহিরের শব্দ তখন ভিতরের "অশব্দংকে" জানিয়ে দেয়। মুখে বলা যায় না। বোধে বোধ হয়। স্বামীজী যে দৃষ্টি নিয়ে ইংরেজী মূল জ্ঞানযোগে লিখে গেছেন—Every expression is a limitation মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে, আপেক্ষিক জগতের ছাঁচের ভিতর দিয়ে এলে—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "এঁটো হলে"—পূর্ণব্রহ্ম খাটো হতে বাধ্য। পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজ সেদিন বল্‌ছিলেন—পরিব্রাজক অবস্থায় পশ্চিমে এক জায়গায় সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণ কয়েকদিন ধরিয়া তিনি পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ হইয়া গেলে, কবিগুরুর শব্দঝঙ্কারে, গঙ্গাধর বাবার প্রাণের গোপন কোঠায় রক্ষিত ভাব-বীণার তন্ত্রীতে মৃদু মৃদু কম্পন সমুত্থিত করিয়া, সহসা কে যেন রণিয়া উঠিল। বাবা শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়া ধন্য হইলেন।

প্রাচ্যগৌরব রবীন্দ্রনাথ সুন্দর কহিয়াছেন—"আপদ আছে, জানি আঘাত আছে, তাই জেনে তো, বক্ষে পরাণ নাচে।" বিশ্বভারতী গঠন করিতে গিয়া, কবি-সার্বভৌম অনেক বাধার সহিত কোলাকুলি করিয়াছেন—সমক্ষে আসিয়াছেন। নব্য ভারতের সেই ইতিহাস হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে! ✓

নবম পরিচ্ছেদ

তরুণের প্রতি পরমাপ্রীতির আহ্বান-লিপি

শ্রীরামকৃষ্ণ ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মলগ্নে জন্মপরিগ্রহ করেন। চন্দ্রমৌলির ভালে ভারতের যুগযুগপ্রথিত শিল্পী-তক্ষণবিদ্‌গণ যে ভাবে চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় শশধরকে (চাঁদের উপমা চাঁদই) অঙ্কিত বা খোদিত করেন, তাহার সুস্নিগ্ধ বাস্তব রূপ, এই তিথিতে মৃদু মন্দ দখিণ হাওয়ার ভিতর, সন্ধ্যাবেলায় অচলের ভালে বসিয়া, বেশ অনুভব করিয়াছি। পূর্ণত্বের সবটাই রহিয়াছে—যেন উপরে একটা পাতলা পর্দামাত্র ঢাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের পূর্ণ প্রতীক। তিনি এবারে সাধারণ-চক্ষে জীবদ্দশায় পূর্ণ প্রকট নহেন—কিন্তু গোপন প্রচ্ছন্ন। বাহিরে সচরাচর বিশেষ কোন চাকচিক্য, চিহ্ন, লিঙ্গ, বেশভূষা নাই। যোগীন-মার মাতামহীকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি রাসমণির কালীবাড়ীর পরমহংস খুঁজছো?—কি জানি বাপু, কেউ বলে পরমহংস, কেউ বলে ছোটভট্‌চায্‌। ভাখো, জিজ্ঞাসা-পড়া করে লোক্‌কে,—এই খানেই কোথাও হবে।" অজ্ঞাতে শ্রীপরমহংস সাক্ষাৎকার করিয়া, কলিকাতা কুমারটুলি নিবাসিনী ঐ নারী সেদিন নৌকা করিয়া স্বীয় আলয়ে ফিরিয়া যান।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, বস্তুতঃ, একই ভাব-পয়স্বিনীর দুইটি ধারা মাত্র। বাংলার, ভারতের, তথা জগজনের অশেষ কল্যাণদায়িনী সঞ্জীবনীসুধা। আর মনে হয়, ঐ দ্বিতীয়া তিথির চাঁদের মতই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চন্দ্রমা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিবর্ধমানা বিকাশমানা,—এঁদের বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। আর হঠাৎ রাতারাতি না হয়ে, কালের সহায়ে অমোঘা শক্তিসঞ্চয়ে যাহা সংঘটিত হয়, তাহারই প্রতিষ্ঠা সুদূরপ্রসারী, এমন কি, কল্পান্তস্থায়ী হইতে বাধ্য। জগতের অধ্যাত্ম জীবনের গৌরবময় ইতিহাসে তাহাই নিখিল মানবমানবীর জীবনের কল্যাণ-বীজমন্ত্র। কুণ্ডলিনীশক্তি সর্পাকৃতি ধারণ করিয়া, শ্রীঈশা, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের তারকনামের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের ঘরে হাজির হয়,—শ্রীগুরু-প্রমুখাৎ। সাধিতে পারিলে, ইঁহাদের প্রত্যেকের দর্শন বার বার পাওয়া যায়। আবার, রামকৃষ্ণ-তনু ধারণ করিয়া ভক্তের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ সমুপস্থিত হন। অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া, সন্ততিদের জ্ঞানভক্তির মহাসমুদ্রে হাত ধরিয়া লইয়া যান। ইহা গঞ্জিকাসেবীর অলীক

কল্পনা নহে। দুষ্টে ইহা লইয়া কিছু দিন বুজরুকী চালাইতে পারে, বহুদিন নয়।

ক্রমশঃ ক্রমশঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিগ্ দিগন্তে জয়জয়কার উঠিতেছে। Blessed are they that have *not seen but belicved,* প্রথম না দেখে, নাম শুনে কানে যাঁরা আজ ভারতের গ্রাম হতে, নগর হতে ছুটে আস্ছেন, তাঁরা কি সকলেই ঐশ্বর্য-প্রলুব্ধ অথবা সত্যসংযমের জীবনকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়া, এমন এক অভেদ্য দুর্গে—এসেছেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা জীবনের দ্বন্দ্ব সুরু করবেন? (অলঙ্কারের ভাষায় ঠাকুর তাঁর লীলাস্থল দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীকে—মা কালীর কেল্লা বলিতেন)—কই তাঁরাই বা কেন এসেছেন, অপরে নয়? এ প্রশ্নের জবাব বাইরে থেকে দেবার নয়। যাঁরা হিংসা করছেন, তাঁদেরও ত পথ খোলা রয়েছে। যদি এটা এতই আরামের, মজার, তবে এসে যোগ দেবার স্বাধীনতা ত সকলেরই আছে। মিছামিছি বাহিরে পড়িয়া দুঃখ ভোগ ভাল নয়। উদ্বোধনে মার আমলে মার ভাইঝি জামাইয়ের এক হতভাগ্য বন্ধু, ভালমন্দ খাইয়া, যাবার সময় সারদানন্দ মহারাজকে শ্লেষচ্ছলে বলিলেন,—"আপনারা বেশ সুখে আছেন—এত ভাল খাবার-দাবার!" স্বামী বলিলেন—"বেশত তুমি বিবাহিত, বাড়ী ছেড়ে পনেরো দিন থাক না, তুমিও খাবে।" ইহা ত কাহারো পৈতৃকসম্পত্তি নহে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আহ্বান বাণী, তাঁহাদের দেবদূত ত আজ দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে বলছেন,—অতীব বিনয়ের সহিত বলছেন,—

"থেকনা, থেকনা ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে।
জননীর দ্বারে আজি ওই,
শুনগো শঙ্খ বাজে।"

প্রাণহীন, উচ্চআশাহীন, নূতনত্বহীন, গতানুগতিকত্বের স্রোতে গা ভাসান না দিয়ে, গড্ডলিকা-প্রবাহ পরিত্যাগ করিবার ডাকে কে সাড়া দিবে? প্রেমিকের বচনে বলে,—প্রেম ক'রে বিড়ম্বনায় পড়া ভালো। প্রেমই করলে না, ত ভুগবে কোথা হ'তে? পথেই পা দিলে না, ঝড়-ঝাপ্টা সইবে কোথা থেকে? এই মর্মে ইংরেজী বুলিও আছে—It is better to have loved and lost than never to have loved at all.

একজন বলছেন—কিছুকাল পরে সকলেরই স্বরূপ ধরা পড়বে। ভয় ভাবনা

নাই। মতলববাজী চালাকীর রাজত্ব বেশী দিন নয়। লুকুনো থাকবে না। দীর্ঘকাল লুকাইয়া রাখা, লুকাইয়া থাকা অসম্ভব। ইহা সুনিশ্চিত। গোপালভাঁড়ের আজগুবী গল্পে আছে—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাটীতে সুচতুর একব্যক্তি দীর্ঘকাল, খুব কায়দার উপরে তাহার নিজের জাতিজন্ম লুকাইয়া রাখিয়াছিল। লোকটি হুরবোলা ছিল।—বহু ভাষাভাষী। কিন্তু পরমচতুর শ্রীমান গোপালের ক্ষমতার কাছে পরিশেষে তাহাকে হার মনিতে হইল। তাকে সম্পূর্ণ আচম্‌কা একদিন উস্কে রাগিয়ে দিতেই তাহার স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনব্রহ্মচর্যের এমনি জোর যে, আজ যে কেহই তাঁহাদের নামে কাজে নামছেন তাঁরই অবস্থা—ধূলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হচ্ছে। এটা অস্বীকার করবার উপায় নাই। তবে তাঁদের নামে, আত্মহিতের জন্য একটা সদনুষ্ঠান নিয়ে কিছুকাল লেগে পড়ে থেকে, একটা গড়ে তোলাতে কর্মীরও কৃতিত্ব আছে, নিঃসন্দেহ। এখন এই সুবিধাটিকে আমাদের ব্যক্তিগত জাতিগত কল্যাণের পথে, অধ্যাত্ম আত্মদর্শনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত করিতে পারিলেই সবদিক দিয়া সমূহ শুভ হইবে। সামান্য লোক—এই নামে জড়িত না হলে কিছুই করতে পারতো না। কিন্তু এঁদের আশীর্বাদে বড় বড় ব্যাপারের স্রষ্টা হচ্ছে। কনৌজ অঞ্চলে গ্রামবাসীদের একটা প্রবাদের কথা মনে পড়ে। এক গ্রামে একটা মস্ত বড় —উঁচু ঢিপি বা ডুংরী আছে। লোকের বিশ্বাস, ঐ উঁচু জায়গাটায় রাজা বিক্রমাদিত্য ব'সে রাজ্যবিচার চালাতেন। গ্রামের ছেলেরা খেলাধূলা করতে করতে,—যেই তাদের ভেতর একজন সেই ঢিপিটার উপরে বসলো—সকলে অমনি সেই মুহূর্ত থেকে তাকে অন্য চোখে দেখতে আরম্ভ করলে। বললে, আরে ভাই, সাবধান, এখন আর ওর সঙ্গে চালাকি চলবে না,—ও স্বয়ং বিক্রমাদিত্য বনেছে। ওর মগজে সেই পরম-বুদ্ধিমান্ রাজার ভর হয়েছে। যে সিদ্ধান্তই দিক্‌না, বা যাই আমাদের বলুক্ না, সবাইকে মাথা পেতে তাই মেনে নিতে হবে। অমান্য করলে চলবে না। ইহুদিদিগের ভিতরও এই প্রকার Mose's seat মুশার বিচারাসনের উপর বিশ্বাস লোক-প্রসিদ্ধি আছে।

ঠিক্ এমনি ধারাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বহুবিক্রমাদিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। দুর্লভ চরিত্রের অমূল্য যাদু নামে। অশরীরী জীবনের অমোঘ তপঃশক্তির প্রভাবে অঘটন ঘটছে। তাঁদের ভাব এখনো ভারতের হিতের জন্য সর্বত্র ঘোরা-

ফেরা করিতেছে। অধ্যাত্ম আদর্শ-বিশেষে দেশকে জাগাবার জন্য তাঁদের আগমন, ইহাই আমাদের ধারণা। সাধারণের পক্ষে কর্ম-মার্গই উপযুক্ত মার্গ। সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে দেশের কাজও ইহার ফলে হইতে বাধ্য। মুখ্য কিন্তু,—আত্মউপলব্ধি। দেশের কাজ লেজুড়রূপে আসিবেই। সংঘ-নায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ যেমন বলিতেন, বারো আনা মন তাঁতে রেখে, কাজ করা।

অতি সুমধুর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার "শ্বশুর ঘর"। দুই জনে আজ বহুরূপী হইয়াছেন। যাহার ভিতর যতটুকু ধারণা কর্‌বার, প্রকাশ কর্‌বার সামর্থ্য আছে, সে সেই দিক দিয়েই, তাঁদের ধরবার, বোঝবার ও প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। তাঁদের ব্যক্তিত্বের সবটা যে কি, সে পূর্ণাঙ্গ চিত্র ভিতরে আনাও অতি বিরল ভাগ্যে ঘটে। তবে, আবার বলি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন, আত্ম-উপলব্ধি অন্তে—জগৎকে আত্ম-উপলব্ধির পথেরই সন্ধান দিবার জন্য।

* * *

শ্রীগুরুর অন্তর্ধানের পর, নেতা নরেন্দ্রনাথের তপঃমূর্তি কল্পনায় ভাসিয়া উঠিতেছে। নরেন্দ্র জ্ঞানের অধিকারী,—নরেন্দ্রের ঠাকুর বলিয়াছেন। তত্ত্বের দিক দিয়া, সন্ন্যাসীর শরীর এক হিসাবে প্রেত শরীর—dead to the world, পরমহংস মশায়ের ভাষায়, "মানুষ যারা—জ্যান্তে মরা।" যে সব জিনিষের—'বিষয়ের' মনবিভ্রান্তকারী নেশায়, সংসারের মানুষ চঞ্চল হয়, সন্ন্যাসীর পক্ষে সে গুলি অনাত্ম বস্তু। অনাত্ম বস্তুর শ্রী, সৌন্দর্য, কমনীয়তা, বিনাইয়া বিনাইয়া বাড়াইয়া, চোখের সাম্‌নে ধরা, মানুষকে ঐ সকলে প্রলুব্ধ করা—সন্ন্যাসীর আশ্রমবিরুদ্ধ ধর্ম। আত্মকামীর কাছে তাই, অনাত্মার শ্রী বিগর্হিত—একান্ত বিগীত, দারুণ দুষ্য, নিতান্ত নিন্দনীয়, আর সর্বতোপায়ে পরিত্যজ্য। "অনাত্ম-শ্রীবিগর্হণম্"-এর কথা তাই জ্ঞানী গুরু আচার্য শ্রীশঙ্কর কহিয়াছেন।

মনে পড়ে, বরাহনগরের সেই প্রেত-অধ্যুষিত পরিত্যক্ত মুনসীদের "পোড়ো এঁদো ভূতের বাড়ী।" গল্পের নহে সত্যকার। তুরীয়ানন্দ স্বামীর মুখে শুনিয়াছি, তিনি এখানে ভূত দেখেওছিলেন। এইরূপ এক আলয়ের বাসিন্দা, সেই কয়েকটি 'দানা'—সংসারের রূপ-রসের দিক হইতে জীবন্মৃত। যদি ভাললাগে ত' যুবক-নায়ক নরেন্দ্রের চিত্র ধ্যান ধরিয়া দেখিতে চেষ্টা করো। সেই মুণ্ডিত মস্তক (বাব্‌রি চুল মার্কিনে তোলা বিবেকানন্দ-চিত্র নহে) কৌপীনবান্, সতেজ, সুন্দর, গৈরিকাভ, সুঠাম, নয়নাভিরাম তনু। পর পর

বিশেষণ বাছিয়া বাছিয়া লাগাইয়াও দেখিয়াছি, সেই বিশেষ্যকে ঠিক্ ঠিক্ বিশেষিত করা যায় না। বাগ্‌বাদিনীর বরপুত্র কালিদাসও বুঝি অপারগ হইবেন। যেন উৎকৃষ্ট শিল্পীর তুলিতে আঁকা সুচারু, অতীব মনোজ্ঞ ছবি। চিত্রার্পিত —যাহাকে বলে, ঠিক তাহাই। সেই পদ্মপলাশ আঁখি—"সরসিজ-নয়নং নমো পঙ্কজনয়নায়"। সে আঁখির তুলনা হয় না। স্বামী সারদানন্দ একদিন মুগ্ধ হয়ে এইমাত্র ব'লে, চুপ করেছিলেন।—"সে যে কি চোখ--কি আর বলবো?" আবার বলিতে ইচ্ছা হয়—"নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে।" একজন বলেন—"তিনি যখন বলরাম বাবুর হলঘরে ঘুমিয়ে থাকতেন, দেখেছি, তখনও চোখ সবটা বুজতো না। পাতায় পাতায় কখনও জোড়া লেগে, মুড়তো না। শিবনেত্র—সত্য সত্য।

—সেই শক্ত মাংসপেশী। সেই শতবাধা, দারিদ্র্য দুঃখ অনাহারে, দৃঢ় উপেক্ষা। সেই অতুল শ্রদ্ধা—আত্মবিশ্বাস। সেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, সদা আশান্বিত। সেই অদ্বৈত বেদান্তে পূর্ণ নিষ্ঠা। যাঁরা দ্বিধা করছিলেন, বাড়ী ফিরে গিছলেন, তাঁদের দোরে দোরে গিয়ে—ডেকে আনা—আশার বাণী শুনানো। আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়—সন্ন্যাস-জীবনে চিহ্নিতদের লওয়ানো। আদর্শে ও বিশ্বাসে হিমাচলের ন্যায় অটুট, অচল! বুকের শ্রদ্ধা দিয়ে বাহুকীর মতো তাঁর আজ্ঞা—গুরুর ভার, শিরে বহন। পুরাণ-প্রথিত গুরুভক্তি, গুরুবাক্যে বেদজ্ঞান—জীবনে নরেন্দ্র মূর্ত করলেন। ওয়া গুরুজীকী ফতে। গুরুর জয় হোক্। পরম সাহসী না হলে কেহ কখনও শ্রীভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। দুর্বলের কর্ম নয়।

ভক্ত বল্‌ছেন, হে ভারত-ভারতী, চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখ, তোমার নববেদ, নবস্মৃতি, নবপুরাণ যে সব আধার লইয়া রচিত হইবে, তাঁহাদের দেখ। যার চোখ আছে সে দেখুক্, কান আছে শুনুক্।—"He who hath eyes let him see, he who hath ears, let him hear." অবিশ্বাসী জনে যাহা বলে বলুক,—'সত্যমেব জয়তে।'—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জয় অমোঘ, যে হেতু তাহারা সত্যস্বরূপ, নিছক্ বাস্তব বৈজ্ঞানিক সত্য। চোখ বুজিয়া থাকিলে, পিছাইয়া পড়িবে। প্রভুর বিজয়কেতন উড্ডীয়মান। সমন্বয়-মহামৈত্রীর যুগচক্রবিশিষ্ট মহারথ বাংলায়, ভারতে,—দুনিয়ায় ঘুরিতেছে। "কে আছ চেতন? ঘুমাইও না আর।" এস, রথে স্থান সংগ্রহ করিয়া ধন্য হও। আর

ঘুরিতে ইচ্ছা হয়, ঘোরো। অবিশ্বাসের মহাকঠিন, বজ্রকঠিন, পাষাণ-প্রস্তর-খণ্ডে যুক্তিবুদ্ধির মগজ ঠুকিয়া ঠুকিয়া, চুরমার হউক তোমার সর্বস্ব। কাল অনন্ত, তুই একটা জীবন কিছুই নয়। বেঘোরে বিপথে যাওয়াও একদিক দিয়া দরকার। (সেই বিশেষ দিক হইতে স্বামীজী যেমন কবিতায় বলিয়াছেন Blessed Sin) মুখের কথায় জীবের মন বুঝে না। বাগ মানে না, সংযত হইতে চায় না। যে দিন ভিতর হইতে, বহু জীবনের সুকৃতির ফলে, "কে জানে কেমনে, অজানা কারণের টানে টানিলে আমারে" গোছের অবস্থা হইবে—সেই শুভ দিনের জন্য অপেক্ষা কর। তখনই সতের জন্য, সত্যের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, আত্মাকে জানিবার জন্য লাফ দিতে পারিবে। তার আগে নয়।

একটি ছোক্‌রা একদিন বরাহনগর মঠে বেড়াতে গেছে,—সেই অতীত যুগে। শ্রীশশী তাহাকে বলিতেছেন, "গ্যাখ, তাঁর শিষ্য-সন্তানরা কেহই ছোট নয়, খাটো নয়। কালে এঁদের মহিমা বুঝবে।" অবশ্য বলা বাহুল্য, সবার আধার সমান নহে, তাহা হইলে, পরমহংসদেব শ্রেণী-বিভাগ করিতেন না।

ধরে বেঁধে, মেজে ঘষে, দেবতা তৈয়ার করা যায় না। Sheer speculation—নিছক্ ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে, হুজুগে যে অবতার, মালসা ভোগ খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে, বুভুক্ষিত নরনারীর ভিতর আপনার মহিমা প্রচারে ব্যস্ত, তার কারচুপী ঝট্ ক'রে একদিন ধরা পড়ে।

ভক্ত বিভোর। ব'লে চলেছেন,—সেই বৈরাগ্যোদ্দীপ্ত বেপরোয়া নরেন্দ্রকে মনে পড়িতেছে। নরেন্দ্র আমার কল্পনার দূত। যেন স্বপ্নে দেখা দেবতা। সৌভাগ্য করি নাই যে তাঁর বাস্তব দর্শন পাব, তাঁকে বুঝতে পার্‌ব। তবে জোরের সহিত বলি,—Blessed Superstition—সাবাস আমার কু-সংস্কার। Business Boss—মালদার ধনী ব্যবসায়ীকে, অর্থ নৈতিক প্রচণ্ড অভাব,—'পেটের জ্বালা বড় জ্বালা'—সমস্যার যুগেও—অবতারের আসন দিতে মন কিছুতেই চায় না।

তখন নরেন্দ্রনাথ উদাসীন! কামারহাটী থেকে, দশ টাকা দিয়ে, যে সুন্দর ছোট তানপুরাটি ঠাকুর তাঁর গান কর্‌বার জন্য তৈয়ার করিয়ে দিয়েছিলেন, সেইটিতে সুর চড়িয়ে নিশিদিন মাতোয়ারা হয়ে গান গাচ্ছেন। আসরে সবার সাম্‌নে নয়,—নিভৃতে—নিরালায়। "কেয়া দিল্‌মান তামিল পেয়ারা আখের মাট্টিমে মিল যানা।" আখের মাট্টিমে মিল যানা,—কলির এই অংশটুকু বিশেষ জোরের সহিত, সকল প্রাণশক্তি নিবেশ ক'রে আপনার মনকে শোনাচ্ছেন।

গুরুভ্রাতা শ্রোতৃবৃন্দও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পাচ্ছেন। অবিরাম জ্ঞানগুরুর স্তোত্র আওড়াচ্ছেন,—

"অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাং।......ন বা বন্ধনং, নৈব মুক্তি র্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।..... ভিক্ষান্নমাত্রেণ সদা তুষ্টিমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"—"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং, নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।"—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব ভাবেন ভারত।"—"ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি।"—"ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং। শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ। ব্রহ্মগুরুং নমামি।"

"একবার ভুল হ'লে আর কি লবে না কোলে...আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন! ..শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে।"—(শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো, তিনি আমাদের পাতানো মা-বাপ ন'ন। তাঁর ওপর জোর করো।)

"তমসো মা জ্যোতির্গময়।"—"ন হোঁয়ে ময় আউধ দ্বারক...মেরা ভেট বিশ্বাস মো।" "জয় দেব, জয়মঙ্গলদাতা...জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে।" "নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সেভরম টুটে পশুকারে।" "ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো।"... .."ছাড় মোহ ছাড়রে কুমন্ত্রণা। জানো তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।"......"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধ নিরন্তকান্তরে। কলেবরে মূত্রপূরীষভাবিতে রমন্তে মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ"......"ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো! অনাশ্রয়-মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন, ত্রাহি মাং মধুসূদন।"

বল্‌ছেন,—ভুলিস্‌নি। তিনি আমাদের ভালবেসে বশীভূত করেছিলেন। বলেছিলেন, ওরে, তোর জন্যে যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে ক'র্‌তে পারি।...সেই রামরূপ একবার দেখলে, রম্ভা, তিলোত্তমা, এদের চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়।

ভক্ত বল্‌ছেন—হে হৃদয়-স্বামিন্, হে পতিতের নরেন্দ্রনাথ, হে দরদের বীরেশ্বর, হে দরিদ্রের নরেন্দ্র, হে পীড়িতের শুশ্রূষাকারী,—আবার বলো, পুনঃ পুনঃ বলো, অধঃপতিত ঈর্ষাক্রান্ত, ছটাকী অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট আমাদের বলো,—"তিনি (মানুষ রামকৃষ্ণ, মানুষকে) আমাদের ভালবেসে বশীভূত করেছিলেন।" নিঃস্বার্থ ভালবাসা। ভালবাসা (কারণ উহা চিরদিনই তাই) ভিন্ন মানুষকে, তার অন্তরকে, বশ করা যায় না। চাকরকে বেতন দিয়ে, হুজুর হুজুর বা সেলাম ছিনিয়ে নেওয়া যায় মাত্র। জীবনে এটা একটা বড় সত্য।

লাটু মহারাজ বলতেন,—ভালবাসতে তিনিই (গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ) জানতেন। তাঁকে পিতা ব'লে মানি। শ্রীশ্রীরাখাল বরাহনগর মঠে একজনকে বলিয়াছিলেন,—"গুরুমহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি, বাপ-মা ভালবাসে? আমরা তাঁর কি করেছি, যে এত ভালবাসা!... ..আমরা তাঁর কি করেছি?" নরেন্দ্র পত্রে—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই।

* * *

(বলরাম বসুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিময় পুণ্যবাটীতে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ চান্ করছিলেন। একটি রূপমুগ্ধ কলেজের যুবক খেল্‌তে খেল্‌তে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বলছেন,—মশায়, আপনার পায়ের muscle 'গুলি' গুলো ত বড় সুন্দর! তিনি অতি সহজভাবে জবাব দিচ্ছেন,—হ্যাঁ রে, তা হবে না? ঠাকুর যে আমাকে 'দেখতে' বড় ভালবাসতেন।—ঐ যুবকের এখন চুল পেকেছে। নাম কালোবাবু। তিনি বলছেন,—(ভাবটা তাঁর, ভাষাটা মাত্র আমাদের)— স্বামীজীর সবটাই সুন্দর। তাঁর ঠাট্টা সুন্দর। ছুটোছুটি মঠে—বাঁধানো প্রশস্ত চাতালে, বিস্তীর্ণ মাঠে। কুকুর, ভেড়া, হরিণ নিয়ে খেলা। গরুর গায়ে হাত বোলানো। এম্‌নি শুধু শুধু চারদিকে পায়চারি করে ঘুরে বেড়ানো। সবই সুন্দর!)

সুন্দর তোমারই নাম। দীনশরণ হে! তাঁর রূপ সুন্দর। গুণ সুন্দর। কথন সুন্দর। চলন সুন্দর। ধ্যান সুন্দর। কর্ম্মপ্রচেষ্টা সুন্দর। গান সুন্দর। বাজনা সুন্দর। হাসি সুন্দর। কান্না সুন্দর। দুস্থের প্রতি সমবেদনা সুন্দর। মুখমণ্ডলে জীবের প্রতি করুণার আভা অতীব মনোহর। কখন কখন বকুনি বড়ই "পিলে চমকানো"।—বিষম বিপদ! কিন্তু তারপর, কাছে ডেকে খাবার জিনিষ দেওয়া, ভালবাসার প্রকাশ সুমধুর। বেলুড়ে অধ্যাত্ম জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া, স্বয়ং স্বামীজী কিরূপ দেবভোগ্য অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃজনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ দিনে দিনে তিলে তিলে চক্ষের সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিতেন—তাহা পরবর্ত্তী যুগের আমরাও, স্বামী বিবেকানন্দের হাতে মানুষ করা স্বামী সারদানন্দকে দেখিয়া, কল্পনা-নয়নে অনুভব করিতে পারিতেছি। মঠের বৈঠকগৃহে যেন স্বামীজী তানপুরা হাতে, অপূর্ব দুর্লভ ঋষিকণ্ঠে, সুমধুর সুরলহরী সুরধুনীর বুকে ছড়াইয়া দিতেছেন—ওপারের অশরীরী কালীমন্দির নিবাসী শ্যামার, স্বাভাবিক সুকণ্ঠবিশিষ্ট অপূর্ব শিশুটি—নরেন্দ্রের গীত শুনিয়া মাতিয়া

উঠিতেছেন,—তাঁহার দেহ মধ্যস্থ কুণ্ডলিনী ঘন ঘন জাগরিতা হইতেছেন, আর আপনা সাম্‌লাইতে না পারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ—"আহা—আহা—কি মধুর।"—বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইতেছেন! কলিকাতা হইতে সঙ্গীতবিদ কোন সুকণ্ঠ গায়ক যেন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া—গঙ্গা বাহিয়া—বজ্‌রা হইতে মঠভূমিতে নামিলেন,—উদ্দেশ্য, সমঝ্‌দার স্বামীজী মহারাজকে গান শুনাইবেন। অমন গুণের ও গুণীর তারিফকারী মেলা দুর্ঘট।

যত কাল কাটিতেছে, পরমহংসদেবের প্রতি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম নিজের ফটো দেখিয়া, তাহার উপর ফুল ফেলিয়া বলেন, এর পর এই ছবি ঘরে ঘরে ঢুক্‌বে। ভক্ত এ কথা জানেন। একজন মুসাফির গুজরাতের গাঁয়ে গাঁয়ে, (তখন ঐ অঞ্চলে রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত কোন কিছু প্রতিষ্ঠান হয় নাই—) ঘুরিতে ঘুরিতে এক অতি 'অজ' জায়গায় একটি মুদির দোকানে দক্ষিণেশ্বরের ঈশ্বরের ছবি টাঙ্গানো দেখতে পেয়েছিলেন। আপনা হ'তেই তাঁরা সব ঠাকুরের উপদেশ কিছু কিছু মাতৃভাষায় তর্জমা করেছিলেন এবং কোন কোন জায়গায় শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণের জন্ম-জয়ন্তীয়াও অনুষ্ঠিত করেছিলেন।

পরমহংসদেবের একটি পরিহাসবাক্য আজ জলন্ত সত্যে দাঁড়াইয়াছে। সেটির উল্লেখ করিতে চাহি—ইংরেজী ১৮৮৩, ১৯শে আগস্ট তারিখ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া, নরেন্দ্র তাঁহার সেই সুরবন্দিত অনবদ্য কণ্ঠে গান শুরু করিলেন,—"সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে····· নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে······নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে, আপনারে ভুলে যাবো, তোমারে পাইয়ে!" গানটি গাহিয়া নরেন্দ্র ঘরের বাইরের বারান্দায় গেলেন। (নাট-মন্দিরের দিকে। সারদানন্দ স্বামীর মুখে শুনেছি, এই ধারে দরমা দিয়ে ঘেরা, ঠাকুরের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা, এক ফালি জায়গা তফাত করিয়া রাখা ছিল। সেটার নাম ছিল,—Green room, সেখানে তামাকুর পিপাসা পাইলে স্বামীজী আদি তামাকু সেবন করিতে যাইতেন)। একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন আলো কোথা? তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর—"আগুন জেলে গেছে। এখন থাক্‌লো, আর গেলো।" ঠাকুর তুমি অতি সত্য কহিয়াছ। তোমার নরেন্দ্র কোন্ এক পুণ্য অবসরে ব্রাহ্ম ক্ষণে বাংলার—তথা ভারতের বুকের উপর আগুন জ্বালিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সেই কল্যাণ-দাবানলের—স্ফুলিঙ্গ যাহার যাহার গায়ে মাথায় বুকে স্পর্শ করিতেছে, তাহাকেই হয় এক মুহূর্তে, নতুবা

ধীরে ধীরে, সংস্কারের খাদ গলাইয়া খাঁটি সোনায় পরিণত করিতেছে। রামকৃষ্ণ অবতারের লীলা প্রধানতঃ বাংলাকে লইয়াই। এখানে একটু প্রাদেশিক সুর গাহিব। স্বামীজীর ভিতর তিলমাত্র সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা ছিল না। তাঁর ধাতে, গঠনেই নয়। তিনি যে প্রদেশের যে দিকে মাহাত্ম্য দেখিতেন, তাহা সর্ব সমক্ষে বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পরমহংসদেবের ক্রুশবাহীদের ভিতর (সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী) বেশীর ভাগ বাঙালীই। অন্যান্য জাতি ও প্রদেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য, এই সঙ্ঘের দ্বার উন্মুক্ত আছে। স্বামীজী বলিয়াছেন,—I have travelled for the last ten years or so over the whole of India and my *conviction* is that from the *youths of Bengal* will come the *Power* that will raise India once more to her proper spiritual place.—প্রায় দশ বছর গোটা ভারত ঘুরলুম। আমার অন্তরের স্থির বিশ্বাস—বাংলার যৌবনশক্তি হইতেই সমগ্র ভারত তার নষ্ট অধ্যাত্ম-মহিমা আবার ফিরে পাবে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর নিকট আমাদের সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা অধিক পরিমাণে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদান করিয়া—এই উক্তিটিকে অপ্রমাণ করুন। সেটা শুভদিনই হইবে। নরেন্দ্রনাথের অভিপ্রেতই হইবে।

দেশে নরেন্দ্রভক্ত একশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। নিজেদের, আমাদের দেখিয়াই ইহা বুঝিতে পারিতেছি। কেউ একটা মতলব করে, প্ল্যান্ চালিয়ে—ফোড়ে ছেড়ে এটা ঘটায় নি। আপনাআপনি গুণমুগ্ধেরা সৃষ্ট হয়েছেন! এই জন্যই এটা একটা তারিফের বস্তু। চলিত ভাষায় লোকে বলে, ওরা সব "রাম—কৃশ্চান্।" বিবেকানন্দের চেলা।

"মাটির মানুষ" যাকে বলে, বর্ণে বর্ণে সেই তৃণাদপি সুনীচ পূর্ববঙ্গ-গৌরব দেওভোগের সাধু দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় একবার রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিলেন, একব্যক্তি তাঁহার সাধের নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অতি অকথ্য হীন কুৎসা শুরু করিয়াছেন। বেলেমাছের রক্ত, যিনি সহজে তাতিতেন না, সেই নাগ মহাশয়ের শীর্ণ জীর্ণ তনু ক্রোধে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি পায়ের চটিজুতা খুলিয়া, জোর কণ্ঠে বলিলেন,—"ত্যাখো, ফের যদি, মহাপুরুষ সম্বন্ধে এমন কথা কহিবে ত, তোমাকে জুতা পেটা করব।"

আরও একজন পরিচিত ব্যক্তিকে এমনি এক পাষণ্ড দমনের "বলং বলং বাহুবলং" argumentum ad cudjulum লাঠ্যৌষধি ধরে একটি বিরাশী

সিক্কার থাপ্পড়ে নরেন্দ্র-নিন্দকের গাল ফাটাইয়া রক্ত দর্শন করিতে বাধ্য হইতে হয়। ধর্মরাজ্যেও শরীরের বলের অভাবে লাঞ্ছিত হইতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দকে জীবনে বাধ্য হইয়া দুই একটি ঘটনায় শারীরিক বল প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

যাক্, আমরা যে প্রসঙ্গ পাড়িয়াছিলাম। সব সময়ে মহাজনের নিন্দা সামনে হইতে দিতে নাই। শরীরে সামর্থ্য যাহার নাই, সে অবশ্য নাচার! শুষ্ক, নীরস, "পণ্ডিত" অবশ্য, এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিবেকানন্দ ভক্ত আখ্যা না দিয়া, বিবেকানন্দ "ভাক্ত" বিশেষণে বিশেষিত করিয়া দোষ ধরিতে ছাড়িবেন না। শক্তিমানের পক্ষেই "উদাসীনবৎ" "জড়বৎ" অবস্থা অবশ্য উচ্চ—অত্যুচ্চ আদর্শ। তবে এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক কোন বাস্তব ব্যক্তিই নিছক যুক্তি-বিচারে চলিতে বড় একটা পারেন না। সাজিয়া গুজিয়া বাহিরে ফিটফাট হইয়া, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—কোন না কোন দিকে একটা ভিতরের সংস্কারমত্ততাই মানুষকে স্রোতের জলের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়। বিচারবুদ্ধিকে নিকৃষ্ট বলিতেছি না। অসৎ সংস্কারের প্রাবল্য ভিতরে হইলে, বিচারপূর্বক অভ্যাসযোগে সৎপথে চলিবার চেষ্টাতেই কল্যাণের বীজ নিহিত। তবে সতের ঢেউ ভিতর আসিলে সেটার চেয়ে সুখকর আর কিছু থাকিতে পারে না।

মানুষের সত্যকার গোপন জীবনে দেখা যায় যে, শুধু খড়িপাতা Calculation—স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিতে বেশ! কিন্তু ঘটনার ঘাতপ্রতি-ঘাতে উহা টিকে না। তাই সবাই আমরা ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাপূর্বক স্বামী সারদানন্দের সুন্দর ভাষায়—"Rough-riders to a wild horse"—ভবিতব্য বা নিয়তি যেন একটা পাগ্‌লা ঘোড়া। আর মানুষ জীবন পথে চলেছে, যেন এক একটা বেপরোয়া সওয়ার। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। কারো তোয়াক্কা নেই। তবে দুনিয়ায় কাপুরুষেরও অভাব নেই। সাহসিকতার অভাবও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে এরূপ ব্যক্তিও সব সময়ে কাপুরুষতাকে বুকে জড়াইয়া রাখিতে পারেন না। মনমুখ এক করে চললে, পিছনের অদৃশ্য শক্তি সব উল্‌টাইয়া দিয়া অকেজোকে কেজো, অকর্মণ্যকে কর্মণ্য করে তুলে।

বাংলার তরুণ শক্তির উপর আচার্য তাঁহার মহান্ আশাসৌধের গরুড়-স্তম্ভ নির্মাণ করিবার ভার নিশ্চিন্ত মনে দিয়া গিয়াছেন। আমাদের দ্বারা মহৎকাজ হইবে, তিনি বিশ্বাস করিতেন। আচার্য ব্রহ্মানন্দ বিশ্বাস করিতেন। স্বামী

তুরীয়ানন্দ—সারদানন্দ—প্রেমানন্দ—শিবানন্দ বিশ্বাস করিতেন, Youngme
of Bengal, to you I specially appeal.

ব'লে গেছেন,—আমিও তোদের মত কোল্‌কেতার পথের ছোঁড়া ছিলা
(বিশেষতঃ বাবার কাল হইলে)।—তোরাও আমার মত অনেক অসম্ভব সম্ভ
করতে পারবি।

ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছে। নিমন্ত্রণ লিপি দিকে দিকে, জনে জনে, দে
দেশে, জনপদে জনপদে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে দেবতা পাঠাইয়া দিয়াছেন
বুদ্ধিমান্ বুঝিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করুন! যুবশক্তিই তাঁর আশাস্থল—নিজে
বাণী—Not the old bruised and battered··· but the Earth
freshest, best, strong, young beautiful······purest flowers. কা
ঠোক্‌রানো—বুড়ো হাবড়ার কর্ম নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-তর্পণের জন্য বাংলার সুবিস্তৃ
বাগিচা হইতে বেদাগ ফুল বাছিয়া লইতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। সুন্দর
সংযত। বলবান্।

আবার বলছেন,—Like a rolling river free, be thou ever
······Go thou, the free from place to place, help the
out of darkeness, Maya's veil, without the fear of pain
search for pleasure. (মূল কথাগুলির আলাদা শক্তি)

কষ্টের ভয় পরিত্যাগ করে, আত্মসুখ অন্বেষণের আশা ছেড়ে দিয়ে দে
দেশে তুই যা, স্রোতস্বতী স্বচ্ছন্দগতি সরিতের মত, রে স্বতন্ত্র! আর লোক
মায়ার অবগুণ্ঠন থেকে, ঢাক্‌না থেকে, আঁধার থেকে মুক্ত হতে সাহায্য কর্।

পুনশ্চ—Bring light to the poor, and bring *more light to th
rich* for they require it more than the poor ; bring light t
the ignorant and bring *more light to the educated.*

গরীবের দুয়ারে আলো নিয়ে এসো। আরো আরো আরো আলো আ
ধনীর দোমহল্লা তেমহল্লা দৌলতখানায়। কারণ, গরীবের চেয়ে ধনীর এ
আলোর অভাব আরো বেশী। অজ্ঞকে আলোকিত কর। আরও আ
দেখাও, তথাকথিত শিক্ষিতদের। এ আলো অবশ্য—অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ভাস
দীপ্তি, তাহা বলাই বাহুল্য।

বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বৈদিক বিরজা সন্ন্যাসহোমের বিস্তৃত আয়োজ
করিয়া, তিনি মঠের ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যেদিন হাজার হাজা

মা-বাপ তাদের ছেলেদের জন্য এইখানে এসে মাথা খুঁড়ে রক্ত বার করবে, সেইদিনই ঠাকুরের আসা সফল হবে। তার আগে নয়।

তিনি দুই সহস্র চাহিয়াছিলেন। বাস্তবিক, বিবেকানন্দ একটি—জীবন্ত শক্তিকেন্দ্র Organism. আর তাঁর চরিত্রের অনেক দিক আছে যার, যতটুকুই ক্ষমতা বা ধারণাশক্তি—সে ততটুকুই ধরবে। কিন্তু, লক্ষ্য করতে হবে যে, সব শাখাপ্রশাখাময় প্রতিভার ভিতর, অধ্যাত্ম অনুভূতির বাণীই ওতপ্রোত-ভাবে, সূত্রে মণিগণা ইব, তাঁহার সব গুণগুলিকে হেমসূত্রে বাঁধিয়াছে। এটি না বুঝিতে পারিলে, বিবেকানন্দ-বোধ দুষ্কর হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

সেবাধর্মে "পাকাআমিত্ব"

স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের ভিতর ঠিক ঠিক নিরভিমানতা ছিল। নিরহঙ্কার মনে মনে। মুখে বেশ বলতেন, আমার ঘর। আমার মঠ। আমি বলছি। ইত্যাদি। অত যে কাজের উৎসাহ, আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সব ব্যাপারের ভিতর তাঁর অন্তরে, পূর্ণ জ্ঞানের প্রদীপ সর্বদা প্রজ্বলিত থাকতো। জানতেন, তিনি যন্ত্র। বিরাট শক্তির হাতের পুতুল। যোগবাশিষ্ঠের কথা তাঁর ভিতর অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাশিষ্ঠশাস্ত্রে বলে, সাধারণের মহাআড়ম্বরে কাজ শুরু করা, আর মহাপুরুষদের মহাডামাডোলে উহা আরম্ভ করার ভিতর, একটি নিগূঢ় তফাত রহিয়াছে। প্রথমতঃ মহাপুরুষ দৈব আজ্ঞা পান। আর, তাছাড়া, তাঁদের ভিতর আমি অকর্তা, এ বোধ পাকা থাকে। যদিও বাহিরের রীত অন্যরূপ বলিয়া—অনেক সময়ে মনে হয়। দু'চার দশ মিনিট মিশে, ভাসা ভাসা মিশে, মনে হয় এ লোকটার মহা তমঃ। ঐ সব বড় বড় কাজে তাঁদের জড়াতে পারে না। গীতাও (৪।২২) বলিয়াছেন, কর্ম ইঁহাদের বাঁধিতে পারে না,—"কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।" কারণ, কর্মবন্ধনের যে গোড়াকার কথা, সেই বাসনার বীজ—তাঁহাদের ভিতর একদম থাকে না। তাই অত কাজের ভিতরও তাঁদের মাথা চলকায় না। এ যে নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর কর্ম। শ্রীবশিষ্ঠের কৃপাসিক্ত, সমাহিত, সংসার-বাধিত রামের সংসার। জনকের সংসার।

শ্রীকৃষ্ণের। রামকৃষ্ণের ভাষায়—"অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে, তাঁকে জেনে সংসার।" লোক-সংগ্রহার্থম্। লোকহিতায়। অন্যায় প্রভুত্ব-বুদ্ধি অন্তর অধিকার করে না। মানুষের উপর অবৈধ অত্যাচার তাঁহারা করেন না। শঙ্করের ভাষায় মুণ্ডীন্দ্রত্ব—নেড়মাথাদের কর্তৃত্ব বা মঠাধীশত্ব বিবেকানন্দকে বাঁধিতে পারে নাই। যদিও কার্যতঃ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনিই শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন ছিলেন। বলেছেন—হে প্রভো—রামকৃষ্ণ! "দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে···সুশক্তিক নমি তব পায়।······আছো তুমি পিছে দাঁড়াইয়া——তব গতি নাহি জানি—মম গতি তাহাও না জানি!—তাঁর ইচ্ছায় লোকের অভাব হবে না।" জীবনের শেষটায়, শুনেছি, থালি বলতেন,—"মার ইচ্ছা।"

* * *

একদল বলছেন,—মনে পড়ে শ্রীপরমহংসের সেই উক্তি। আজ যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামে কাজে নেমেছেন, তাঁদেরও সেই সঙ্গে স্মরণ হয়। শম্ভু মল্লিককে তিনি বলেছিলেন,—"ভগবান (অবশ্য রূপবিশিষ্ট) যদি তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, শম্ভু, তুমি কিছু বর চাও। তা হলে, তুমি কি চাইবে?—কতকগুলো হাসপাতাল? ইস্কুল? ডাক্তারখানা? কতলোকের অভাব তাতে মেটাবে?"

কাজ খুব ভাল। নিরলস হওয়ার চেয়ে অধিকতর সুখকর অবস্থা আর নাই। অধঃপতিত তমঃগ্রস্ত বাংলার,—ভারতের হিতের জন্য কর্ম-প্রচেষ্ট কর্মপ্রবর্তনা নিতান্ত আবশ্যক। তবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত যাঁরা—যে সব কর্মীবৃন্দ—তাঁদের প্রসঙ্গ পাড়িয়া, মনের খাঁজে খাঁজে যে সব সন্দেহ থাকে, তাহা মিটাইয়া লইবার চেষ্টা দরকার। কারণ, এ আদর্শে ধোঁয়াটে কিছুই নাই। (রজোগুণ হচ্ছে, কাজলের ঘর। কালি, দাগ,—এ সব লাগবেই! সেইজন্যই পয়লা নম্বরের কর্মীকেও কাজ করিতে করিতে,—নাম, যশ, আত্মম্ভরিতা, "আমি না হলে—এ কাজ চলবে না"—"এ কাজের কর্তৃত্ব যদি আমার রোগ-জ্বালা বশতঃ ঘুচে যায় বা দোষবশতঃ সহকর্মীরা—ঘুচাইয়া দেন, তাহা হইলে, আমি বাঁচিব কেমন করিয়া"—ইত্যাদি চিন্তা আসিলে, মাঝে মাঝে কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া—শান্ত হইবার চেষ্টা করিতে হয়। যিনি অন্তরের বন্ধন, মমত্ববুদ্ধির বন্ধন ঘুচাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মত বা কতকটা অনুরূপ হইতে চান অন্ততঃ তাঁর পক্ষে। নতুবা, তাল সামলাইবার সম্ভাবনা মোটেই নাই।)

রজোগুণী ইউরোপের বিগত (১৯১৪—১৯১৮) মহাযুদ্ধে বিষ-উদ্গীরণ (মানসিক ও আক্ষরিক) কেমন দেখিলে? মানুষ খারাপ হলে, জানোয়ারেরও অধম হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে কি? বিবিধ পুষ্পসার প্রসাধন সামগ্রী আমরা মেখে থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফল্গুপ্রবাহের মত হিংসাপ্রবৃত্তি, গলিত দুর্গন্ধ শবসম, আমাদের সমস্ত মানব প্রকৃতিকে যে ছাইয়া ফেলে, তাহা ত আমরা দেখিলাম। আমাদের স্বরূপ,—পৃথিবীর তথাকথিত সভ্যদের অসভ্যতা প্রকট হইল। আমরা আমাদিগকে দেখিলাম। অবস্থাবিশেষে দাঁড়াইলে, আমরা যে কি না হইতে পারি, তাহারও কিছু কিছু চক্ষের সমক্ষে বুঝিলাম। লড়াই লড়বো না বলে, যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন, সেই সব শান্তিবাদীরা সংখ্যায় অল্প হলেও, সমগ্র ইউরোপের জাতীয় জীবনে তাঁহাদের সাধনোচিত স্থান যে কত উচ্চে, তাহা ভাবিলে চমকিত হইতে হয়। এখন সেই ঠেলার জন্যই, লীগ্ অফ নেশন্‌কে রাম নাম কপচাইতে—মৈত্রীভাবনার দিকে লক্ষ্য আনিতে হইতেছে। যীশুর জয় গাহিতে হইতেছে। বর্তমানে ইউনাইটেড নেশন্‌সকে।

রজোগুণে রাগী, হিংস্রক, লুব্ধ, অপবিত্র হইতে হইবেই। হর্ষশোকের বিপরীত স্রোত সমাকুলিত চিত্তঃ কাহারও ছাড় নাই। "রাগী কর্মফল-প্রেপ্সুঃ লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ। হর্ষশোকান্বিত……।" গীতা ১৮।২৭।

তবে, এও সত্য যে, কতকগুলি সদ্‌গুণ না থাকলে, কর্তা হওয়া যায় না। রামাশ্যামার কর্ম নয়। তমঃ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ, নিঃসন্দেহ। তবে, বাবারও বাবা থাকে। সেটা ভুলিলে চলিবে না। জীবন-জমি চষে যারা—আদর্শ ফসল কাটতে চায়, তাদের এটি জানা দরকার। "শিরায় শিরায় রজোগুণ"—স্বামীজী বলেছেন, অতি সত্য। তাহা কি কেবল লিডারি, সর্দারী, মতলববাজীতে পরিণত হবে? ঈশা-অবতারে রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"My house is the House of Prayer, but ye have made it a Devil's Den!" আমার অন্দরের, ঘরের ভাব হচ্ছে, প্রার্থনার ভাব। কিন্তু হে পথভ্রষ্ট ইব্রীয় সমাজ! বড়ই ক্ষোভের সঙ্গে তোমাদের আমি বলছি যে, তোমরা আমার এই সুন্দর অধ্যাত্ম-রাজ-অট্টালিকাকে শয়তানের বাসায়—আড্ডায় পরিণত করলে!"

কেউ স্বামীজীর পত্র থেকে উদ্ধার করে বলছেন—মুক্তি-ফুক্তি সব ফেলে দে। লোকের হিত কর্। তাঁর পর-সমাধির চাবি-কাটি পরমহংসদেব কেড়ে

রেখেছিলেন। তিনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। ধর্ম-টর্ম মানতেন না। ঐটেই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আবার কেহ তার উত্তরে বলছেন,—বড় ভাবনার কথা বটে। স্বামীজীর বাণীর মূলকথা কি স্বদেশসেবা, না স্বদেশসেবাদির ভিতর দিয়ে আত্মসাক্ষাৎকার? ব্রহ্মজ্ঞান? এইটি নির্ণয় করতে হলে, তাঁর সাত খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভিতর, অধ্যাত্মকথা কত বেশী আছে, মুখ্যরূপে আত্মজ্ঞানের কথা আছে কিনা, দেখিতে হইবে। আর, সঙ্গে সঙ্গে, যে সব মহান্ আত্মা স্বামীজীর হাতে গড়া ও স্বামীজীর বা পরমহংসদেবের শ্রেষ্ঠ ভাববাহী বলিয়া বঙ্গসমাজে বা বিশ্বসমাজে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের বাণী, কার্যকলাপও—ঐ সমস্যা সমাধানে আমাদিগকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিবে, নিঃসন্দেহ।

অধ্যাত্ম সাধন শেষ করে, (খালি নির্গুণে সদা সমাহিত হইয়া দেহাতীত হইতে বাকী ছিল,) "স্বামীজী মহারাজ" হয়ে, তবেই কি নিজের উচ্চভূমি, অত্যুচ্চ দৃষ্টি থেকে সবাইকে বড় জ্ঞান ক'রে—উৎসাহের জন্য মুক্তি-ফুক্তি ফেলে দিতে বলেছেন? সমস্ত উপদেশের, উপদেশ-লক্ষিত শেষ গন্তব্য পদের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, এই সকল আপেক্ষিক (Relative) কথার যথাযথ সারবত্তা ধার্য করিতে হইবে। (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাজ যিনি, সত্য সত্য মনমুখ এক করিয়া করিতে নামিয়াছেন, তাঁহাকে শুধু কর্মী হইলে ত চলিবে না। "কর্ম-যোগী" হইতে হইবে। মোক্ষকে সনাতন কালের মত উচ্চে, মাচায় তুলিয়া রাখিলে চলিবে না। যদি বলো, "এবারের সংস্কার যা—(আর পৃথিবীর প্রায় সবারই তাই)—তাতে এবার রজোগুণের বিকাশ করা যাক। আসছে বারে সত্ত্ব হবে।" খুব ভাল কথা। কোন আপত্তি নেই। তবে বক্তব্য এই, মোক্ষরূপ শেষ পৈঠার চিন্তা-আলোচনা একেবারে বাদ দিলে চলবে না! এবারে কার্যে পরিণত করা বা না করা, আলাদা।)

* * *

বিশ্বাস-বিগ্রহ শ্রীবিবেকানন্দ—পত্রের একস্থানে লিখছেন—"মার কৃপায় আমি, একা, এক লাখ আছি। বিশ লাখ হব।" তাঁহার বিশাল বক্ষে যে প্রেরণার আগুন জ্বলেছিল, তাহা সম্পূর্ণ দৈবী। তিনি দেব-পরিচালিত। ঘন ঘন ঐশী প্রেরণায় সুপ্রতিষ্ঠিত। স্থির জানতেন যে, মার কাজ করছেন। নিজের নয়। আজ দেশে দেশে, উচ্চ নীচ সর্ব বর্ণের ভিতর, সর্ব জাতির ভিতর, বিবেকানন্দের মানস-সন্তানগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। স্বীকার করো

না নাই করো, বাংলার মরাগাঙে আজ যে জীবনের জোয়ার এসেছে, তার ভিতর বহু-ভগীরথের বুকের রক্তপ্রবাহ আছে। জগদম্বার কৃপায় রামকৃষ্ণ-রাগে অনুরঞ্জিত শ্রীবিবেকানন্দের কলিজায় এই প্রকার ভগীরথত্ব ফুটিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস পরম কাজের কাজী। তিনি অধিকাংশ সময়েই সমাধিস্থ থাকিতেন। লৌকিক হিসাবে এক প্রকার কাজের বার ছিলেন। কিন্তু, তিনিই বহু শুভ কর্ম-প্রেরণার উৎস। বহু বিবেকানন্দের ভাব-জনক। তাঁহারই ভিতর আবার—লোকাচার্যের, লোকগুরুর কঠিন কর্ম যথেষ্ট করিয়া গিয়াছেন। 'অন্নদান অপেক্ষা প্রাণদান বড়। প্রাণদান অপেক্ষা বিদ্যাদান বড়। আবার বিদ্যাদান অপেক্ষা ধর্মদান, আরও বড়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই শ্রেষ্ঠতম দানে মানবের জীবন বিভূষিত, বিমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন।

যে দিন বৃটিশরাজের দ্বিতীয় শহর কলিকাতা রাজধানীর প্রথম নির্বাচিত স্বদেশীয় মেয়র মহোদয়, কর্পোরেশনের বক্তৃতামঞ্চ হতে, বিবেকানন্দের পরমপ্রিয় নয়া বাংলার নবোদ্ভাবিত উদ্ধারবার্তা, জপমন্ত্র—"দরিদ্র নারায়ণ"-সেবাদর্শের কথা পাড়িলেন, সেদিন হে সূক্ষ্ম শরীরী আচার্য! হে শ্রেষ্ঠ যুগমানব! লোকদৃষ্টির আড়ালে তোমার কত না আনন্দই হইয়া থাকিবে! তুমি ত নাম-শ চাহ নাই। বলেছ, পুনঃ পুনঃ—নাম ডুবে যাক। কাজ হোক! ভাবপ্রচার লোক।) ভক্ত বলছেন,—বিশ্বাস করি, বিবেকানন্দের শুদ্ধ আত্মা এখনও ভারতের পতিত অবনতদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। বিশেষ করে ওদেরই যে, তিনি আপনার লোক। তাঁর বিশ্রাম—পূর্বেই বলিয়াছি, এখনও হয় নাই। এখনও হইবে না, হইবার নহে। তাহা না হইলে, কোথা হইতে ওয়ায় লোকজনের জোটপাট হইয়া কায উদ্ধার হইয়া যাইতেছে কেন? শক্তি না মানিয়া উপায় নাই। শুধু স্থূলে সবটার ব্যাখ্যা হইবে না। কেবল যেটা দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ শুধু দৃষ্টের এলাকার দিকে দৃক্‌পাত করিয়া থাকিলে, তুষ্ট হইতে পারিবে কি? অদৃষ্টও যে সততই তাহার সত্তা ও সত্যের প্রতি রুজে লওয়াইবার চেষ্টায় চলেছে। এই দুইয়ে মিলে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম আবহমান-কাল চলে আসছে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, এরা যেন পরস্পর বিবদমানা দুইটি সপত্নী।

আমরা বিবেকানন্দের মত বলি,—এ কি তোমার শক্তিতে হইতেছে, না—আমার চেষ্টায় হচ্ছে? এটা সম্পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের। তাঁদের াজ, কোথা হতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ লোক টেনে এনে, তাঁরাই করিয়ে নিচ্ছেন, জানে? তাঁরাই "মূকং করোতি বাচালং!" বড় কেমিস্ট যেমন কয়লার

ক্কাথ থেকে, চমৎকার রঙ্ তৈয়ার করছেন, তেমনিধারা তাঁরাও পতিত-নষ্টদের ভিতর থেকে সুন্দর সুন্দর মানুষ গড়ছেন।

এ ছাড়া, অনেক জীবন্ত লোককে জানি, যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিহ্নিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ না হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের জীবন ও উপদেশ কেতাব মারফতে পড়া না থাকিলেও, স্বপ্নদর্শন ও কথনের ফলে, জীবনে নূতন আলো, নূতন পথ দেখতে পেয়ে ধন্য হয়েছেন। এর ভেতর পাশ্চাত্য ফেরত, পাশ্চাত্যে নাম করা, পালোয়ান জোয়ান, লক্ষ্মীমন্ত, গুণী মানী ব্যক্তিও আছেন। জীবিত বলিয়া এবং প্রচ্ছন্ন থাকিতে চান বলিয়া, নাম দেওয়া গেল না। আর এঁদের সম্বন্ধে, এঁদের ঐশ্বরীয় ভাবের নিরাবিলত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে, এঁরা বাজারে নাম বাজিয়ে দল বানাতে চান না।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত করুণায়, এই কলিকাতা শহরেই, এইরূপ একটি ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। লীলাময়ের অদ্ভুত লীলা। বিশাল বুক,—পালোয়ানের মত শক্ত মাংস-পেশী তাঁর। ইস্‌লামের শরীর ও বেদান্ত-মস্তিষ্কেরই আভাস।—"Islam body and Vedanta brain." অনেকটা আচার্যের উক্তি-অনুযায়ী। "পেট রোগা" মোটেই নহেন। তিনি যখন হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের কি সাধ্য, ঠাকুর যাকে যেমন করান"—কথাগুলি বড় ভাল লাগিল। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে—দেব-বালককে "বেটা" "বেটা" বলিয়া কথা বলিলেন। বলেলেন,—চোস্ত ইংরাজের ন্যায় ইংরাজী বুলিতে—"I don't want to be spotted out, my dear Sir! I want merely to be His campfollower. চিহ্নিত, মার্কামারা হ'তে চাই না। তাঁর সুর-সেনাদলের একজন তাঁবু-বাহকমাত্র হয়ে জীবনটা কাটাতে চাই।" কি চমৎকার ভাব! স্বতন্ত্রভাবে প্রতি বৎসর তিনি নিজে যেমন পারেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পুণ্য জন্মতিথিতে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করেন। বিপত্নীক পিতাকে প্রাণ দিয়া দেবতাজ্ঞানে সেবা-পূজা করেন! বাড়ীতে পাড়ার ছেলেদের স্বাস্থ্য-চর্চার জন্য ব্যায়ামাগার খুলিয়া দিয়াছেন পল্লীর সর্ব শুভকর্মের এক প্রকার উৎসই তিনি। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার জীবন-রীতি দেখিয়া, প্রতিবেশীদের মুখে তাঁহার সকল রকম মঙ্গলকর্মের কিছু কিছু বৃত্তান্ত শুনিয়া মোহিত হইলাম। আদর্শ গৃহীকে কেমন হইতে হয়, তাহারই ব্যঞ্জনা। চমৎকার ভাব। আপনা হইতে সহজেই মনে মনে তাঁহাকে তারিফ করিতে হইলে। স্বপনে প্রাপ্ত দৃঢ়-সংস্কার-প্রসূত প্রসাদের

ডালি,—আপনভাবে আপনমনে, নিজের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া, কখনও লোকালয়ে, কখনও নিভৃতে নিরালায়, "যখন যেমন তখন তেমন" ভাবে,—বহন করিয়া তিনি, সংসারে, জীবন-পথে, চলিয়াছেন।

তুমি হয়ত বলিবে, বাজে! Supernatural—অপ্রাকৃত খামখেয়াল সৃষ্টি। ধন্য! তোমার অবিশ্বাসভরা সুশিক্ষার, অতি-শিক্ষার বহর!

অকপট সরল অন্তঃকরণে প্রার্থনা করলে, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানে-আলোকিত শ্রীবিংশশতাব্দীতেও মহাত্মাদের দর্শন পাওয়া যায়। ভগবদ্‌ভক্ত ইহাই বলিতেছেন। তবে, এখানে চরিত্রই শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর। যেখানে সত্য, সেখানে মতলববাজীর ঝকমারী নাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে বিশালতর মহত্ত্ব, তপঃশক্তি, তাহা যদি আবার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-সমাজ কর্মীরা নিজ নিজ জীবনে, আভাসেও পুনঃ সংস্থাপন করতে পারেন তবেই তাঁদের নগ্নপদের ধূলিতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট লুটিয়ে পড়বে, তীর্থবুদ্ধিতে স্পর্শ করে নিজেদের পবিত্র করে নেবে, নিঃসন্দেহ। দুনিয়ায় বড় বড় 'হোমরা চোমরা,' লক্ষ্মী-সরস্বতী উভয় সমাজে প্রথিতনামাদের অন্তর, বিজয়ী বীর-বিবেকানন্দ জয় করেছিলেন। কিসের জোরে? অনেক তাঁদের ধন-সম্পদ-ভাণ্ডার তাঁর সাম্‌নে খুলে ধরেছিলেন। কেন?

শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামে বড় বড় কাজ হ'লেই চলবে না;—তাঁদের ভাব অনুযায়ী হওয়া চাই। ভাবকে, তাঁদের প্রেমময় অস্তিত্বকে অস্বীকার করে—ভাবকে জবাই করে, বড় বড় ফলাও কাজ কল্লে কি হবে? তার ফলে কর্মী নামধারী হতে পারবেন, নিঃসন্দেহ। অনেক কিছু বড় বড় বিরাট ব্যাপার তাঁদের দ্বারা হবেও। তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীর জীবনে রজের বিকাশ বিশেষ বাঞ্ছনীয়। দেশের কাজ খুব ভালোই।

(অধ্যাত্ম-আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাশ্রয়ীর অল্প কাজও ভাল।) আদর্শবাদীরা চিরকাল এ কথা বলে থাকেন। বলবেন। আর এই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ এবং ব্যবসায়-বুদ্ধিকে বড় আসন দিলে, কেবলমাত্র দলের নাম, প্রচার বুদ্ধিকে বড় কল্লে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উপর হ'তে খালি হাসবেন। আজ অশেষ প্রকারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ মহাদর্শ বিচারের সময় আসিয়াছে। 'বিমৃশ্যৈ-তদ্ অশেষেণ।" তার পর "যথেচ্ছসি কুরু।" (গীতা ১৮।৬৩) আদর্শ ঘোলাটে হয়ে গেলেই সর্বনাশ। বুদ্ধির দ্বারা, সর্ব কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া কর্মমার্গে বিচরণের ভার, কর্মযোগীর উপর আছে। (গীতা

১৮।৫৭)। ভুল সকলেরই হয়। কিন্তু, প্রায়শ্চিত্ত-বুদ্ধির দ্বারা ভুলকে ভুল বলিয়া স্বীকার করা দেবচিহ্নিত দেবাশ্রিত—দেবনামাঙ্কিত—কর্মযোগীদের পক্ষে আবশ্যক। মত্ততায় মানুষ আত্মপক্ষ সমর্থন সর্বতোভাবে করে থাকে।

সত্য-নির্ণয় সঙ্কট। দুই পক্ষ বলিয়া যাওয়াই শ্রেয়। কেহ কেহ বলছেন, আর স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে, বড় লোকের হাতীদের নিয়ে, ঠাকুরের কাজ চালানো যায় না। তারা সব প্রচণ্ড খামখেয়ালী। কাজ করতে করতে ছেড়ে চলে যায়। তাদের তুষ্ট করা বড় শক্ত। আমরা অতঃপর বেতনভোগী লোক রেখে মস্ত বৃহৎ বৃহৎ কাজ চালাবো।

অপর পক্ষ বলছেন,—খুব ভাল। তবে সে কাজটা তোমার ব্যক্তিগত নামে করতে পারবার সৎসাহস থাকাই বাঞ্ছনীয়। আদর্শবাদের ভিতর—expediency—"ক্ষেত্রকর্ম" কথাটা এক এক সময়ে বড় মারাত্মক। অনেক গলদকে—"ক্ষেত্র কর্ম বিধীয়তে"-বাদ দ্বারা সমর্থন, শুধু ধামা চাপা দেবার ফিকির ফন্দী। তোমার আমার খেয়ালের কাজ কতটা, আর ঠাকুরের কাজ কতটা, ভেবে দেখা উচিত। শুধু কাজ দেখানোই কি উদ্দেশ্য? রবিবাবু বেশ গান করেছেন,—"ভয় হয় পাছে, তোমার কাজে আমারে করিহে প্রচার।" বহির্দৃষ্টি হইতে যাহা বোধ হয়, তাহা ভুলিয়া যাও। আদর্শকে শক্তভাবে ধরে, যতটা পারা যায়, তাহাই কি করা উচিত নয়? এই আদর্শটি এক কথায় বলিতে গেলে, কাম-কাঞ্চন-আসক্তি কমাইবার চেষ্টা। কত কড়া ও চড়া সুর গোড়ায় পরমহংসদেব বেঁধেছিলেন মনে পড়ে? লক্ষ্মী মাড়োয়ারী যখন মোটা টাকাটা দিতে এসেছিলেন, তখন পরমহংসদেব তা দিয়ে, 'নাম কী ওয়াস্তে" অন্ততঃ একটা বড় পাঠশালা বা অতিথিশালা, তাঁতশালা, গোশালা,—এই ধাঁচের একটা কিছু গড়বার জন্য তা ফেলে রাখতে পারতেন না কি? ঐ টাকাটার একটা স্বতন্ত্র পরিচালক-মণ্ডলী গড়ে, নিজের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেই ত হত?

কাঞ্চনত্যাগী পুরাপুরি তাঁর মত কেহ নাই। অতি সত্য। কিন্তু, তাঁকে মনে রেখে পথ চলাটা কি কর্তব্য নয়? মাইনেকরা গোলাম-নোকরে, হাজার অন্যায় প্রভু করলেও, তা' নির্বিবাদে সয়ে নেয়। যখন একান্ত অসহ্য চোখে ঠেকে, বিটকেল রকমের কিছু ঘটে, তখন মনকে বলে,—"ওরে তুই গরীবের পুত, তোর অত সমস্যায় কাজ কি? তুই আপনার দিন কিনে, রেস্ত বাগিয়ে নে। খেয়ে নে। পরে নে। তোর অতশতে কি হবে?"

একটা মানুষকে যে দশদিন আপনার ক'রে রাখতে পারে না, সে আবার কোন সাহসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাজে হাত দেয়? তবে, এটাও ঠিক যে, নিজেদের সব অসম্পূর্ণতা লইয়াই যদি নামতে হয়, ত মহতেরই নামে অকপটে নামতে হবে। কারণ, তা হ'লে একটা মস্ত আশা থাকবে যে, ভবিষ্যতে তাঁদেরই দয়ায় গলদ সব কেটে যাবে। স্বেচ্ছাসেবকদের বাদ দিলে চলবে না। তাঁদের নিয়েই প্রস্তুত হতে হবে, যাঁরা বলবেন—"আমি মিনি মাইনের চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী।" নিজের বেয়াদবী, বদ কর্তামিটাকে শুধু প্রশ্রয় দিতে, কর্মরূপ অজুহাতের সোনারপাতে মুড়লে চলবে না। যদি মাইনে-করা কর্মী দিয়েই চলতো ত মূলে পরমহংস অত কেঁদে, সেধে, নরেন্দরের জন্য একাকার করলেন কেন?

প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে, কিম্বা, একলা নিজেই বেশী রকম—আর ভাল রকম কাজ করতে গেলে, এলোমেলোয় মোটেই চলে না, জানি। শৃঙ্খলা-পদ্ধতি খুবই দরকার। যাঁর সব সময়ে পরণের কাপড়ের ঠিক থাকত না, তাঁর কিন্তু, কেমন সুন্দর নিয়মিত কর্মপদ্ধতি ছিল, সেটা ভুললে চলবে না। তিনি বলেছেন, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, অযথা (যাহাতে 'হাম' ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে এরূপ) কাজ কমিয়ে দেবার জন্য। সামনে যেটা পড়লো,—আবশ্যক, না করলে নয়,—সেটা তখনই করবে।" দৃষ্টান্ত—কাঙাল গরীবদের পেট ভরিয়া খাওয়াইবার ও পরাইবার জন্য, সেই গলিতকর্মা পরমহংসের তীর্থপথে, সঙ্গী মথুরানাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ—এমন কি, তাঁহার একান্ত জিদে, মথুরানাথ কর্তৃক তাঁহার অভিলাষ অনুযায়ী অনুষ্ঠান। তারপর আরও, তাঁর ঘরের দৈনন্দিন কাজে পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের দিকে তার দৃষ্টি ছিল খুব। আমাদের ছাতা-জোবড়া এলোমেলো দেখে, স্বামী সারদানন্দ বলতেন, ওরে, ঠাকুরের ঘরে, এমন জায়গায় তাঁর জিনিষ-পত্তর ঠিক ঠিক জায়গায় তিনি রাখতে বলতেন যেন,—অমাবস্যার রাত বারটার সময় আলো না নিয়ে, হাত বাড়াইলেই দরকার মত দেশলাইটি তিনি পান।

নিছক ব্যবসা-প্রতিভার মগজ (business brain) নিয়ে কি এই আদর্শাঙ্কিত কর্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপর? সওদাগরের কুঠি, মুহুরীমক্কেলের 'হুজুর-হুজুর'-রব-মুখরিত কেরানীগিরির কার্যালয় ব্যবসায়ের প্রতিভায় গঠিত হইতে পারে। মাইনেকরা লোক নিয়োগকারী অনেক প্রতিষ্ঠান

ভারতে আছে। যাদের দেনাই বিশ লাখ। সেগুলির অনুরূপ কিছু গড়বার জন্যই কি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এলেন? নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেগুলি কিছু কেউ কম নয়। মূল্য যথেষ্টই তাদের,—অনেক ক্ষেত্রে গর্বের বস্তু। তোমাদের বৈশিষ্ট্য কোথা?

শ্রীকৃষ্ণমুখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমাকে নিত্যযুক্ত হয়ে ডাকবে। তা যদি না পারো ত "মৎকর্মপরমো ভব"। হে নব পার্থ-মণ্ডলী, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দও আমাদের এই আহ্বান দিয়াছেন। এই মৎকর্মের রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতে হইবে। "আমি না হ'লে এটা অচল হবে," এরূপ বুদ্ধি,—এই নামাঙ্কিত মৎকর্মের ভিতর স্থান পাইবে না। বাইবেলের উপদেশ আছে, The Lord can create his men from out of the dusts—ধূলোমুঠোর ভেতর থেকে প্রভু তাঁর মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন।

হে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অমোঘ বজ্র-নামাঙ্কিত কর্মযোগীবৃন্দ তোমাদিগকেও, সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ শ্রীপরমহংস যেমন বিষয়-মলিন কলিকাতা শহরের সিমলাপল্লীর কায়েতের ছেলেটিকে, কালী মন্দিরে বসে অবিরাম ধ্যান করতেন, তোমাদিগকেও সেইরূপ বিবেকানন্দ-দাবানলের এক একটি ছোট স্ফুলিঙ্গের আশায় সৎগৃহস্থের দ্বারপাশে তাকাইয়া থাকিতে হইবে। প্রভুর পতাকা, তাঁহারাই বহিবার জন্য, যুগে যুগে ভারপ্রাপ্ত। রেহাই নাই। নিস্তার নাই। সংসার ও সন্ন্যাস এই দিক দিয়া একই সোনার তারে বাঁধা। সৎসংসার না হইলে, সৎ সন্ন্যাস দুরাশা। ঠাকুর ত নরেন্দ্রের জন্য অতটা হা হুতাশ না করে, বেতন দিয়ে লোক রেখে, তাঁর নব আম্নায়, নব অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়, লোকশিক্ষাব্রত চালাতে পারতেন। সুখ-দুঃখ-ভাল-মন্দ মিশ্রিত জীবন্ত মানুষ দিয়ে, "মেসের" বুদ্ধি নিয়ে, মেসই গড়া যায়, সংঘ-নির্মাণ হয় না। যে পূজার, যে মন্ত্র! মানুষকে যে দিন "ম্যয় গোলাম" বানাতে পারবে, নফরের বাড়া শতগুণ সুদৃঢ় বন্ধনে প্রেমের শিকলে বাঁধতে পারবে, সেই দিনই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তকমা লাগানো তোমার সফল হবে। নতুবা বহিঃশোভা বাহিরেই থাকিয়া যাইবে। আবার মতলবী লোক অর্থের লোভে বা অর্থ কর্জের ফিকিরে বা ঠিকাদারী পাবার আশায় যে আকৃষ্ট হয়, চারিদিকে ঘুরে ফিরে, সে আকর্ষণে আর এ

আকর্ষণে আকাশ জমিন্ ফারাক্। ইহা সংঘটিত করিতে না পারিলে, "বৃথা জনম গয়ো।"

তুরীয়ানন্দের ব্রাহ্মণ্য-নিষ্ঠা, হিন্দুসুলভ ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতিতে পূর্ণ আস্থা, রামকৃষ্ণানন্দের অন্যান্য বহিঃকর্মবিবিক্ত, একনিষ্ঠ ঠাকুর-সেবার ভাবকে—হার মানিতে হইয়াছিল। তাঁহারা নির্লিপ্ত জীবন ছাড়িয়া, প্রচার-ব্রত মাথায় লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। কেনো?—নরেন্দ্রের প্রেমের আকর্ষণে, অকপট বিশ্বাসের মহিমায়। তাই, বক্তৃতা-ক্লাস করে এসে, মাদ্রাজমঠে শ্রীশশীকে, স্বামীজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে—সাধারণ-দৃষ্টিতে উন্মাদের মত আচরণ করিতে দেখা যাইত। নাক কান মলিয়া বলিতেন,—"ভাই, তোমার আদেশে এসেছি। মানসম্ভ্রম যা লোকে সব করলে, সব তোমার। আমার যেন অহঙ্কার না আসে।" ঠিক এইভাবেই তিনি আর একবার, পাশ্চাত্যবিজয়ী নরেন্দ্রনাথের চিকাগো-বক্তৃতা পুস্তিকাকারে আসিয়া পঁহুছিলে, অন্য কাহাকেও তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে না দিয়া, সরাসরি সর্বপ্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে চিন্ময় জীবন্ত আবির্ভাবের সমক্ষে সশ্রদ্ধ হইয়া সবটা পাঠ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের প্রতিকৃতির সমক্ষে বলেছিলেন,—"এই শোনো, তোমার নরেন্দর সে দেশে কি-সব কথাবার্তা ব'লে জয়জয়কার পেয়েছে।" আশ্চর্য গুরু, আর আশ্চর্য তাঁর শিষ্য!

ঠাকুরের স্থূলদেহ তিরোভাবের পর, এই দেবদুর্লভ ভ্রাতৃ-প্রেম-প্রীতির হেম-সূত্রে সুদৃঢ় সংঘবদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণ, নরেন্দ্রানুগ হইয়া, যে যুগচক্র রচিয়াছিলেন, সেই যুগচক্রের তপস্যার সুফল, আজিকার বাংলার তরুণেরা ভোগ করিতেছেন। "বাড়াভাতে" তাঁরা বসিতে পাইতেছেন। তৈরী সম্পত্তি। একজন আগুন করে,—পাঁচজনে সেটা পোহায়। কিন্তু, গুরুদিগের জীবনের সুগভীর ঈশ্বরপ্রেম ও মহান্ মনুষ্যত্ব অন্তরে সর্বদা জাগরূক রাখা চাই। তাঁহাদের আশীর্বাদে আমাদের ভিতর সেই সব ফুটুক।

তখন পয়লা নম্বরের কয়েকটি খুব খাঁটি মানুষ ছিল। এখনও খাঁটি মানুষ একেবারে নাই; এ কথা মিথ্যা। তবে বেশী পরিমাণে খাঁটি মানুষ গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নিজেদেরও খাঁটি হইতে হইবে। নিজেরা খাঁটি হইবার যেমন সব 'মডেল'—আদর্শ দেখিয়াছি, তাহারই কথঞ্চিৎ অনুরূপ হইবার অন্ততঃ চেষ্টা চাই। পয়সার দাস আমরা যেন না হই। ঠাকুর বলতেন,—"তিনি কি চান?—টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি। বিবেক, বৈরাগ্য। এইসব

চান।”……“হাজরা বলে, তুমি রাজাগুণী লোক বড় ভালবাসো,—যাদের টাকা কড়ি, মানসম্ভ্রম, খুব আছে। তা যদি হ'ল তবে হরীশ, নোটো (লাটু)—ওদের ভালবাসি কেন? নরেন্দরকে কেন ভালবাসি—তার ত কলাপোড়া খাবার নুন নেই?”—শ্রীমুখের সাফ, চমৎকার কথা। কোনও পেঁচোয়া নেই। বালকবালিকায় বুঝিতে পারিবে।

আমাদের সকলের খুব সাবধান হওয়া উচিত, যেন পয়সার নিক্তিতে মানুষের আদর-কদর না করি। কুঁড়েঘরে বাস করে অন্তরটা যাঁদের রাজরাজেশ্বরের মত, তাদেরই মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে, সিরিয়ার সাধু আইজাক—(খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী—তৎপ্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—The Flame of Things—আলোকরূপী নিখিল বস্তু), প্রভৃতি তিতিক্ষাশীল, উষ্ট্রচর্মাচ্ছাদিত স্বল্পাহার-বিহার মরুর বাবাজীদের (Desert Fathers) যে স্থান, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় ইঁহাদেরও কতকটা সেই স্থান। “বড় বাড়ী আর ছোট মনে” কোন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয় না। কারণ, জ্বলিলে চলিবে না, চকচকে বড় বাড়ী—'মানুষ'—মনুষ্যত্বের মানে “মানী” এবং মনুষ্যত্বের হুঁসে হুঁসিয়ার—অভাবে হাহাকার করে। লোকই লক্ষ্মী। ভাললোকই লক্ষ্মী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আছে,—“এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মত। আর জীব হয়েছে এক একটি ঝাড়ের দীপ। পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলুম। এ জগৎ কে জানতো? ঈশ্বর মানুষ করেছেন, মানুষে তাঁর মহিমা, প্রকাশ বেশী। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার। ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।” শ্রীরাজা-মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী) সুন্দর বলতেন,—“মোটা ভাত-কাপড়ের বেশী হ'লে, মাথা সাধারণতঃ বেঁকে যায়। বেশী ভাল নয়।” রোকড়ের দোকান, কার-কারবার, চাকচিক্যে, মানুষের অন্তরাত্মা সত্যসত্যই চাপা পড়ে। সমাধি-সাধন-প্রতিষ্ঠ সাধকের কথা স্বতন্ত্র। দারিদ্র্যের পেষণে, ভক্তিমূর্তি শ্রীবিদুরেরও সৃষ্টি হয়। অবশ্য, দারিদ্র্য খুব ভাল এবং দরিদ্রই ঈশ্বরভক্ত, এমন অযৌক্তিক বাক্য বলিতেছি না। দরিদ্র সাধু নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের বিদুর। (ডাক্তার দুর্গাবাবু রাজপুতনার কোন এক স্টেটে মোটা মাইনের একটি চাকরি পান। কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়া, তথায় কর্মে যোগ দেন। তিনি ঠাকুরের ভক্ত। স্টেটের চাকরিতে প্রবেশ করে দেখলেন, চারিধারে চাতুরী, ছল। পাটোয়ারী প্যাঁচে তাঁকে ঘিরে ফেললে। যায় প্রাণভয়ের আশঙ্কা দেখা দিল। টাকা ছেড়ে, প্রাণ নিয়ে

পালিয়ে এলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ভারি খুশী। বল্লেন, ভক্তদের সাংসারিক ঐশ্বর্য খুব বেশী হইলে, সচরাচর ঠাকুরকে ভুলবার ধাক্কায় দাঁড়ায়। তাই তিনি, যার পেটে যা' সয়, তাকে তাই দিয়ে, ভক্তিপ্রবণ করে রাখেন। ঠাকুর আমাদের অনন্ত করুণাময়।

ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের নিকট শ্রীশ্রীবাবুরামের জননী, মায়ের মায়া ভুলিয়া গেলেন। ভক্ত বলিবেন, ঠাকুর ভুলাইয়া দিলেন। বলিলেন, এ ছেলেটি আমাকে দাও। মা বলিলেন, সে ত ভাগ্য। আপনার কাজে লাগবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে এইরূপে কত মানুষ যে চাহিয়া লইতে হইয়াছে, কে জানে? কখনও রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্টা লৌকিক মায়ের কাছে, কখনও বা চিন্ময়ী জগজ্জননীর নিকট হইতে। এই বাবুরাম কত বড় দরের মানুষ ছিলেন, তার একটি কথা বলিলে, পাঠকপাঠিকা বুঝিতে পারিবেন। ইহার পবিত্রতার, অত্যুচ্চ সুখ্যাতি শ্রীশ্রীদেব করিতেন, বলিতেন, ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। (প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যখন তাঁর বয়স, তখন একদিন একজন, পাঁজি পড়িতে—হঠাৎ অতর্কিতে —হস্ত দ্বারা ইন্দ্রিয় উপভোগ-বাচক শব্দটি তার সামনে পড়িয়া ফেলেন। তাতে তিনি বলেন, সে আবার কি ব্যাপার শুনিয়া তিনি বলিতে থাকেন, "দুর্গা! দুর্গা! এমনও করে না কি রে লোকে? গঙ্গাজল নিয়ে আয়। সকলের মাথায় ছিটিয়ে দে, পাজিতেও দে।") পাঠক, ইহা কি বিশ্বাস হইবে, না বানানো-গল্প বলিয়া বিজ্ঞতা দেখাইবে? প্রেমানন্দ যে শক্তি-পাথারের একটি বুদ্বুদ মাত্র—একটি দিক, একটি কণা,—সেই পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণাবয়ব শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্রতা সম্বন্ধে একটি কথা এই প্রসঙ্গে (যাহা সমসাময়িক মুখে পাইয়াছি) বলিয়া যাইব। জানি তোমরা বলিবে, ওটা শরীর-বিজ্ঞান-নিরূপিত সত্যকে অস্বীকার কচ্ছে—It is a Physiological impossibilty—একেবারেই হতে পারে না। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, উল্টাদিকে ফুসফুস সমাবিষ্ট হইয়া মানুষ বেশ সুস্থ সবলভাবে বেঁচে আছেন, এমন একটি দৃষ্টান্তের কথা কিছুকাল পূর্বে খবরের কাগজে পড়িয়াছি। সমাধিতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হওয়া এবং পরে আবার ফিরিয়া পাওয়া, কি করিয়া সম্ভব হয়? বিজ্ঞানাচার্য মহেন্দ্রলাল সরকার পরমহংসদেবের ঐরূপ হইতে দেখিয়াছিলেন। বিজ্ঞান ত কেবল সচরাচর ক্ষেত্রগুলিতে যাহা সংঘটিত হয়, তাহা হইতেই সাধারণ নিয়মনিচয় বাহির করে। অসাধারণ ক্ষেত্রে কি হইবে, তাহা বিজ্ঞান-বিচারের বাহিরে! আর পরমহংস মশায়ের ভাষায়, ওগো—তিনি ইচ্ছাময়,

তাঁর আইন, তিনি ইচ্ছে কল্লে পাল্টাতে পারেন। পূজনীয়া গোলাপমাতা একদিন বলিয়াছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে একদিন পরমহংস মশাই উলঙ্গ শিশুটি হয়ে, ঘরে নিজের চৌকিটিতে বসে আছেন। আমরা সব অনেকগুলি যুবতী মেয়ে তাঁকে দর্শন করতে গেছি। তাঁর অঙ্গবিশেষ লক্ষ্য করিয়া সরল বালকের মত সবাইকে বলছেন, "হ্যাগা, সাধে কিগো লোকে—পরমহংস, পরমহংস করে? এই স্বপ্নে পর্যন্ত এর একতিল স্খলন হোলো না।" শ্রীবাবুরাম হচ্ছেন,—a chip of this old block. বাপ্‌কী বেটা—বটে। এই মহাখনির একটা পাথরের টুক্‌রো মাত্র।

যাক্ সে কথা,—এইরূপে যুগে যুগে কত ঈশা, কত চৈতন্য, কত রামকৃষ্ণকে "মানুষ দেলায় দে রাম"—বুলি হাঁকিয়া হাঁকিয়া, ভিক্ষার ঝুলি দুনিয়ার দরবারে ব'য়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। "দেবতা ভিখারী মানব-দুয়ারে"—শুধু কর্মনাশা কবিতা বা শুধু সঙ্গীত নহে। অক্ষরে অক্ষরে পরম সত্য। অতীব খাঁটি কথা। বড় আদর্শ স্থাপন করবার সাহস নিয়ে যাঁরা ঈশ্বরীয় কাজে নামবেন, তাঁদের এইরূপ অবৈতনিক প্রেমের গোলাম—জীবনভোর স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য, অপেক্ষা করতে হবেই হবে।

তবে, এ কথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না যে, যদি ঠিক্ ঠিক্ তার ভাবটিও বজায় থাকে, তা হোলে বেতনভোগী লোক দিয়েও যে সব সৎকর্ম পরিচালিত হয়, তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য আছে। তবে তাতেও আবার ভেল থাকলে চলবে না। দেখা যায়, সংসারে অনেক সময় অনেক প্রতিষ্ঠানের মিছে 'প্রেস্‌টিজ'—একটা মনগড়া প্রতিষ্ঠাবোধই কার্য-নিয়ামক নীতি হইয়া দাঁড়ায়। নিছক রাজনীতি ক্ষেত্রে, এই কূটনীতির প্রতাপ আমরা সব দেশেই দুই বেলা দেখিতেছি। যে পূজার, যে মন্ত্র। সেখানে হয়ত অন্য উপায় নাই।

সৎকার্য সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদিগের প্রতি স্বামীজীর উপদেশ ছিল, "দেশ যখন নেবে, তখন তোরা হাসতে হাসতে সে কাজগুলো তাদের হাতে সমর্পণ করে দিবি। তোরা কি অনন্তকাল ধ'রে সেই সবই একমাত্র করতে থাকবি?" আবার ইহার মধ্যে কথা আছে। অনেকের অধিকাংশ কাজ,—কাগজে-কলমে। বাস্তবে তেমন নয়, বল্লেই হয়। খালি বাজার গাবানো। "যেন তেন প্রকারেণ" কাগজে কাজ দেখালে কি হবে? তাতে পাকারকমের ওস্তাদির ও মুসাবিদার পরিচয় পাওয়া যায় বটে! লোকামান্য তিলকের দেহান্তের কয়েক বৎসর পর,

মারাঠি কোন অভিনেতার দল একবার কলিকাতার স্টার রঙ্গমঞ্চে "ভগবান্ তিলকজী" নামক একখানি নাটক অভিনয় করেন। নাটকে একটি 'ভাঁড়' চরিত্র নামাইয়া ইঁহারা দর্শকমণ্ডলী সকলেরই নিকট হইতে অকপট সুখ্যাতি ও বাহবা পাইয়াছিলেন। 'ভাঁড়টির' আপাদমস্তক টুক্‌রা টুক্‌রা ছেঁড়া কাগজ, আটা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছিল। পায়ে ঘুমুর পরে, ঝুম্ ঝুম্ করে নাচতে নাচতে, সে গাইতে লাগলো,—"সব কাগজ্ হ্যায়! সব কাগজ্ হ্যায়"—এ তুনিয়ার সবই 'কাগজ্ হ্যায়'—বড়ই সত্য, সাঁচ্চা কথা। এখনও তার কথা মাঝে মাঝে কানে বাজিতেছে। "The Great War, from a particular point of view, was won by the Press."—বিগত মহাযুদ্ধটা কাগজ কলম দিয়েই জেতা হয়েছে,—একদিক দিয়ে দেখতে গেলে।

বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, Paper constitution কাগজে কলমে ছকা শাসন-তন্ত্র, আবার Actual constitution.—বাস্তব চল্‌তিযন্ত্র—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সত্যকার সাফল্য আর কাগজজাত 'সাক্‌সেসে,' অনেক সময় অনেক তফাত থাকে। পরমহংসদেব বোধহয় এই অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জন দোষের জন্য খবরের কাগজ ছুঁতে পারতেন না। কেতাব-দোরস্ততা, বাজার চল্‌তি পাঁচটা জিনিষের মত, অন্যত্র বেশ কাজ চালাতে পারে, কিন্তু, অধ্যাত্ম-ধর্মরাজ্যে, এরূপ চোরাবালির বাঁধ বেশী দিন টিকে না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের রাজ্য—অধ্যাত্মধর্মরাজ্য—নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির রাজ্য। সত্যকে ধরিয়া থাকাই যে, সবচেয়ে বড় প্রেস্‌টিজ্। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফাঁকা স্বপনের শ্বেতহস্তীকে বজায় রাখতে গিয়ে, অনেক সত্যকে জবাই করতে হয় এবং দিনকে রাত করতে হয়। অধ্যাত্ম আদর্শের রাজ্যে উহা চলা মুস্কিল। কারণ, এখানে অর্থলাভরূপ আপোষকারী কাপুরুষতার অভাব!

পুনঃ পুনঃ পরমহংসদেবের সেই কথারই সারবত্তা মনে হয়। "মন মুখ এক করো।" এ সব বিষয়ে যে যার নিজের নিজের বুকে হাত দিয়ে, বিচার করতে হবে। বাহিরে থেকে কেবল এড়ো তর্ক করলে, বিশেষ কিছু কাজ হবে না। নিজেদের সুবিধার জন্যই, ভ্রমপ্রমাদ সংশোধনের জন্যই, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আদর্শ-আলোচনা প্রসঙ্গ। অনেক সময় ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের পথ খোলসা করিবার জন্যই ইহা দরকার। সুধী সাধু-সমাজ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভক্ত

গৃহস্থসমাজ, সবদিক ভাবিয়া, বিচার করিয়া লইবেন। কি ভাবে আপনাপন জীবনের মোড় ফিরাইতে হইবে, সে অনুজ্ঞা আজ সকলেরই কাছে এসেছে। সুন্দর হইয়াছে! শুধু দলের দোহাই, আজ আর চলিবে না। আজকের দিনে প্রত্যেককে যাচাই করিয়া লইবার দিন আসিয়াছে। শুধু আমি অমুকের মন্ত্রশিষ্য বলিলে, আর বাজারে কাটিতেছে না।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নামাঙ্কিত কার্যের মাধুরী, বাহাদুরী এই যে, শত শত কর্মীকে, মানুষকে এই যুগভাবধারা অবৈতনিক গোলাম বানাচ্ছে। কাশী-রামাপুরার সেই বিবেকানন্দ-অনুপ্রাণিত কর্মযোগী, কয়েক আনা-মাত্র-সম্বল যুবকদের সুন্দর কর্মতপস্যা ভাবিলে, শ্রদ্ধায় হৃদয় অবনত হয়। তাই, আজ সমগ্র ভারতের বে-সরকারী সৎপ্রতিষ্ঠান-শ্রেণীর ভিতর,—ভারত জুড়িয়া যাহা কিছু তাহার মধ্যে,—এইটি উচ্চশির ধারণ করিয়া আছে। বাংলার যুবক! বাংলায় নবজাগরণ আনয়নের প্রথম-প্রভাত মঙ্গল-বৈতালিকগণ! তোমাদের কর্মসাধনা ধন্য। আজ সেই বিরাট অনুষ্ঠানে মাইনে-করা কিছু কিছু লোক,—কাজের সুবিধার জন্য, সন্ন্যাসী কর্মীদের আত্মিক সাধনার সময় করিয়া দিবার জন্য,—নিয়োগ করা আবশ্যক হতে পারে, কিন্তু, মূলটি ভুলিলে চলিবে না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শ যতই অধিক আলোচনা হইবে, ততই এই মূলগত 'ভেল' হইতে ভবিষ্যতে নিস্তার পাইবার আশা। আর ততই কল্যাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয় শ্রীশশীর আশীর্বাদসিক্ত মাদ্রাজী আর একটি যুবকের শিক্ষাশালা, মাদ্রাজের একটি স্থানীয় মহতী কীর্তি। সেইরূপ মুর্শিদাবাদ, কনখল, লক্ষ্ণৌ, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, সিংহল, রেঙ্গুন, দেওঘর, কলিকাতা, করাচী, ঢাকা, বোম্বাই, মলয়, বেলাত-মার্কিন—কতই না মাথা তুলিতেছে। কিন্তু মাইনে-করা মানুষের প্রত্যাশা অতি অল্পই। মানুষকে ভিজাতে না পারলে, টাকা না দিয়ে, স্নেহ-ভালবাসা সেবা-অধ্যাত্মশক্তি দিয়ে, কেনা গোলাম না করতে পারলে, সব সত্ত্বেও, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আসা এবং আশা ব্যর্থ হইবে।

ত্যাগ-তপস্যার শক্ত খোঁটা না ধরিয়া, কর্মপথে বিচরণ করিলেই যোগটোগ সব শিকেয় উঠে পড়ে। অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে গৌণ-বুদ্ধিতে সৎকাজ—লোকহিতকর অনুষ্ঠানাদি রাখা চলে। যদি কাজ এত বেড়ে যায় যে, অধ্যাত্মবিদ্যায় দৃষ্টি দেওয়া যাচ্ছে না, তা হলে কোন্‌টা ত্যাজ্য, কোনটা কত কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে, সে বিষয় চিন্তার দরকার। স্বামীজী

জ্ঞানযোগে এও বুঝিয়েছেন যে, তর্কচ্ছলে যদি এমন এক মানুষের কল্পনা করা যায় যিনি ঈশ্বর মানেন না, অথচ নিঃস্বার্থভাবে লোকহিত আচরণ করেন, তবে তিনিও নিশ্চিত আত্মজ্ঞান লাভ করবেন। এরূপ মহান্ আত্মার সংখ্যা সংসারে বিরল। অতগুলি অতিমানব শিষ্যদের ভিতর, প্রভু—নরেন্দ্রকেই ঠিক ঠিক একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। নরেন্দ্র লৌকিক আচারের বাহিরে। বেদকে অবেদ করিবার ভার তাঁরই। "সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।"

অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি জাগাইবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অন্তরে ব্রহ্মাকারাবৃত্তি সঞ্চারিত করিবার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া, ঐ দিক দিয়া কর্মের আনুকূল্য প্রাতিকূল্য বিচারের তীক্ষ্ণ জ্ঞান-অসি ধারণ করিয়া সংসার সমরাঙ্গণে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলে,—জীবনের ছন্দে, জীবনের গানে, প্রকৃত তাল রাখিতে পারিলেই, কর্মের গতি গহনা না হইয়া,—কর্ম,—অকর্ম বা বিকর্ম না হইয়া 'সহজ' কর্ম হয়। সংসারে শান্তি পাওয়া যায়। সংসার খাইয়া-দাইয়া মজা লুটিবার জায়গা হয়। মজার কুঠি হয়। সংগ্রাম অনুক্ষণ, আজীবন করিয়াও, তাহার মধ্যে যোগজ স্তব্ধতা আইসে। সাধারণ পুরুষ মহান্ পুরুষ হন। সাধারণ নারী সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তী, সারদা দেবী হন। দরকার হলে কাজ ছেড়ে দিতে, প্রাণ "কর কর" করে না।—নতুবা, কেবল কর্মের ছুতায়, বাহিরের হাত-পা নাড়া। কেবল বহ্বাড়ম্বরে মেতে উঠলে, শেষে ফাঁকা মিশনারী লিঙ্গধারী হইতে হয়। বিজ্ঞাপনের দিকে কেবল নজর পড়ে থাকে। কর্মযোগ, দোকানদারীতে গিয়ে শেষ পরিণতি পায়। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার একখানি পত্রে বলিয়াছেন, কামিনী-কাঞ্চনের মায়া সাধু ত্যাগ করলেও করতে পারেন, কিন্তু ভায়া, ঐ নাম-যশের দঁকে অনেক তরীই বানচাল হয়ে যায়।) গীতাতে সেইজন্য ভগবান স্পষ্ট বলছেন,—যাঁরা সেই অব্যক্ত, অনির্দেশ্য ব্রহ্মেতে নিষ্ঠাবান, তাঁহারাই সকল ভূতের হিতে রত থাকিতে পারেন। এই "ভূতহিত" অবার এক রকমের নয়। কখনও উপদেশ দান। কখনও অন্নজল দান। ইত্যাদি। যখন যেমন, তখন তেমন। তে ত্বক্ষরং অনির্দ্দেশ্যং অব্যক্তং পর্য্যুপাসতে। সর্বত্রগং অচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থং অচলং ধ্রুবং॥ "সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং" সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব "সর্বভূতহিতে রতাঃ॥" লক্ষ্য করিবার বিষয়, আর তাঁরা হবেন, ইন্দ্রিয়-সংযমী। এইরূপ হইতে পারিলে, ধর্মসংস্থাপনার্থ প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি ঘাঁটাতে ভয় নাই।

সন্ন্যাসী কাঞ্চনসংস্পর্শশূন্য হইলেই অবশ্য ভাল হয়। ধর্মসংস্থাপনরূপ

মহৎ কর্মের জন্য মঠধারী সন্ন্যাসী অর্থভিক্ষা করিতে পারিবেন, আচার্য শঙ্কর স্পষ্টাক্ষরে অনুমোদন করিতেছেন। রাজা যেমন করগ্রহণ করেন, ঠিক তেমনি। "ধরামালম্ব্য রাজানঃ প্রজাভ্যঃ করভাগিনঃ। কৃতাধি-কারা আচার্যা ধর্মতস্তদবদেব হি।" তবে নিছক নিজেদের পেট-পূজার জন্য, মালসাভোগ চড়াবার জন্য নহে। নিজেদের জীবনধারণ উপযোগী অর্থ অবশ্য চাই। কিন্তু লোককল্যাণের দিকে পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্টি রাখিয়া, এই টাকারূপ মহাগ্নি লইয়া খেলিবার উপদেশ। সেইজন্যই আচার্য হইবেন 'জিতেন্দ্রিয়'। জলে ভাসবেন মাত্র। কিন্তু, পদ্মপত্রের মত জল গায়ে লাগবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বর্তমানের ভাব-বন্যা

আজ যে অগণন ছোট-বড় সেবাধাম, সেবাশ্রম, আতুরালয়,—'কেবল' আশ্রম—বাংলা এবং বাঙালীর সমাজে দেখা দিতেছে, তাহার মূলে নিঃসন্দেহ—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। আবার, আজ যে দেশ ও দশের সেবার নানা 'প্রোগ্রাম,' ফর্দ-তালিকা লইয়া, জাতীয় জীবন-দরবারে, অসংখ্য কাছা-খোলা, কাছা-দেওয়া, নানারঙে—লাল, গৈরিক, এলামাটিতে রং করা বাসপরিহিত (কিন্তু আন্তরিকতায় একই ডোলে ঢালা, সাজা) বাংলার সদ্যজাগ্রত নরনারী 'মঠ'-জীবন যাপনের আশায়, আগ্রহে মাতিয়া উঠিতেছে—তাহারও মূলে ইঁহারাই। সবাই যে ঠিক পথে চলিতেছে, এমন হলফ্ করিয়া বলিতে পারা যায় না। আর তাহা হইতেও পারে না। তবে তাঁদের পদানুগ হইয়া, নানা 'ঢপের' ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ। বিশেষ শুভ—মঙ্গলের,—আশার চিহ্ন। সৎকাজের ক্ষেত্র—এই বিশাল মহান্ ভারতবর্ষ জুড়িয়া—বিশালভাবেই বিস্তৃত রহিয়াছে। সদনুষ্ঠানের সংখ্যা যতই বাড়ে, ততই ভাল। Enough space in India *for all of us and many yet to come.* আগামী যুগের নবসৃজনাবলীকে আন্তরিকভাবে সকলেরই "স্বাগতং, সুস্বাগতং" জানান উচিত।

ঝঞ্ঝা উঠিয়াছে—ভারত ব্যাপিয়া, জগৎ জুড়িয়া। চোখের সামনে সব

অঘটন ঘটছে। ওলট-পালটের যুগ। পুরাতন নূতনের বিষম সংঘর্ষের যুগ। নারীশক্তি অবমাননাকারী বাঙ্গালীর প্রায়শ্চিত্তের যুগ। ভুল সংশোধনের যুগ—নারী-প্রগতির যুগ। অধ্যাত্মমেরুদণ্ড ঠিক রাখিয়া—দেবী শ্রীসারদাকে আদর্শরূপে সদা সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া, বাংলার জননীর, বাংলার ভগিনীর, বাংলার জায়ার উত্থানের যুগ। গ্যাসের তলায় আর কতকাল আঁধার থাকিবে? যাহার যাহা প্রাপ্য-সম্মান তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিবার যুগ, আমাদের প্রত্যেকের জীবনদুয়ারে আসিয়াছে। মুচি, মেথর, চণ্ডাল, পারিয়া, পঞ্চমা, মজুরদের জাগরণযুগ। নারায়ণবুদ্ধিতে দরিদ্রসেবার যুগ। জাতির জীবনাদর্শ ঘোলাটে করিয়া হট্টগোল সৃজনও চলিতেছে। অনেক জীবন উৎসৃষ্ট হইবে। কে থাকে, কে যায়, ঠিক নাই। অনিশ্চয়তা যেন হাওয়ায় উড়ছে। যদিও নিশ্চয়াত্মিকা নিষ্ঠা সম্পাদনের জন্যই যুগপ্রয়োজনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এসেছেন। তবে যারা গঠনমূলক কাজে নেমেছেন,—নানা দিকে দিকে, নানাভাবে, তাঁদের সবায়ের অন্তরে দিনে দিনে একটা মস্ত আশার রেখা, ফুটে উঠছে। নিজের নিজের 'কোটে' সবাইকেই আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন হইতে হইবে। ঈশ্বর বিশ্বাস করি না, নিঃস্বার্থ শুভকর্মে, দশের কাজে বিশ্বাস করি—তাহাতেই আস্তিক্যবান হওয়া দরকার। এইটেই পরিশেষে মস্ত আশার কথা হইবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মর্ততায় পড়ে, য়ুরোপে, তথা অন্যসর্বত্র, এখনও সব লণ্ডভণ্ড। আবার, প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও মনুষ্যজীবনের গতিবিধি, যে সব সুধীবৃন্দ একসূত্রে দেখতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁদের মুখে শুনছি, দশ বিশ বছর অন্তর অন্তর ভীষণ ভূমিকম্প, বাত্যা বা নদনদী সমূহের বানের তোড়ে, ওলট-পালটের মুখে, কতক ভূমির উদ্বর্তন, নিম্নগমন বা কতক ভূমির জলসমাধি—ইত্যাদি প্রকারের প্রাকৃতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের জীবনের উন্নতি অধোগতি গাঁথা রহিয়াছে। কেউ কেউ দেখছেন, সেইদিন এসেছে। রাজায় রাজায় ভোগের টক্কাটক্কিতে, বহু উলু খাগড়ার পরাণ বেরিয়ে গেছে, যাচ্ছে উপায় নাই। হাত-পা বাঁধা। 'সাধারণ' হয়ে যারা জন্মায়, তারা ভগবৎকৃপা বা বিশেষ মেধায় উঁচু হয়ে উঠতে পারল ত' ভাল। তা না হলে—তারা খুব 'সভ্য' দেশ হলে কেবল খেপে খেপে ভোটাভুটিতে যোগ দিয়েই ক্ষান্ত হয়। তবে পাশ্চাত্যে, সাধারণের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায়, সাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি দেশের শাসনকর্তাদের নজর দিতে হয়। লণ্ডন হইতে ইয়োকোহামা, সান্‌ফ্রানসিস্‌কো হইতে ফিলাডেলফিয়া—সর্বত্র এইটি লক্ষ্য

করিবার বিষয়। তবে সর্বত্র নেতারা জীবনমরণের কাঠি নাড়া-চাড়া করেন। আজ ভারতের চারদিকে চেয়ে দেখলে বোঝা যায়—মাতা এইবার নিজেই ইচ্ছাপূর্বক জাগছেন।—তোমরা মধ্যবিত্তেরা, তোমরা অতীত যুগের 'মমি'। তোমরা উবে যাও। আর বেরুক, নূতন ভারত। ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে······চাষার লাঙল ধরে···। ইত্যাদি।

দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষাদির সময় দেখা যাইতেছে—ভদ্রশ্রেণী খালি একটা রাংতা-মোড়া—'সইভ্য'তার জন্য লাঙল বা ঘানী, রেঁদা বা দাঁড়িপাল্লা ধরতে, বা খাটিয়া খাইতে চাহিতেছেন না। পল্লীপ্রধান ভারতের সর্বত্র তাঁদের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। বিহার ভূকম্পের একজন কর্মী সেদিন এই কথাই বলিতেছিলেন। বাঁকুড়া জিলায় একশ্রেণীর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বিশেষ আছেন। বাংলা, ৩৫ সনের অন্নাভাবে, মহাসঙ্কটে ইঁহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিয়াছি। দৈহিক পরিশ্রম বা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ-অর্জন লজ্জাকর। আবার খোলা-মেলা ভাবে অন্নভিক্ষা অচল। ন যযৌ ন তস্থৌ,-অবস্থা। আভিজাত্যের আজ কিছুই নাই। ছায়াবাজী লইয়া মানুষ আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। যুক্তির নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন বড়ই কঠিন। বলে, ইজ্জৎ বড়, প্রাণ যায়—যাক! ইঁহারা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা প্রাণরক্ষা করাটাকে বে-ইজ্জতি বলিয়া মনে করেন। একদিন ইঁহাদেরই পূর্বপুরুষেরা ক্ষেত্র-ধর্ম আচরণ করিয়া, কি সুন্দর ভাবেই না, আমাদের সমাজের প্রকৃত 'মানসরম' রক্ষা করতেন। তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। কিন্তু সব সত্ত্বেও আশার আলো দেখা যাচ্ছে। অনেক পাশকরা ছেলেকে আজ বাধ্য হয়ে অন্ততঃ শহরের আশেপাশে তেলি তাম্‌লীর কাঁটা-নিক্তি, ওজনদাঁড়ী বা চাষার লাঙল ধরতে হচ্ছে। বা ক্রমশঃ ক্রমশঃ হবে। এইভাবেই ছড়িয়ে পড়বে। আর সেটা নিশ্চিতই শুভলক্ষণ। ঋগ্বেদীয় সমাজের সুন্দর চিত্রস্বরূপ সেই সূক্তটির কথা মনে পড়িতেছে—যেখানে একই পরিবারে সুতো-কাটুনী থেকে আরম্ভ ক'রে, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ক্ষেত্রকর্ষণ, সব রকম উপজীবিকারই চল্ ছিল। আমাদের এই আধুনিক পল্লীর পঙ্গু সমাজ-জীবনে কতকগুলি দৈহিক-কর্মকে যে, মানহানিকর বলিয়া সুদৃঢ় বুদ্ধি হয়ে আছে—আজ ক্ষুধার তাড়নায় সেই বোধটা অন্ততঃ 'ক্ষয়িতে' বা নরম পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। সমাজ-সমাবেশ অদলবদল হইতে বাধ্য।

মহামহিমময়ী পুরাতনী মাতা জাগিয়াছেন। সমগ্রদৃষ্টিতে দেখিলে আমরা

প্রত্যেকেই ইহা দেখিতে পাইব। নেতা আপনি আসিয়া জুটিতেছেন। সময় এসেছে। পতিত ভারতের উন্নতির পথ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতেছে। The ancient Mother has awakened once more and is sitting on her throne rejuvenated, more glorious than ever !—Vivekananda. মা আপনি আজ দোষযুক্ত মানুষকে দোষমুক্ত করিয়া লইতেছেন। যিনি চক্ষুষ্মান্ তিনিই চোখ মেলিয়া চাহিলে ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। নেতৃত্ব যে অপ্রয়োজনীয় তাহা কোনমতেই বলিতে চাহি না।

এ যুগ ইয়োর-আমেরিকার "বোল্ বোলাওয়ের' ই যুগ। মার ইচ্ছায় তাদেরই পোয়া বারো, আঠারো, ষোলো। অনেকগুলি সদ্‌গুণ নিশ্চয়ই তাহাদের আছে। এসিয়া মহাদেশ—জগৎকে অধ্যাত্মধর্মের আলোক-বিকিরণকারী এসিয়া—বেদোক্ত সগুণ নির্গুণ ধর্ম, জিনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম, ইস্‌লাম, ইহুদীয়, কনফুসিয়, জরথুষ্ট্রীয় ইত্যাদি মন ও আত্মার উন্নতিকারী সব অধ্যাত্মস্রোতই এসিয়া হইতে প্রবহমান—উহাদের উৎপত্তি-স্থল, মানবের আশা-উন্নতির উৎপত্তিস্থল আজ মুমূর্ষু ম্রিয়মাণ। এসিয়া যেন ক্রমশঃ নিভে যাচ্ছিল। য়ুরোপের বাড়বাড়ন্তটা বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বেশই চলিতেছিল। তবে, ২য় মহাযুদ্ধ বাধিতে এই উচ্চগতির 'তাল'-টা যেন হঠাৎ কাটিয়া যায়। জগদম্বার কি ইচ্ছা কে বুঝিবে? এসিয়ার ভিতর জাপান মাথা তুল্‌ছিল, জগতের পাঁচটা বড় শক্তির (Big Five এর) ভিতর একজন হয়েছিল। কিন্তু, সহসা ভূমি কেঁপে উঠে সব ছন্নছাড়া করে দিলে। তার তেজ নিস্তেজ হবার উপক্রম হয়েছিল। তবে জাপান দমবার ছেলে নয়। রজোগুণ ও গুণীর ইহাই শুভলক্ষণ। এখন আবার চীনের কার্যকলাপে এসিয়ায় নবজটিলতা। বাধলো বুঝি এক নূতন মরসুম। মানুষ না ভুগেও শিখে না। শিখেও ভুলে যায়। আবার আঘাতের দরকার হয়। তুর্কী, আফগানিস্তানের মুখপানেও, এসিয়ার সৌভাগ্যোদয়ের আশায় আমরা জাতিহিসাবে চাহিয়া আছি।

অর্থে মার্কিন সবাইকে টেক্কা দিচ্ছেন। Fabulous land of dollars. —আরব্য উপন্যাসের ধনীর মুলুক। সে দেশের ধনকুবেরের পোষমানা পেয়ারের কুকুরের হাওয়া খাইবার জন্যই স্বতন্ত্র একখানি "রোলস রয়েস" মার্কা অতিমূল্য-যান গাড়ীর ব্যবস্থার কথা শুনেছি। কে জানে? মার্কিন দুনিয়ার মহাজন, বাজারেও খাতির খুব। তবে, হালে নাকি, ব্যক্তিগত ধনকুবেরের সংখ্যায় বিলাত, মার্কিনের উপর উঠেছে। বিলাতেই নাকি ধনকুবেরের সংখ্যা এখন অধিক।

আজ ইউরামেরিকার ছাপ ভিন্ন আমরা কাহাকেও চিনতে পারি না। জগদীশ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র সবই পশ্চিম ফেরত। এটা অস্বীকার করবার যো নাই। নেহেরু, চিত্তরঞ্জন, গান্ধী,—মায় অধুনাতন অনেকেরই প্রতীচীর ছাপ গোড়ায় ছিল,—সে ঘাট তাঁরা গোড়ায় ঘুরে এসেছিলেন। পরে আপন আপন পথে সাধনায় তাঁরা মহীয়ান্ হয়েছেন। তবে শুধু প্রতীচীর ছাপই এই সব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের, যশোমন্দিরের উচ্চ শিখরে উঠিবার একমাত্র কারণ নয়। গোড়াপত্তনে হয়ত সহায়ক হইতে পারে। ভারত হতে বেরিয়ে পশ্চিমে ঘুরে এলে, কর্মতৎপরতা পদ্ধতিনিষ্ঠা ইত্যাদি চরিত্রে পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। এক নিগূঢ় শক্তির ইচ্ছায়, ইঁহাদের অনেককে বিলাসব্যসন বর্জন করিয়া, দেশের কাজে নামিতে হইয়াছে। হইতেছে। পাশ্চাত্য হইতে ঘুরিয়া আসিতে হইলেই বিলাসী হইতে হইবে, আমরা ইহা মানি না। বিবেকানন্দ, গান্ধী, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে জীবন দিয়া ইহা অপ্রমাণ করিয়াছেন। ত্যাগী না হইয়া, দেশ-নেতা হওয়া আজিকার দিনে দুর্ঘট। এমন অন্যান্য অনেকে বেঁচে আছেন বা অল্পদিন গত হয়েছেন, যাঁদের পশ্চিমী সম্মানের গন্ধ গায়ে যথেষ্টই খোস্‌বই ছড়িয়েছে, ছড়াচ্ছে,—কিন্তু, মনুষ্যত্বের দিক দিয়া ঐ সকল মহাত্মাদের সঙ্গে এঁদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শুধু পাণ্ডিত্যের রাজ্যে বা অর্থার্জনের ক্ষেত্রে তাঁরা হয়ত খুব প্রতিষ্ঠ। কিন্তু, দেশের জনহৃদয়ে, জনমতে তাঁদের স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। এটি পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে। যেন কোন গলদ না থাকে।

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের আনুকূল্য যথেষ্টই পেয়েছিলেন। সাধের বেলুড়মঠ গড়বার জন্য মার্কিন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। এখনও মার্কিন বেলুড়ের বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়াছে। বিবেকানন্দের গুণের কদর তাঁরা করেছিলেন অকপটে। ইঙ্গিতে কোন ভারতবাসীকে সে দেশ থেকে স্বামী সাফ্ বল্‌ছেন—"যদি একটা ঘর কোরে, আমায় ডাক্‌তে পারতিস্ ত বুঝ্‌তুম্।" মুখের সমবেদনায় তিনি ভুল্‌বার 'বান্দা' ছিলেন না। অনেক সময় গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না। শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবন, উপদেশ-কথা বিশ্বপণ্ডিত মোক্ষমূলারের হাত দিয়ে বেরিয়েছিল। এইজন্যেই আমরা অনেকে তাঁকে আমল দিচ্ছি, দিয়েছি। আবার "বিবেকানন্দ-গুরু" বলেই আজ বাহিরের বিশ্ব পরমহংসকে সম্মান দিচ্ছেন। অবশ্য বিবেকানন্দ-বিহীন রামকৃষ্ণকে তাঁরা কেউই কদর করেন না, এমন কথা বলছি না। কিন্তু, মহত্ত্ব বিবেকানন্দের পক্ষে এই যে, তিনি সব জেনেশুনে দরদের চক্ষে আমাদের

নিঃসহায়, পতিত অবস্থা ভাল করেই বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন—আমাদের বিকারগ্রস্ত—'নেবা'-লাগা চোখ। তাই অবুঝ। আর তাই-ই আমাদের ত্যাগ করবার যো তাঁর ছিল না। আমাদের তোলবার, জাগাবার জন্য, বাইরে থেকে যে সাহায্য প্রথমটা দরকার বোধ করেছিলেন, তা বীরের মতো অর্জন করে এনে ছিলেন প্রতিভার বিনিময়ে, মানুষকে অধ্যাত্মসম্পদ দিয়ে। তিনি শুধু সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। বল্‌ছেন—If the room is dark, the constant feeling and complaining of the darkness, will not take it off. But *bring in the light*······*all that is mere criticism* is bound to pass away. ঘরটা যদি অন্ধকার থাকে তা হলে কেবলমাত্র সেই অন্ধকার বোধটা, আর তার সম্বন্ধে অভিযোগপর্ব অনুক্ষণ চালালে অন্ধকার কোনকালে দূর হবে না। কিন্তু যাও আলো নিয়ে এসো······ স্থির জেনো, যা কিছু কেবল সমালোচনা মাত্র (গঠনমূলক নয়) তার অস্তিত্ব লোপ পাবেই পাবে।

বাহিরের আদরযত্ন পেয়ে, চিরকালের জন্য ভারতকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা তাঁর হয় নি। তা যদি হোতো তো কে তাঁর নামে আজও জেগে উঠতো? ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এঁদের নামে এখনও ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে মানুষ—অধ্যাত্মজীবনে প্রেরণা অনুভব করছেন। তাই এঁরা সকলেই ভারতের সাধনার ধারায় এখনও জীবন্ত প্রভাবময়।

ক্রমশঃ ক্রমশঃ তড়িত-তেজের, উড়োজাহাজের গুণে পৃথিবীর সব দেশ একাকার হয়ে পড়ছে। ভৌগোলিক বাধা ক্রমে ক্রমে ভেঙে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে, ভারতের কর্মীদের বাহিরের কর্মীরা বাস্তব সমবেদনা পাঠাচ্ছেন। ভারত কি যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকবে? কবি ব্যাকুল হয়ে বলছেন, দুনিয়া দেখে এসে—"দিন আগত ঐ। ভারত তবু কৈ? সে কি রহিবে শুধু সব-জন পশ্চাতে?" সেও বাহিরকে সাহায্য করিতে বিমুখ হয় নাই। মাথা তুলিবার চেষ্টা ইহারই ভিতর তাহাকে করিতে হইবে। আজ আমাদের বিজ্ঞান, ধর্ম, কাব্য, কলা, সর্ব বিভাগে কৃতিত্ব দেখাতে হলে, পশ্চিমের দরবারে গান গেয়ে আসতে হয়। সেখানে গুণীর আসর আছে। তাদের বাহবা হাততালি, পৃষ্ঠপোষকতা হিতকর হইয়া থাকে। তাদের এ গুণ অস্বীকার করবার যো নেই। গুণীর ও গুণের আদর কদর তারা জানে। স্বামী সেইজন্যই এক জায়গায় খেদ করে বলছেন—আমাদের দেশে মহামাণিক্যকে পাঁকে, ময়লায় ফেলে রাখে।

আর ওরা সামান্য একটুকুরা বাহারী পাথর পেলে, তাহার উপর খেটেখুটে নানাপ্রকার পালিস জলুস, রঙ্‌চঙ্‌ ক'রে—পরিষ্কার মনোজ্ঞ, সুন্দরভাবে গ্লাস-কেসে সাজিয়ে রেখে, লোকের মন হরণ করে।—কথাটা অতি সত্য।

আজকের দিনে এমন একটা সময় এসেছে, যে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে না চললে, আর উপায় নাই। কিন্তু এই ভাবেরও একটা মাত্রা আছে। চোখ বুজে বাইরের দুনিয়া যা কিছু বলছে, তা তো আর সব মেনে নেওয়া চলে না। রাশিয়ায় কোন কোন নেতা বলছেন, ধর্ম জিনিষটা লোক ঠকাবার একটা মস্ত বিশ্রী ফন্দী। অলৌকিকত্বের বুজরুকীতে পরিপূর্ণ। রয়টারের 'তার'কে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রমজীবী-ইউনিয়ন-সদর-কৌন্‌সিল আইন জারি করেছেন, তাঁদের সব শাখাকেন্দ্রের সভ্যদের ভিতর কেহ যেন গির্জায় ধর্মাধিবেশন, অধ্যাত্ম-প্রার্থনাদিতে সাক্ষাৎভাবে যোগ না দেন। যোগ দিলে বরখাস্ত হতে হবে। শাস্তি—বহিষ্করণ, বিতাড়ন। ঈশ্বর-বিশ্বাস-নিবারণী সভাও নাকি গঠিত হয়েছে। Riga, Nov. 5—At the request of the Anti-God Society, the Central Council of Soviet Trades Union, has intstucted its branches throughout the Soviet to forbid its members from actually participating in any religious service under the penalty of expulsion—Reuter (reproduced from *Forward* 7. 11. 28) স্টালিনের দেহান্তের পর উদারতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে।

আমাদের একজন বন্ধু বলেন রাশিয়ায় দেখে এলাম লেনিনের মৃতদেহটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার কৌশলে, যেমন তেমনিটি সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর কাতারে কাতারে সে দেশের নরনারী, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনের মত পর্ববিশেষে তাহা দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন। লেনিনই ক্রাইস্টের আসন এখন অধিকার করিয়াছেন। আইনের ফলে অধ্যাত্মধর্মজীবনের প্রতি, নিখিল নরনারীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে স্বাভাবিক প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা দমিত হইবার নহে। ঈশ্বরতনয় যীশু—অনন্ত জীবনাদর্শের প্রতীক। সাময়িকভাবে লেনিন তাহা অধিকার করিয়াছেন। ইহা তাঁর দোষ নহে। রাশিয়ায় যাজককুল ও চার্চের উপর, লোকের একটা যুগযুগ—শতাব্দী-সঞ্চিত বিজাতীয় ঘৃণা উৎপাদিত হইবার, একটি পরিষ্কার ঐতিহাসিক কারণ রহিয়াছে। অত্যাচারী রাজন্যবর্গের

সহিত চার্চ মিতালী করিয়া, জনসাধারণের দৈন্য বৃদ্ধি করিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাই এই প্রতিশোধপ্রক্রিয়া। ইহা সাময়িক নিশ্চিতই।

লেনিনের মহনীয়া পত্নী শিক্ষাবিভাগের নেত্রী। মহামানবপূজা আজ ঈশ্বর-উপাসনার স্থান দখল করিয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—কেন এই ফর্দ অনুযায়ী কাজ করিব? উত্তর আসে—সমগ্র দেশের শ্রদ্ধার সহিত উপযুক্ত উত্তর আইসে—Because, *Lenin's wife* says so! এর ভিতর গুণের আদর অনেকটাই।

বাঙালী 'বিশ্ব'পণ্ডিত, খেতাবধারী, সেই সব দেখে শুনে এসে বুলি ঝাড়ছেন, —*Religion* is nonsense.—What is *religion*? Define it. Well, we can eke out religion out of everything. Hard *Cash*—King Money ought to be the cementing bond between man and man. এই তাঁদের মোদ্দা কথা, খোলসা করে বললে এইরূপ দাঁড়ায়—ধর্ম জিনিষটা একটা প্রকাণ্ড বোকামি। এর লক্ষণা কি বলত? সব জিনিষের ভিতর থেকেই ত একটা অনুগত ধর্ম বানানো যায়! বলবে,—ধ্রিয়তে অনেন অস্মিন্,—যার দ্বারা মানুষকে,—যে বোধ এলে, সৎনীতি, কর্তব্যবুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল না হতে দিয়ে, একটা আশ্রম, একটা পদ্ধতির ভিতর ধরে রাখে, তাকেই ধর্ম বলা যায়। আবার তাই যদি বলতে হয় ত', আমরা ব্যাপকভাবে এই কথাটার তাৎপর্য নিয়ে বলবো—বেশ বেশ, করকরে আনকোরা তন্‌কাকেই বাঁধনসূত্র করো না! এ দুনিয়াটা কার? এ দুনিয়া টা—কা—র। ভেবে দেখো। চারিদিকেই দেখো, হা টাকা, জো টাকা-রব উঠেছে।

উত্তরে, অধ্যাত্ম ধর্মে বিশ্বাসী বলবেন,—মহাশয়, ধর্ম কথাটা সত্যই অত্যন্ত ব্যাপক। ইহার ভিতর কোন সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই, যদি থিওরী বা মতবাদের দিক দিয়ে দেখা যায়। আর ভারতের জ্ঞানশাস্ত্রের দৃষ্টিতে ধর্ম—নামহীন, কর্তৃহীন, সনাতন সত্য। যাহা মানুষকে ধ'রে রাখে, বেঁধে রাখে, পশুত্বের হাত হ'তে টেনে রাখে, তাহাই ধর্ম। ইহা খুব মুখ্য ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বটে। তবে, বাস্তবের মানুষ, ঘর করতে গিয়ে দেখলে, এত বড় উচ্চ তত্ত্ব নিয়ে পথ চলা যায় না। তাই এক দিক দিয়ে, লক্ষণাকে একটু সঙ্কীর্ণ করতে হ'ল। দীর্ঘকাল টাকা নেড়ে চেড়ে দেখলে, মানুষ বিগড়ে যায়। বাদস্থলে হয়ত' বলবে, হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু, মানুষ নাচার। মানুষ ধর্ম বলতে, সভ্যতার অতি

পুরাতন ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে, সিন্ধুনদ-সভ্যতা, চীন, মিশর, ব্যাবিলন্, ক্যাল্‌ডিয়া, ইরান, গ্রীস, রোম ইত্যাদির প্রাচীন ঐতিহ্য-যুগ থেকে সুরু করে, আধুনাতন কাল পর্যন্ত বরাবরই "ধর্ম" জিনিসটাকে একটা অলৌকিক অধ্যাত্ম-তত্ত্বে, দেবতাতত্ত্বে দাঁড় করালে। জ্ঞানশাস্ত্রও ক্রমে তাহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই "গোড়ে গোড়" দিয়ে বললেন,—কোবিদ্, ঋষি, দ্রষ্টাদের দর্শন বা অনুভূতিই এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। তাঁদের বাক্য, তাঁদের উপদেশ-আদেশই শিরোধার্য। যে সব যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের শাস্ত্রে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, তার একচুলও এধার-ওধার নড়-চড় কর্‌বার উপায় নাই। 'মাছিমারা কেরানীর মত' সব মেনে নিয়ে অনুষ্ঠান ক'রে যেতে হবে। হয়ত' ভাবলে অনেকগুলি ক্রিয়া-কাণ্ডের দার্শনিক ব্যাখ্যা, যুক্তিসঙ্গত একটা সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে শাস্ত্রকে অকাট্য মানতে হবে। হয়ত জ্ঞানের পথে, মানুষ আরও এগিয়ে গেলে, সেগুলির যথাযথ তাৎপর্য ধরা পড়বে। কিন্তু ফল পেতে গেলে, যেমনটি গোঁসাইজী পাঁজি-পুঁথিতে বাতলেছেন, তেমনটি করা দরকার। তবে এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এই-ভাবে পাওয়া যায় যে, ঠিক্ ঠিক্ বিধিগতভাবে অনুষ্ঠান করলে, সংযমের সহিত শ্রদ্ধা বুদ্ধি নিয়ে কর্মরত হলে, বাঞ্ছিত ফল মানুষ পাবেই পাবে। কেন পাবে, তা বলা যায় না। তৎসত্ত্বেও যদি ফল না পায়, তবে সে ক্রিয়া-কাণ্ডগুলোকে সাতসমুদ্রের জলে ফেলে দিক। কেন ফট্ না বলে, 'ঝট্' বলব না, প্রতিমাপূজারত হয়ে, এই তর্ক তুললে বিফল হবে। 'ফট্' বলে মন্ত্র আওড়ে দেখো, ফল না পাও, জুতো মেরো। এ সব বিষয়ে তথাকথিত যুক্তিবাদীদের—সামান্য একটা অলৌকিক "সিদ্ধাই," সাপের মন্ত্রের ক্রিয়া দেখালেই—হয়ত তাঁরা অবাক হয়ে যান। কাবু হয়ে পড়েন।

খুব খুঁটিনাটিতে মন দিতে হয়, তবে ক্রিয়ার ফল পাওয়া যায়। শুদ্ধবাণী বা শুদ্ধ উচ্চারণের উপর মন্ত্রের সফলতা বিফলতা নির্ভর করে। এ বিষয়ে বেদানুগ শতপথ ব্রাহ্মণে যথেষ্ট সাবধান বাণী আছে। এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ অতি প্রাচীন। ইহাতে ঋষিরা স্পষ্টই বলেছেন,—যদি মন্ত্রোক্ত দেবতার আনুকূল্য লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে ব্রাহ্মণ ভুলভাবে মন্ত্র উচ্চারণ কখনও করিবেন না—অতএব "অতো ব্রাহ্মণো ন ম্লেচ্ছেৎ।" ম্লেচ্ছ পদটি এখানে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর একটি আখ্যায়িকার অবতারণা আছে। একবার দেবাসুর যুদ্ধের ফলে দেবতারা হেরে গেলেন। বিশেষ কাবু হলেন। দেবতাদের শক্তি ছিল, অস্ত্রশস্ত্র

ছিল। কিন্তু, বিশেষ ভরসা ছিল,—তাঁদের মন্ত্রের পুঁটুলীগুলির ভিতরে। শারীরিক বলে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে পারলেন না। অবশেষে অসুরেরা সেই মন্ত্রের বোঝাগুলিও ছিনিয়ে নিলে। সব সম্বল বুঝি যায় যায়। অসুরেরা সেইগুলি নিয়ে, প্রয়োগ করে, যাগযজ্ঞ সব আরম্ভ করলে। তাদের সখ হ'ল, শারীরিক বল ত' আমাদের আছেই; তার উপর সূক্ষ্ম মন্ত্রবলে বলীয়ান হ'লে, ত্রিভুবনে আমরা অজেয় হব। কিন্তু তাদের জিভের আড় ভাঙে নি ব'লে, কোন মন্ত্রের কোন শব্দের ঠিক উচ্চারণ হ'ল না। তাই, পরিশেষে কোনই ফল তারা পেলে না।

মন্ত্রবাদ—শব্দভাবনার পরমা বিদ্যা, মানুষকে এই বলছে—কেন ফল পাই, এ 'কেন'র উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। কেন বর্ণমালার আগে, সব প্রথমে 'ক',—'খ' নয়, বলতে পারো? এ নিয়ে হাজার মাথা ঘামালেও, অকাট্য উত্তর পাওয়া যাবে কি? কিন্তু, কেমন করে অভীষ্ট লাভ হবে, তা গুরুমুখে শুনেছি। তোমাকেও বাতলে দিতে পারি। তুমিও ক'রে দেখতে পার,—"concerned mainly with the *how*—not the *why* of things"—বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের কথা। আধুনিক জগতেরই বার্তা।))

প্রাচীন মিশর, চীন, কালদে, ব্যাবিলন, সপ্তসিন্ধুনিবাসী ভারতবাসী, ইরানী —এরা সবাই, এইরূপ কোন না কোন অলৌকিক অধ্যাত্ম তত্ত্বের শৃঙ্খলে (যথা নানা দেবদেবী পূজা দ্বারা) ইতিহাসের প্রাক্কাল হ'তে, জাতীয় পূজা, পর্ব, উৎসব, যাগযজ্ঞের মধ্য দিয়াই, মানুষে মানুষে মিলনসূত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজকের মানুষ কেহ কেহ উহা অপছন্দ মাত্র করতে পারেন। তিনি বিজ্ঞ। তিনি বলবেন, অলৌকিকতত্ত্ব ত একটা অলীক উপন্যাস। কিন্তু, এই মন্তব্যটি অতি স্থূল কথা। এই সব অত্যাবশ্যক 'উপন্যাসের' দ্বারাই মানুষের সমাজ গড়ে উঠেছে। আর, অবিশ্বাসের শিক্ষাবিষ আজকাল যে ভাবে ছড়াচ্ছে, এর পর কোন্ দিন ছেলে বাপকে অতীব গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠবে (এবং সেটা কিছু বিচিত্র নয়)—"বাবা, তুমি যে আমার বাবা, তার ত চাক্ষুষ প্রমাণ পাই নি।" সেটাও একটা মস্ত সন্দেহস্থল দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবাৎ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভারতের কর্ম-সন্ন্যাস

অধ্যাত্ম ধর্ম-পন্থা কি আধুনিক সমাজে একেবারে বর্জিত হ'তে পারবে? আজ সিন্‌ডিক্যালিজম্, কমিউনিজম্, র‍্যাডিক্যালিজম্, বোল সেভিজম্ ইত্যাকারক কোন একটা 'ইজ্‌মের' জাবর কাটলে চলবে কি? এর কোনটাই এখনও ভারে টিকে নাই। দাঁড়ায় নাই। দুনিয়াটা—সুবিধাবাদী তোমার আমার গরজ মত কোন দিন চলে নাই। চলিতে পারে না। বহুর সম্বন্ধে কোন একটা বিধি-বিধান, ব্যবস্থা করতে গেলেই, তোমাকে আমাকে, তাদের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা বজায় রাখিয়া পন্থা-নির্দেশ করিতে হইবে। আমরা গায়ের জোরে কোন মতেই বলতে পারব না, "ওহে তুমি তোমার অতীতটা একদম বেমালুম ভুলে যাও ত?" কলিকাতার বস্তি-পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, নগর-সমাবেশকারী (Town Planner) যদি একদম চরমে গিয়ে প্রস্তাব ক'রে বসেন যে, দরিদ্রদের আবাসগুলিকে নির্মমভাবে একেবারে ধূলিধূসরিত করে ফেলে, সব সেণ্ট্রাল এভিনিউ, সদর সড়ক বা 'লাল রাস্তা'—Red Road —বানাও,—তাহ'লে সেটা কতদূর সমীচীন হবে, ভুক্তভোগীমাত্রেই বিবেচনা করিবেন। যিনি নাগরিকদের অবস্থা, উদ্দেশ্যাদির উপর দরদের চোখ রাখিয়া, ওরই ভিতর ময়লা আবর্জনা ধৌতির ও উপযুক্ত জলাদি সরবরাহ নিকাশের ব্যবস্থা দিবেন—তিনিই কি অধিকতর কর্মকুশলী নহেন?

ভারতকে তার অধ্যাত্ম-ধর্ম ভুলতে বলবার মতো আর বিশ্রীরকমের ভুল, বোধ করি কল্পনাও করা যেতে পারে কিনা, সন্দেহ। ভারতের গ্রামে গ্রামে, মাঠে জঙ্গলে ভ্রমণ করলেই দেখা যাবে,—অধুনা কঙ্কালে পরিণত দেবারাম, বাঁধান ঘাট, ঠাকুর-সেবা, গাজন, মেলা, পর্ব, এই সব উপলক্ষ্য করে, জাতটা নানা ধাক্কা খেয়েও, দাঁড়িয়ে আছে আজও। তার কর্ষণা বা কালচার, সাধ্য-সাধনা, তার আচার-ব্যবহার, পদ্ধতি-প্রণালী, তার রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি সবই এইগুলির উপর গড়ে উঠেছে। চালুক্য-সভ্যতা, চোল-কীর্তি, তামিল দ্রাবিড়ীর উত্থান—বিপুল বহুবিস্তৃত দেবকীর্তি,—যথা, কোণার্ক, পুরী, ভুবনেশ্বর, কাঞ্চী, তিরুপতি, তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, মহাবল্লীপুরম রামেশ্বর, মদুরা, বিজয়নগর ইত্যাদি,—সাত আট দেউড়ী মহল্লা, অনন্ত

গোপুরমের সমন্বয়—দাক্ষিণাত্যে ভারতীয় সভ্যতায় ফুটে উঠেছে। মধ্যভারতে ইলোরা। তারপর অজন্তা। বোম্বাই অঞ্চলের হস্তীগুম্ফা। হিন্দুস্থানে কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, প্রয়াগ, জয়পুর, রাজপুতানা ; ঘরের কাছে বাংলার কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর, গৌড়, রাজসাহী, খড়দহ, ইত্যাদি যেদিকে তাকাও, সর্বত্রই ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধমন্দির, বিহার-স্তূপ—ইহার সুন্দর নিদর্শন রহিয়াছে। দেবতার বিপুল রথ চলিবার সুন্দর সুষ্ঠু সু-ব্যবস্থার ভিতর দিয়াই, দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতায়, দেশের স্থানে স্থানে স্যানিটেশন্ বা জন-স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধা-বিধান করিয়া দিয়া বড় বড় রাস্তা—আগেকার দেশী পি, ডবলু, ডি, (P. W. D.) বা জেলাবার্ড তোয়ের করে দিয়েছেন। পথ-পর্যায় শব্দগুলির ভিতর, একটি শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যে, ভারত-সভ্যতার এই গুপ্ত কথাটি নিহিত রহিয়াছে। 'রথ্যা' মানে পথ, রাস্তা,—রথসমুহ যাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। এই ইঙ্গিত কি স্পষ্ট নহে ? মহাপ্রভু জগন্নাথস্বামীর মন্দিরটিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ, দেশের শিল্পকলা, সঙ্গীত, তক্ষণ-বিদ্যা, সাহিত্য, নৃত্য, বাদিত্র, বিগ্রহ সাজাইবার পরিপাটী আদব-কায়দা, সং-পুতুল গড়া, পট-লেখা, উদ্যান-রচনা, রন্ধন-বিদ্যা—কতই না বিদ্যার উৎসাহ দিয়া, জাতির অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু ব্যক্তি আজিও এই মন্দির-সভ্যতার ভাঙা কাঠামোয় প্রতিপালিত হইতেছে। প্রতিমাপূজা স্বল্প-বুদ্ধিবিশিষ্টদের জন্য হইতে পারে। তবে দেশে তাদের সংখ্যাই অধিক। আর তাদের ব্যবস্থা করবার সময়, তাদের অবস্থা পুরাদস্তুর মনে রাখিয়াই কাজে নামিতে হয়।

সংস্কারের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু অনাচার নিবারণের নামে ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন দিতে বলার মত, আর মূর্খতা নাই। শহরে সোরগোল করলে বিশেষ কি হবে ? ভারত যে পল্লী-প্রধান। সাতলাখ গ্রাম। বাংলার গণ-চৈতন্য—কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, সবশ্রেণীই এক একজন মহাপুরুষ, গোঁসাই, বৈষ্ণব বাবাজীকে ধরিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এঁদের নামের মোহিনী শক্তিতে মানুষ দলবদ্ধ হয়েছে। নিছক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এযুগে আবার নূতন ক'রে সমাজ গঠন সম্ভব হবে কি ? অর্থের যে প্রবল সামর্থ্য সংসারে সর্বকালে প্রকট, সে বিষয় অস্বীকার কেহ করেন না। সব দেশেই কিন্তু এইরূপ সাধারণ শ্রেণীর মানব-মানবীর মধ্যে অল্প-বিস্তর সাধুপূজা চলে আসছে। ওয়েলস, আয়ারল্যাণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড-এর প্রাচীন লৌকিক কাহিনীকথায় ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও ঐ ঐ দেশের কলিকাতা-প্রবাসী সওদাগরেরা সেণ্ট এণ্ড্রুজ

ভোজে, সেণ্ট জর্জের মহোৎসবে আনন্দের মহোৎসব তুলেন। লাট-বেলাট হোমরা-চোমরা অনেকের নিমন্ত্রণ খানাপিনা হয়। সেণ্টডেভিস্, সেণ্টজর্জ, এনড্রুস ইত্যাদি সকলে এই সাধু পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুসভ্য ইংরেজেও সাধু-পূজা করেন।

সবদেশে সবকালেই মানুষের অন্তর মহতের পূজায় এইভাবে স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে, আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। দিতেছে এবং দিবেও। নিজে বিবাহ না করিয়া, সামাজিক বাধ্য-বাধকতার ভিতর না আসিয়া, যেমন অপরকে বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উপদেশ দিলে, ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা দেখানো যায়, কিন্তু তার চেয়ে শতগুণে শ্রেয় হয়, এ সম্বন্ধে তাঁরই কথা বলা, যিনি বিধবা-বিবাহ কল্যাণকর ঠিক ঠিক বিবেচনা করিয়া, নির্ভীকভাবে সমাজের সব প্রতিবাদ সত্বেও কাজে, নিজের ঘরে, একটাও চালাতে পারেন। যেমন নব্য বঙ্গের একজন মহান্ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এ সম্বন্ধে কি আছে না আছে, সে প্রশ্ন এখানে তুলছি না। এখানে নীতি, আদর্শ—কাজে পরিণত করার কথা হচ্ছে। একটা প্রথার সম্বন্ধে যুক্তি ও রুচির চাপরাশ্ পেলাম,—সেটাকে তারপর ষোল আনা কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করতে হবে। নয়ত পুঁথিগত বিদ্যেই থেকে যাবে। এ বিষয়ে সৎসাহসের দরকার। সমাজ সংস্কার-ক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন। সমাজের বাহিরে দাঁড়িয়ে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সমস্যা শেষ করে, লম্বা লম্বা কথা বলা সোজা। কায়েতেরা ক্ষত্রিয়। পতিত ক্ষত্রিয়। তাঁরা দ্বিজ। তাঁদের শিখা-সূত্র থাকা উচিত। পৈতা বেদাধিকারের প্রতীক। খুব বক্তৃতা করলুম। মায়, বাড়ীতে অপরের ঘাড়ে experiment, পরীক্ষা চালিয়ে কয়েকজনকে পৈতা দেওয়ালুম। কিন্তু নিজে নিলুম না। ইহা অতি হাস্যাস্পদ সমাজসংস্কার। তাব যারা নিতে চাচ্ছেন তাঁদের সুবিধা কোরে দিচ্ছি, আমি এখনও পেরে উঠছি না,—অবশ্য এইটাই হয়ত এর একটা ভাল দিক।

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজকে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। ধর্মের ভিতর দিয়া জাতিটিকে সংঘবদ্ধ ও কর্মপটু করিবার জন্য যথেষ্ট সৎকাজের পত্তন করিয়ে দিয়ে গেছেন। অদ্বৈত বেদান্তোক্ত মোক্ষতত্ত্বে পরিশেষে পরিলীন হইবার উপদেশ করিয়াছেন। জীবন দ্বারা, যুক্তির দ্বারা, পতিত ভারতকে ধীরে ধীরে নব শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর দিয়া, আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতার পরিস্ফুরণ করিবার নিমিত্ত—ত্যাগ ও সেবাদর্শের কল্যাণপন্থা

তিনি ছকিয়া গিয়াছেন। কর্মযোগী হইতে ইচ্ছুক যাঁহারা তাঁহাদের পথে যে সমস্ত বিপদের আশঙ্কা, তাহা হইতেও তাঁহাদিগকে সাবধান হইবার ও পরিত্রাণ পাইবার উপায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। এটা যদি 'বাজে' বলিয়া তোমার ধারণা হয়, বেশ কথা। কিন্তু যেটা অবলম্বনীয় বলিয়া বোধ হইবে, যেটা শুভকর জ্ঞান হইবে, সেটার উপর বৃথা বক্তৃতা না দিয়ে যতটুকু সম্ভব কার্যক্ষেত্রে জীবনের দ্বারা মনমুখ এক করিয়া কর্তব্যপালন করাই বীরের ধর্ম। নয়ত যাঁরা অধ্যাত্ম ধর্মপথে বা সমাজসংস্কারের পথে কাজ শুরু করিয়াছেন, তাঁহাদের কাপুরুষ—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপদ-আপদ নির্যাতনাদি সহনে অক্ষম, ইত্যাকারক গালিগালাজ দেওয়া কর্তব্য নহে। বা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি রাজনীতির ক্ষেত্র ছাড়িয়া, পরিশেষে অধ্যাত্ম-ধর্ম সাধনে মনোনিয়োগ করিয়া থাকেন ত' তাঁহাকে কপটাচারী, ছেলে খেপাইয়া দিয়া গা ঢাকা দিলেন, ইত্যাকারক অপবাদ দেওয়া কি ঠিক? জীবনটা কারুরই সরলাঙ্ক নহে। সিধে সরল রেখা ধরে কেউ যাচ্ছে না। আত্মত্যাগের সব পথেই বিপদ-আপদ আছে। ছোটবড় নাই। যদি ছোটবড় করতে হয় ত বলতে হবে, যিনি পুরাদস্তুর ভোগ ত্যাগ করতে পারছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ। আবার অনেককে অনেক রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, বহু ডিগ্‌বাজী, উঠা-নাবার ঝঞ্ঝাট সহ্য করে, তবে আদর্শে পৌছতে হয়। তাতে দোষ দিয়া নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিয়া ফল কি? এ দুনিয়ায় নাবালক কেহই নহে। জীবনযুদ্ধে যাঁরা নেমেছেন তাঁহাদের নিজ শক্তি বুঝিয়া কাজে হাত দেওয়া বিশেষ কর্তব্য। অমুকে আমাকে ভোগা দিয়ে খেলে, এই যে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলেমানুষের ভ্যান-ভ্যানানি, এটা একেবারেই ত্যাজ্য।

আরও বলা যায়। তুমিও, আমিও—তোমরাও, আমরাও নিজেদের বিবেকবুদ্ধি থাকতে কেনই বা নিজের সামর্থ্য না বুঝে, কোন নেতা-বিশেষের উত্তেজনাময় বাক্যে আপনা হারাইয়া নিজেদের কাঁচা মাথাগুলো খোয়াতে গেলাম? আমাদের দায়িত্ব এর ভেতরই বা কতটা? আবার বলি, এ ছেলের হাতে মোয়া নহে। জীবনে বস্তুতন্ত্রতার অবসর যথেষ্ট। ক্ষতের যাতনায় মানুষ জ্বালা পোড়া হচ্ছে। কণ্টকময়—সঙ্কটময় জীবনপথ। শেষে নিজের ওপর দোষ না দিয়ে, নিজের দুর্মতিকে ধিক্‌কৃত না করে, নেতৃ স্থানীয়কে বাপন্ত কল্লে কি হবে? তিনি যদি বলেন, মাথা গরম করিও না। ছোট সত্য থেকে, বড়—ক্রমে আরও বড় সত্যে ক্রমশঃ সবাই আমরা চলেছি—ভুলো না।

হে বাংলার যৌবনশক্তি। হে আগামীকালের দেশের ভরসাস্থল, "আটাশে ছেলে" হলে চলবে না। তোমার-আমার ভুলের জন্য, দোষের জন্য ব্যক্তিগত-ভাবে, জাতিগতভাবে,—সমাজ ও দেশগতভাবে, আমরা সকলে দায়ী। ও পাড়ার হরির খুড়ো, মাধাই দাস বা সাগর পারের গোরা—এঁরা কেহই দায়ী নহেন। আজ—আলো, লুণ্ঠন ঘুরাইয়া নিজের মুখে, নিজেদের দিকে—আলো ফেলিবার সময় আসিয়াছে। নেতা তো নিজেদের অপারগতার দরুণ, কাজের খানিকটা সুবিধার দরুণ, আমরাই খাড়া ক'রে থাকি। না,—অপরে করে? সুতরাং তাঁকে দোষ দিলে চলবে না। বেশ, তো। তিনি না হয়, নিঃশক্তি হয়ে গেছেন। এবার আর কাউকে টেনে তোলো। তাঁকে দিয়ে যতটা বাইরে নেবার, তা তো পূর্ণ হয়েছে। এইবার তো তোমাদের মতে—তিনি ছিব্‌ড়েতে পরিণত হয়েছেন। আর খেদ কেন? খেউড় কেন? তাহলে আমাদেরই গায়ে যে থুতু পড়বে। সময় নষ্ট হচ্ছে, আগুয়ান! স্বামীজী যেমন বলতেন,—"সিন্ধুরোলে গান!"—তা নয়,—খালি রামবাবুর ভুলে, শ্যামবাবুর কারচুপিতে আমরা মারা পড়লাম। আমরা যেন একেবারে মার পেট থেকে সদ্য-পড়া ছেলে। ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানি না—যেমন ঝগড়ার মুখে, বাংলার মেয়েরা বলেন। একেবারে গো-বেচারা,—গোবর-গণেশ। মাসের (mass) জনগণের শিক্ষার জন্য, তাহাদের জাগাইবার জন্য কে কতটুকু লাগিয়া পড়িয়া আছে? তাদের সঙ্গে অনবরত থাকতে হবে। বাহিরে থেকে খবরের কাগজে নাম উঠবে বোলে—কিছু-মিছুর কর্ম নয়। পুরাদস্তুর দলে দলে জীবন উৎসর্গ করতে হবে।

একতরফা কেহই সহ্য করবেন না। অধ্যাত্ম সাধন-পথের পথিকও বলবেন, হাঁ, তোমরা সইছো বটে দলন ও দুঃখ। সেজন্য তোমরা নমস্য। আমাদেরও পীড়ন অত্যাচার কম সইতে হয় না। আবার ত্যাগ-মন্ত্রে শ্রীগুরু-সকাশে প্রতিশ্রুত আছি ব'লে, অন্তর রিপুর লড়াইটাও জীবনভোর—"প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ" লড়তে হয়। বড় কেউ নয়। তবে পরস্পরের দৃষ্টি মিলাইলে, অভিজ্ঞতার হিসাব-বহি তুলনায় আলোচনা করিলে, সমবেদনা এসে যাবে। বাদ বিবাদ ঘুচবে। কাউন্‌সীল বা পার্লামেণ্টে মেম্বার হয়ে বসতে গেলে, কিম্বা জজীয়তী করতে হলে, যেমন প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার ক'রে—কার্য আরম্ভ করতে হয়, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষার বেলাও ঠিক সেই রকম গুরু-ঈশ্বর-অগ্নি-সঙ্ঘ সাক্ষ্য করে কঠোর নৈতিক প্রতিশ্রুতি পত্রে অলেখার লেখায় দস্তখত

করতে হয়। আর আমাদের এ পথে ভিন্ন ভিন্ন লোকলোচনের অন্তরালে আত্মবলিদান—বিস্মৃতি। বিশ্বের সাধককুলের কঠোর আন্তর-দ্বন্দ্বের ইতিহাস-কথা কোন ছাপা কাগজে প্রায়ই থাকে না। সাধু অগাষ্টিনের "ভুলস্বীকার" গ্রন্থের ন্যায় আন্তর-ইতিহাস বিরল। রাজনীতির ক্ষেত্রে নরম গরম হৈ-চৈ সদাই লাগিয়া আছে। কয়েকজন—কটা লোক রামকৃষ্ণের পাঞ্চভৌতিক দেহ কাশীপুর শ্মশানে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল? বা তাঁহার কথা জীবিতাবস্থায় শুনিতে গিয়াছিল? বাড়ীর কেউ মারা গেলে যেমন সেই শোকটা বাড়ীর ভিতরেই বা নির্দিষ্ট সংখ্যক কুটুম্বকুলের ভিতর আবদ্ধ থাকে—নিকটবর্তীরাই যেমন শ্মশান-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের নহে, এইভাবেই ঠিক, শ্রীশ্রীমাতা সারদা দেবীর, স্বামী বিবেকানন্দের এবং স্বামিপাদ ব্রহ্মানন্দের—শরীরগুলি তেমনি একে একে দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গাতীরবর্তী পুণ্য মৃত্তিকার উপরে—দেব বৈশ্বানর উপহার লইয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য শোক-'শোভাযাত্রা' হয় নাই। একান্ত অনুগত জীবন-সমর্পণকারীদিগের কুণ্ডলিনীশক্তির ন্যায়, প্রগাঢ় জমাট পুঞ্জীভূত ভক্তহৃদয়ের—অকপট ভক্তি, অবশ্য ইঁহারা সকলেই পাইয়াছিলেন। খবরের কাগজে শোক-প্রকাশ ছাড়িয়া দিলাম।

জুডিয়ার পল্লীপ্রান্তেই যুগাবতার শ্রীশ্রীঈশা জীবদ্দশায় অধ্যাত্মধর্মের সঞ্জীবনী-মন্ত্র ছড়াইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবদ্দশারই (বা স্থূল দেহ লইয়া) কথা হইতেছে। আবার ছাখো। মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রাণপরিত্যক্ত স্থূলদেহের শেষ শ্মশানযাত্রা—তাঁর প্রতি জাতির,—ত্রিবর্গতুষ্ট সাধারণ নরনারীর অপূর্ব প্রেমশ্রদ্ধার পরিচয়। অবশ্য, পরমহংস প্রভৃতি ইঁহারা লোকসম্মান কোনদিন চান নাই; কেশববাবু প্রথম পরমহংসের কথা তাঁহার সাময়িক পত্রে, পরমহংসের অনুমতি না লইয়া, প্রকাশ করেন। দক্ষিণেশ্বরের বালক-ভগবান এই জন্য কেশবচন্দ্রকে তীব্র তিরস্কার করেন। পরমহংসদেব সর্বসমক্ষে হৈ চৈ ঘৃণা করিতেন। তিনি খবরের কাগজ ছুঁতে পারতেন না। এ বিষয়ে এঁদের সহিত অপরের তুলনাই অবিধি।) কিন্তু তুলনামূলক কথা উঠেছে ব'লেই এ প্রসঙ্গ পাড়া গেল। অধ্যাত্মপথের অতীব ছোট পথিকেরও সম্মান-খাতিরের চাতকপাখি হয়ে ব'সে থাকা চলে না বা অন্ততঃ উচিত নয়। এটা এ যুগে পরমহংসদেবের চরিত্রে বেশ দেখানো আছে। যাঁর চলনে বলনে, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে সংযমবার্তা পরিস্ফুরিত হইত, তিনি যে লোকমান্য শূকরী-বিষ্ঠাসম দূরছাই করবেন, প্রতিষ্ঠার জন্য লাফাইবেন না, তাহা বিচিত্র কি?

তবে ইহাও বলিতে কোন মতে চাহি না, যে রাজনীতিক্ষেত্রে সবাই-ই শুধু সম্মানপ্রয়াসী। বিপুল লোকসম্মানের হাত এড়াইয়া গান্ধী মহাত্মা রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন। তবে সচরাচর ক্ষেত্রে যা ঘটে তা তুলনার মুখে বলতে হয়। আজকাল ধর্মরাজ্যের অনেক তথাকথিত মাতব্বরদেরও এই নামযশ সম্মানের মোহে ডুবতে দেখা যায়। তবে সেটা নিশ্চয়ই আদর্শ হইতে পতন—সেটা মোটেই অভিপ্রেত নহে। নিজেকে যিনি মুছে ফেলতে পারেন—স্বামীজী যাকে A voice without a form—একটা বিদেহবাণী—বলছেন তাঁর সচরাচর মালা, তিলক, গেরুয়া, না থাকলেও, তিনি ধার্মিক। তিনি পরম ভাগবত। খালি 'হাম্ হাম্' করলে অন্য রকম কিছু আঁচ করতে হবে।

আবার—প্রকৃত ধার্মিক যিনি—তিনি মুখরোচক কথা ব'লে, লোকপ্রিয়তা সংগ্রহ করবার চেষ্টা, কখনই করবেন না। ভোগকে—প্রবৃত্তিকে, বড় করে দেখাবেন না। ত্যাগের নাম শুনলে অনেকেই ভেগে যায় ইত্যাদি।

—এই প্রকার পাল্টাপাল্টি জবাব অনন্তকাল চলতে পারে।

আমরা সবার উপর বলি, বন্ধু, তগরারে কাজ নাই। জাতি সংগঠনের কাজ সকলকে ভাগাভাগি করে করতে হবে। যেদিকে যার যেমন অভিরুচি। যেমন ক্ষমতা—যেমন জগদম্বার ইঙ্গিত।

*　　　*　　　*

(কে আছো বেরোও! জীবন ভোর ঘুমুলে চলবে না। সময় উড়ে চলে যাচ্ছে। অনেক আশীর্বাণী পাবে। কিন্তু মনে রেখো তার চেয়ে বেশী পাবে—অভিশাপ। কিন্তু "ঐসাহি সব্‌কাল বন্‌তা সাব্!"—Come out man! no sleeping all life. Time is flying, you will have many blessings on you. But many more *curses*. That is always the way of the world, Sir. This is the time.—Vivekananda.)

সব কাজেই সুচারু নির্বাহের জন্য যখন বিশেষজ্ঞের আবশ্যক হয়, তখন অধ্যাত্ম-জগতেও যে হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? আচার্যকুল-শিরোমণি শ্রীশ্রীশঙ্কর (যিনি সাক্ষাৎ শঙ্করস্বরূপ)—ধর্মাচার্যের যে লক্ষণ দিয়েছেন, আচার্য শ্রীবিবেকানন্দে তাহার উপযুক্ততা, সার্থকতা, যথাযথ খাটে। "শুচি জিতেন্দ্রিয়ো বেদবেদাঙ্গাদিবিশারদঃ। যোগজ্ঞঃ সর্ব শাস্ত্রাণাং"—
—শুচি, জিতেন্দ্রিয়, বেদ বেদাঙ্গাদি পারগ, সকল শাস্ত্রের প্রয়োগকুশল।

শ্রীশঙ্করের সময়ে যদি ধর্মগ্লানি, বেদোচ্ছেদভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তো এখন তার অপেক্ষা কম গ্লানি আসে নাই। জাতিকে সংযম সাহায্যে স্বভাবজ কর্মে আবার আহ্বান করিবার জন্যই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আগমন। বিবেকানন্দ,—জাগরণশীল—আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ হিন্দুধর্মের কথা বলিয়াছেন। —জাগ্রত হিন্দুত্ব। যে অদম্য উৎসাহ, দৈবাদেশ লইয়া আচার্যপ্রবর, সমগ্র ভারতবর্ষের তরুণশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, সুর-সম্রাট শ্রীশঙ্কর সেই পূর্বতন মধ্যযুগে শতবাধা অস্বীকার করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, বিবেকানন্দ ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি। তাহারই প্রতিধ্বনি। শঙ্করের কথা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কন্যাকুমারী থেকে, সুদূর বেলুচিস্থান পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে—অতো বড়ো জ্ঞানী মহারাজ—যখন যেমন তখন তেমন—সাধারণ ও অসাধারণের গ্রহণ ও সামর্থ্য বিচারপূর্বক, অধিকারিভেদে পঞ্চ দেবতার পূজোপাসনা স্থানে স্থানে বাঁধিয়া দিয়া, বা যুক্তিপ্রমাণ তর্ক পরিপূর্ণ বিচারাদি সহায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাভব অন্তে বেদপ্রতিষ্ঠা সংসাধন করিয়া, মহতো মহীয়ান হইলেন। যে যে স্থানে, যে যে প্রকারের ধর্ম-সংস্কার, ভাব-পরিশুদ্ধি প্রয়োজন—দশনামী সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রবর্তক শ্রীআচার্যদেব তাহাই সংঘটিত করিলেন। অল্পবয়সে ওরূপ মেধা। মনস্বী, অধ্যাত্ম অনুভূতিতে বলীয়ান্ মহান্ আত্মা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মানব-ইতিহাসের প্রাক্কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যে সকল তীক্ষ্ণধী মানব-দেবতা পৃথ্বীতলে পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, ভারতের দ্রাবিড়ী সভ্যতার ইমারত-মন্দির অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠসম্পদ—কেরলপ্রদেশের কলোড়ি গ্রামের এই মহামানব। আচার্য শঙ্করের নাম—অজেয়—তাঁহার প্রতিভার উচ্চচূড়া অসীমগগনস্পর্শী। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বের পণ্ডিতমহল, সাধককুল এখনও শঙ্করের প্রতিভা হৃদয়ে সম্যক্ ধারণ করিতে পারেন নাই—তাঁহার প্রাপ্যসম্মান তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। ষোল আঠারো বছরে আমরা কেহ প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য প্রণয়ন করিতে পারি না বলিয়া, শঙ্করও না পারুন—এরূপ যুক্তি হাস্যাস্পদ। দৈববলে বলীয়ান শঙ্কর কিন্তু ইহা সংসাধিত করিয়া সমগ্র ভারত ও ভারতবাসীকে একদিন চমকিত করিয়াছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য অনায়াসে তিনি সকলের জন্য নির্ধারিত করিলেন। শঙ্করের সূর্যসম প্রতিভার নিকট অনেক আচার্যকে খদ্যোৎ হইয়া যাইতে হয়।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন—লোকশিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য—"বিদ্যার আমি"* রেখেছিলেন।

* * *

বহুর কল্যাণের জন্য বলতে-হবে কর্ম ছাড়া গতি নাই। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য যাঁহাদের অপেক্ষাকৃত কম, যাঁহারা মধ্যম অধিকারী, ভক্তিমার্গ তাঁহাদেরই। ভক্তিশাস্ত্র নিজে একথা বলিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্যের বা নিষ্কাম কর্মের আদর্শ ভুল বুঝিবার বা বিকৃতভাবে আচরণ করিবার আশঙ্কা সর্বাপেক্ষা অধিক। কোন না কোন কর্ম না ক'রে, কারুর রেহাই নাই। কর্ম সকলের জন্য। তবে ইহার মোড় ফিরান, আদর্শ বা গতিবাদের উপর নজর রাখা দরকার। জ্ঞানী হওয়া, জ্ঞানমার্গ বাছিয়া লইয়া, কার্য করা বড় কঠিন। জ্ঞানীরা বলেন —অর্থবাদের দ্বারা ভগবান, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারস্বরূপে ভক্তির মহিমা, গুণগান গীতায় কীর্তন করিয়াছেন। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ…জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ১১।৫৪।। মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ স মতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ১৪।২৬।। ভক্ত্যা মামভিজানাতি —ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা।" ১৮।৫৫ ।। ইত্যাদি।

দেশ যখন চাহিছে, তখন সন্ন্যাসীকেও কর্মে নেতৃত্ব করতে হবে। বহুজনহিতায়। তবে ভারতবর্ষে, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা শান্ত বাহ্যকর্মাস্ফালন-চেষ্টাবিহীন জীবনের দ্বারাও যে সমাজ ও জাতির যথেষ্ট কল্যাণ সংসাধিত হয়, এ ধীর স্থির বিশ্বাস—পাকা বোধ, মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই শ্রেণীর সাধককুলকে বুদ্ধ যীশু প্রভৃতিরও উপরে—অতি উচ্চে স্থান দিয়েছেন! ইঁহারা ইচ্ছামাত্র জীবহিত করেন। হিমগিরির কন্দরলীন মহাপুরুষবর্গ বা গাজীপুরের পওহারী বাবার ন্যায়, মহান্ আত্মারা সূক্ষ্মভাবে ভারতের যুগ যুগ হিতসাধন করিয়া আসিয়াছেন। আসিতেছেন। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইঁহারা নাইট স্কুল কেহ করেন নাই বা চরখা কাটেন নাই বটে। অথচ—সমাজ ইঁহাদের জন্য আজিও 'সন্ত'দের—'ভগবন্', 'নারায়ণ' —আখ্যা দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন। কর্ম ও কর্তার যে ত্রিপুটী উপদেশ ভগবান্ বাসুদেব দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধানান্তে,—সেই কষ্টিপাথর চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নামে উৎসৃষ্ট দিব্য কর্মীকুলকে আগুয়ান হইতে হইবে। "পতিপত্নীর" অলঙ্কারের মধ্য দিয়া, পরমহংসদেব স্পষ্টই নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, বিবেকানন্দ ভিন্ন রামকৃষ্ণ—অসম্পূর্ণ, যুগ প্রয়োজনে

বিবেকানন্দের তীব্র কর্মপ্রচেষ্টা চাই। সঙ্গে সঙ্গে পরমহংসদেবের পরসমাধিও আবশ্যক। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ শান্তি ও চেতনার জননী ও জনক। আবার শান্তি ও কর্মেরই যুগল নায়িকা ও নায়ক। তাঁহারাই শ্রীগীতার জীবন্ত ছবি—জলন্ত ভাষ্য বা প্রতিমূর্তি। ইহাদের ভিতরই গীতোক্ত সন্ন্যাসযোগ। আবার এই-খানেই গীতার কর্ম, ভক্তি, রাজগুহ্য সব যোগের, সব সাধনতত্ত্বের, সব অনুভূতির নিগূঢ় রহস্য। জ্ঞানভক্তি-বিহীন—কর্ম হইবে না। এই সবের সহিত কর্ম মাখানো থাকিবে। আবার শুধু জ্ঞান বা ভক্তি নহে। কামকাঞ্চন ত্যাগের ভিত্তিতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া সব রকম একঘেঁয়েমি, খামখেয়াল বিসর্জন দিতে হইবে। জ্ঞান বা ভক্তি যে সত্য সত্য ভিতরে গজাইতেছে, তাহা ছোটবড় প্রতি কর্মে, শ্বাসে প্রশ্বাসে, চিন্তায়, চলনে বলনে—প্রকাশ পাইবে, ইহাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন্ত ধর্ম।

উচ্চ উচ্চ ভাব সব দেশে সব কালেই আছে। সেইগুলিকে যিনি কার্যে, জীবনে পরিণত করেন, তাঁর সাধনাই "মৌলিক" বলিতে হইবে। তিনিই সেই সত্যের এক হিসাবে "আবিষ্কারক" বলিতে হইবে। নতুবা সত্য স্বয়ম্ প্রকাশ। তার আবিষ্কারক কেহই নাই। রামকৃষ্ণের পূর্বেও কামকাঞ্চন ত্যাগের ভাব ছিল, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শও ছিল। কিন্তু তথাপি, রামকৃষ্ণের পয়লা নম্বরের মৌলকত্ব কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ অতি নিখুঁত-ভাবে ঐ ঐ আদর্শ নিজজীবনে ষোলআনা ফলাইয়া, রামকৃষ্ণ স্বয়ং, তন্নামাঙ্কিত রামকৃষ্ণের সত্যকার চেলারা, ভারতের ও পৃথ্বীর মানুষের দৈনিন্দন জীবনে সেই আদর্শ কিছু কিছু কার্যকরী করিয়াছেন—করিতেছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আশ্রমধর্মের স্বরূপ এবং "জাতির" নামে বজ্জাতি

সব জায়গায় শঙ্কর জ্ঞানের চড়া ও কড়া উপদেশ দেন নাই। চাতুর্বর্ণোক্ত আশ্রমধর্ম পুনঃ স্থাপিত হইল। বীর বিবেকানন্দও এই ধারা বর্জন করেন নাই। গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্বণ্য ও আশ্রমধর্ম রক্ষার জন্য বহুবার, নানাভাবে উপদেশ করিয়াছেন। ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ-বিস্মৃত ধনঞ্জয়কে বিশেষ করিয়া তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সনাতন হিন্দুর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এই "পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং"—হরিকথা। ভারতের ও সঙ্গে সঙ্গে কলির সর্ব-

দেশের মল প্রধ্বংস করিবার, শ্রেয়ের পথ দেখাইবার পরমোপযোগী। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বিনষ্ট হইলে আমাদের বৈশিষ্ট্য থাকিবে না। ভারতের কৃষ্টিতে মানব-মাত্রকেই এই চারসূত্রের একসূত্রে ফেলিবার প্রবণতা দেখা যায়। তবে এখানেও আবার খোসা ফেলিয়া, আসলে গুণগত ব্যবস্থার প্রতি যতটুকু লক্ষ্য রাখা যায়, ততটাই মঙ্গল। শঙ্করাচার্য এই বর্ণাশ্রমের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, বিশ্বাস করিতেন। ইহাকে সংরক্ষণ করিবার জন্য সন্ন্যাসীদিগকে শৈথিল্য-মান্দ্য পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ কর্মদক্ষতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, ইহা না হইলে মহতী বিনষ্টি, চরম অহিত আসিবে—"যতোবিনষ্টি-র্মহতী ধর্মস্যাত্র প্রজায়তে। মান্দ্যং সংত্যাজ্যামেবাত্র দাক্ষ্যমেব সমাশ্রয়েৎ।" "আর্যমর্যাদা" সর্বোপরি ধারণ করিয়া রাখিতে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। (শঙ্করের 'মঠাম্নায়' দ্রষ্টব্য) তবে এই সঙ্গে জানা উচিত যে "আর্যামি" জিনিষটা একপ্রকারের গোঁড়ামি বা বড় রকমের বোকামিরই ন্যায় সর্বাংশে নিন্দনীয়। একথা যেন বলিয়া দিতে না হয়।

মথুরবাবু, শম্ভু মল্লিক প্রমুখ প্রথম যে কয়জন ব্যক্তি পরমহংসদেবের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়াছিলেন, লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাঁরা সমাজের তথাকথিত উচ্চ বর্ণের নহেন। মায় বলরাম বাবুও ব্রাহ্মণ নহেন। রঘুনন্দনশাসিত বঙ্গে বলরাম —শূদ্র। মানুষমাত্রকেই যারা পূজা করার আদর্শ গ্রহণ করেন, তাঁদের কথাটা উচ্চারণ করিতে জিহ্বা জড়াইয়া আসিবে। ঈশ্বর-ইচ্ছায় এই প্রকার সহায়-কারীরা আসিয়া পড়েন, যারা অকপটে খাটি লোকের আনুকূল্য বিধান করিয়া অপূর্ব আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। মথুরবাবু যেভাবে পরমহংসদেবের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ও সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রচনায় খরচ-খরচা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া, গল্প পড়িতেছি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁর দেহটা তথাকথিত নীচবর্ণোদ্ভব হইলে, কি হইবে? তাঁর মনের মত উচ্চ-মন সংসারে বিরল। গুণের দিক দিয়া, তিনিই ব্রাহ্মণ। কৈবর্ত নহেন। তবে ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ আমাদের পূজ্য। ব্রাহ্মণবংশাবতংস—পরমহংস।

শঙ্করের গ্রন্থমালায় পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের গুণগান। আর অলৌকিক তত্ত্ব-বিচারে গুরু বেদবাক্যকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে বলিয়াছেন। এই কল্পে তিনি আপ্রাণ সচেষ্ট ছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা যে আজও অটুটভাবে দুনিয়ার উপর বেঁচে দাঁড়িয়ে আছে, তা তাঁর এই ব্যবস্থারই মাহাত্ম্য গুণে। বহুর কল্যাণের জন্যই এই প্রকার আশ্রম ধর্ম-বিভাগ,—শ্রেণী, জাতি, গণ-সমাবেশ ও

স্বধর্মপালনে বার বার আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি উপদেশ দিয়াছেন। আরও বলেছেন, পরধর্ম ভয়াবহ। পরাণুকরণ পরানুবাদ নিন্দনীয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ঈশার মতই came to fulfil and not to destroy, পূর্ণতা সম্পাদন করতে এসেছেন! ভাঙতে আসেন নি। ষষ্ঠি মাকালের পূজা থেকে আরম্ভ করে নির্গুণ-নিরাকারে নিষ্ঠা—মনমুখ এক করে—পড়ে থাকা চাই। যেমন সংস্কার অভিরুচি, যেমন ক্ষমতা। সংসারেও পূর্ণ জ্ঞান হ'তে পারে। পরমহংস মহাশয়ের লীলায় দুর্লভ দুর্গাচরণ নাগ তাহার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। পরমহংসদেব সতী স্ত্রীর কথা বলেছেন। পতিব্রতা প্রাণমনে, স্বামিদেবতার সেবা করতেন। মাথার চুল দিয়ে পাদপদ্ম মুছিয়ে দিতেন। এক রাগী গৈরিকধারী-সাধু তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত, পতিব্রতা তখন স্বামিসেবারতা। সন্ন্যাসী পথে আসবার মুখে রেগে গিয়ে, একটা কাককে আর বককে ভস্ম করেছিল। গৃহস্থালির কাজের দরুন, সাধুর দিকে মন দিতে তাঁর একটু দেরী হ'ল। ভেতর থেকে বেশ জোর গলায় পতিব্রতা ডেকে হেঁকে বললেন "আরে দাঁড়াও ঠাকুর। এখন একটু বস। আমি এখন আমার স্বামীর সেবা করছি। সেটা সেরে তবে তোমার ব্যবস্থা। আমি কাকী বকী নই যে, চাউনিতেই ছাই করে দেবে।"—আশ্রমধর্ম-পালন, স্বধর্ম-নিষ্ঠার সুন্দর ছবি

ভারতের মহাকবি মহামনীষী কালিদাস স্বীয় জগৎপ্রসিদ্ধ নাটকে দুষ্যন্ত চরিত্রের প্রেমকাহিনী আঁকিবার ভিতরেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন নাই। দেখিয়েছেন ঠিক ঠিক আশ্রমধর্ম-পালন করলে, স্বধর্মনিষ্ঠ হলে, তার জীবনের গভীরতম সংস্কার, প্রবৃত্তি পর্যন্ত হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়ে। তার ডাকে বিপথে যেতে দেয় না। সে তখন বুক ঠুকে, ঐ পতিব্রতার মত জোরালো কথা—বলতে সাহস করে। কারণ, সে জানে সে তার নিজের কোঠায়, নিজের কর্তব্যপালনে ফাঁকি বা গোঁজামিল কোন দিন দেয় নাই। নিজের জীবনের জমিটুকু ঠিক মতই সে চষে রেখেছে। তাই ফসলও তার প্রভূত এবং পাকা। মুনিকন্যার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করিয়া ক্ষাত্রধর্মনিষ্ঠ ধার্মিক মহারাজা দুষ্মন্ত মহাকবির কাব্যে আপন-মনে বলিয়া উঠিয়াছেন,—এ ত কখনও হ'তো না। তা হ'লে একে পাবার জন্য আমার প্রাণ প্রবৃত্তি এমন চঞ্চল কখনও ব্রাহ্মণ কন্যা হ'তো না। এর পরিচয় কুলশীল কিছু জানি না। কিন্তু, নিশ্চিতই এ আমার প্রাপ্য। বাপের বেটার মত কথা। নাট্যে অতি সহজভাবে কি চমৎকার,

আপনাআপনিই ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মাধুর্য ফুটিয়াছে। ইহাই কি গুণগত ক্ষাত্রধর্মের সুষ্ঠু নিদর্শন?

আবার আমাদের সুদীর্ঘ ভাবধারা ও চিন্তাসাধনার ইতিহাসে, ঋষি সত্যকাম, ব্যাসদেব, বশিষ্ঠ, পরবর্তী যুগের কবীর, দাদু, রুহিদাস, অস্পৃশ্যতার আগার দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত-মূর্তি পঞ্চমাজাত সাধুভক্তবৃন্দ ইত্যাদি— ইঁহারা সবাই, গুণে সকলকে ছাপাইয়া গিয়া, সত্যকার ব্রাহ্মণত্বের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়। জন্ম নিয়ে এঁরা ছিনিমিনি খেলেছেন। বুক ফুলিয়ে বলেছেন, পিতৃ-পরিচয় জানি না। তাই ভারতের যুগ যুগ প্রথিত ঔদার্যের ও গুণের কদর রক্ষা করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, গুরুমুখে সত্যকামকে বলিতেছেন,—"অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত। তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

জাতিত্ব ঠিক ঠিক হইলে, সাঁচ্চা হইলে, ব্যক্তির মুখের উপর, সেই সেই জাতির লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে ভাসিতে বাধ্য। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব— এই চারি সূত্র সাহায্যে সমগ্র মানবকুলকে বিভক্ত করিয়া, ভারতের ঋষিবৃন্দ মানবের বাস্তব চরিত্রের অতি মনোজ্ঞ, অকাট্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। এই চারিটিকে চারিটি সনাতন সত্যশ্রেণীরূপে ধরা যাইতে পারে—Four eternal categories or types ভারতের সূক্ষ্মধী ঋষিগণ স-র-গ-ম-প-ধ-ন, সপ্ত স্বরতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়াও, স্বরের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদির কথা তুলিয়াছেন। উদ্ভিদবিদ্যাতেও এই চতুঃসূত্রের অবতারণা আছে। বর্ণমালায় আছে। এইরূপ সর্বত্র। ইত্যাদি।

এই তত্ত্ব বিশেষ করিয়া এই ভারতের মাটিতে ফুটিয়াছিল বলিয়া, আমাদের গৌরবের নিদান। বিবেকানন্দ—মোক্ষমূলার বা ডয়সনের জীবন-সাধন স্বচক্ষে দেখে, ইঁহাদিগকে ঋষি, ব্রাহ্মণ আখ্যা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। গুণের প্রতি অন্ধ, তিনি জীবনে ছিলেন না। তবে একথা অতি সত্য যে, বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে জাতি জিনিষটা জন্মগত প্রথায় সব দেশেই প্রায় দাঁড়িয়ে যায়। এখানে বক্তব্য—মূলতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের সামাজিকদের মনের বাহিরে না যায়। জাতের হাত থেকে রেহাই কারুর নেই। শেষে "জাত-ভাঙ্গারা" এক আলাদা জাতে গিয়ে দাঁড়ায়। আবার মজা, "জাতভাঙ্গাদেরও" ভিতর, বামুন জাতভাঙ্গায়—বামুন জাতভাঙ্গায় বিবাহাদি চলতে দেখা যায়।— "কায়েত জাতভাঙ্গাদের" সঙ্গে চলে না।

সকল দেশের সকল মানুষকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দ্বিজত্বে

লইয়া যাইবার জন্য এসেছিলেন। সাবিত্রীপূর্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বেদাধিকার পূর্বে ছিল। সে মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-হারীতের ভারত আর নাই। থাকিতে পারে না। আধুনিক যুগ—জটিল যুগ। তবে এখনও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির ভিতর সূত্র-গায়ত্রী রক্ষিত আছে। বৈদিককাল হইতে আজ পর্যন্ত গুণ দেখিয়া উচ্চ সাধন-অধিকার, জীবন্ত আচার্যেরা দিয়া গিয়াছেন। ব্রাত্যকে পদসমাসীনও করিয়া গিয়াছেন। তবে, কেবল শূন্য ফাঁকা গতানুগতিক লোকাচারকে, যে সব 'মমি'-মূর্তি তথাকথিত আচার্যেরা অধ্যাত্ম, ধর্ম ইত্যাদি বড় বড় আখ্যা দিয়া, সনাতনত্বের ধ্বজাধারীরূপে উহারই জয়গাথা গাহিতেছেন মনে করেন, বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁদের যম। দাক্ষিণাত্যে সূত্রমাত্র-গৌরবসম্বল গুণহীন কয়েকজন ব্রাহ্মণাখ্য ব্যক্তি, তাঁকে আর কিছুতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া, শেষে বলেন,—"তুমি ত শূদ্রকুলে জন্মেছ। তোমার সন্ন্যাসে অধিকার নাই।" তিনিও দমবার ছেলে ছিলেন না। তদুত্তরে তাদের ধমক দিয়ে বলেন,—"এ শরীর কেন শূদ্রকুলে জন্মাতে যাবে? আমরা ছিলাম ক্ষত্রিয়। মহারাজ চিত্রগুপ্তের বংশধর। তবে লোকে এটা ভুলেছিলো। আবার পুনঃ সংস্থাপন, পুনঃপ্রচার, পুনরাবর্তন, পুনর্ঘোষণা করবার উপদেশ দিয়েছি। দিচ্ছি।" তিনি সুবর্ণবণিক ও কায়স্থের ছেলেদের সূত্রপূত করেন।

সহরে কেহ কেহ অর্থাদি বলের দরুণ জাতি মানেন না। পল্লীতে ফিরিলে, আসল ভারতে উপস্থিত হইলে, উল্টা চিত্র দেখা যায়। কোথা আলো! কোথা আন্দোলন! যেমন অচলায়তন, তেমনি প্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। জাতি জিনিষটা আসলে কিন্তু বাজে নয়। তবে আমরা বাজে বানাইয়াছি। একজন ইংরাজের নকল-নবীশ, পরমহংসদেবকে বললেন,—"মশাই, জাতটাত এসব কি সত্য? কবে যাবে?" তিনি রসিক। হাসিয়া বলিলেন, "টেনে ছিঁড়ো না! যখন খসে যাবার হবে তখন, আপনিই যাবে।"

মহাসাগর কখনও বেলাভূমি অতিক্রম করেন না বলিয়া, লোক-প্রসিদ্ধি আছে। আমাদের সমাজ সাগরের চতুরাশ্রমরূপ বেলাভূমি, 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কখনও সাধারণকে, অতিক্রম বা অস্বীকার করবার উপদেশ দেন নাই। তাঁহারা নিজে সন্ন্যাসী হিসাবে অবশ্য জাতির অতীত ছিলেন। জাতের নামে যে সব বেয়াদবী বজ্জাতিতে বজ্জাতিতে বিরাট ভারতের বিশাল জাতি জরিয়া রহিয়াছে, বিপুলা পৃথিবীতে মাথা হেঁট করিয়া সবজন পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, —রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেই সব—সেই সবগুলির মূলোচ্ছেদ চাহিয়াছেন।

সমাজ শরীরের পচা ঘা বাদ দিয়া, প্রয়োজনীয় ভাঙন-গড়নের অঙ্গী-ভূত নূতন গঠনের আদেশ এবং আদর্শ দেশকে দিয়াছেন। আবার নীচকুলে জাতদিগের, ধনী কামারণীর ন্যায় মনের উচ্চতা দেখিলে অকপটে বিনা দ্বিধায় উচ্চবর্ণের, সত্যকার আভিজাত্যের সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অকুতোভয়ে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় ভাবনাধারার বৈশিষ্ট্য

সবমতের পরিণতি মোক্ষতত্ত্বে

আলোচনার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি ব'লে উঠলেন,—"সব শুনলুম। সব বুঝলুম। কিন্তু ভায়া, মোক্ষটোক্ষ ওসব লম্বা লম্বা বড় বড় কথা বলো কেন? আদার ব্যাপারী আমরা। আমাদের জাহাজের খবরে দরকার কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যত অনর্থের মূল। কর্মের ব্যাপারী অর্জুনকে স্বধর্মনিষ্ঠার লেকচার, মারামারি কাটাকাটির উপদেশ দিয়াছেন, তাতে কোন ক্ষতি নাই। 'সর্বকালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—(গীতা ৮।৭)—বেশ কথা। কিন্তু সেইটের উপর ভিত্ ক'রে, রাজযোগ, জ্ঞানযোগে, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, অক্ষর ব্রহ্মযোগ, দৈবাসুর সম্পদযোগ, শেষে মায় মোক্ষযোগে নিয়ে গিয়ে গাওন, শেষ করতে গেলেন, কিসের জন্য? ধান ভানতে কত শিবের গীতই যে গাইলেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্বয়ং যোগেশ্বর, যোগবলে এত কথা অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে, জগৎকে দিয়ে গেলেন। তিনিই দেখিতেছি, উচ্চাদর্শের সন্ধান দিয়া, জৈবভাববিশিষ্ট আমরা, আমাদের বিষম অনিষ্ট ঘটালেন। আমরা ওসব পরতত্ত্বের অধিকারী নই। কাজে মানিও না। কিন্তু, উপনিষদ যুগের বা বৈদিকযুগের ক্ষত্রিয়েরা কি জবর লোকই সব ছিলেন! যুদ্ধবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা একাধারে করায়ত্ত!"

—তবু উপায় নাই। ভারতের সমাজ, ভারতের শিল্প, ভারতের অর্থ-নীতি, ভারতের রাজনীতি, ভারতের বেদ, উপবেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্রমন্ত্র, সব যানই, সব মার্গ—সব পথই মোক্ষসাগরে মিশিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ বলতে পারেন এইরূপটা হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবিদ্গণ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের মুখ্য মোক্ষের সুরকে ভুলিতে পারেন

নাই। বিবাদীস্বর বলিয়া পরিত্যাগ, সমূলে করিতে পারেন নাই। গৌণভাবে ব্যবহারিক বিদ্যার চরম, আশ্চর্য চর্চা করিয়াছেন। পূর্তবিদ্যা, ভাস্কর্যের দিকে তাকাইলে বেশ বুঝা যায়।

কিন্তু, সব বিদ্যাই শেষে জীবকে স্মরণ করাইতে ভুলেন নাই,—শেষ আদর্শ—শিবে, সত্য শান্তে, সুন্দরে পরিণতি। তাই তৎস্বরূপ হইতে হইবে, কিম্বা পরমেশ্বরে ভক্তিপর হইতে হইবে। এই ইঙ্গিত করিয়া বা এই আভাষ দিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আর মানি বা নাই মানি, সত্য যা, তা চিরন্তন কালই সত্য থাকবে। (পুকুরের মাছেরা ভেবেছিলো চাঁদ অনেকগুলি। আর চাঁদ তাদেরই মত একশ্রেণীর মৎস্য-বিশেষ। প্রতিভাস, চিদাভাস, মায়ার দর্পণে এক-ব্রহ্ম-চন্দ্রকেই বহু দেখায়। জীবরূপী কূপমণ্ডূকগণ বহুত্বে বিশ্বাস করিলেও, একের সত্তায় কিছু আসে যায় না। কিন্তু, ডাঙার মানুষ দেখে, চাঁদ এক। সাধনের উচ্চভূমি হইতে সংসারিত্বমুক্ত, ভোগজিত মানবদেবতা দেখেন, সত্য একই। কিন্তু চিদাভাসবশতঃ বহু প্রতিভাত হইতেছে। লীলায় বহু মানিতে হয়। যতক্ষণ না পূর্ণ সত্য উপলব্ধি হইতেছে, ততক্ষণ ব্যবহারিক ভাবে সকল জিনিষের মূল্য দিতে হয়। একটি বালুকণার অস্তিত্ব পর্যন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অস্বীকার করবার জো নাই। কিন্তু স্থির জানিতে হইবে যে, সর্বদাই আপেক্ষিকের পিছনে একটা নিরপেক্ষ সত্য থাকে।)

(বহু কর্মের ভিতর, নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে প্রতিভাকে, চিত্তমনসংস্কারকে একমুখী করিতে পারিলে, আর কোন বিপথে যাইবার বিপদ নাই। নানা পরদা সাধিতে থাকিলেও, স্থায়ী ষড়জ সুরে মাঝে মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া, বহুত্বের ভিতর একত্বের ইঙ্গিত দিতে দেখা যায়। Standard আদর্শ বা ভিত্তি ঠিক চাই। মার্কিন পণ্ডিত বিচক্ষণ ইমারসন্ বলিয়াছেন,—All great men are men of *One Idea*. মহৎ লোক সবাই-ই—একদিকে ঝোঁকা। একনিষ্ঠ, তন্নিষ্ঠ, তদ্‌বুদ্ধি, তৎপরায়ণ, তৎপ্রাণ, তদ্ধন। তন্মন। সংসারে সর্ববিদ্যাবিশারদ চৌখস্ লোক মেলা দুর্লভ। অতিমানব সিজ্যার, ন্যাপোলিয়ঁ, বিবেকানন্দ মুষ্টিমেয়। আবার তাঁরাও সাধনার প্রাক্‌কালে বা প্রথম প্রথম, আহার নিদ্রা ভুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া এককেই ভজেন। তৎচিন্তা, তদ্-ধ্যান, তদ্-জ্ঞান, তন্ময় হইয়া যান। তারপর একাগ্রত্বের চরমে পৌঁছিয়া, অনেক বিষয়ে ইচ্ছা করিলে পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারেন। (এক ব্যক্তি একদিন, গোলমালের দরুন সাধনে বিঘ্ন হইতেছে বলিয়া, শরৎ মহারাজের নিকট অভিযোগ করিলে, মহারাজ বলেন,—

"আমি তার কি করব? কেন সেই আমাদের বরানগর, আলমবাজার মঠের আমলে আসতে পার নি? আমরা দরজায় হুড়কো দিয়ে, জপতপ করতুম। দুনিয়ার কাউকে ঢুকতে দিতুম না। দেখলে হাঁ হয়ে যেতে। হিন্দুস্থানী সাধু —হিন্দুস্থানী সাধু বলো—আমরা তাঁদের চেয়ে ঢের বেশী কঠোর করেছি।"

একদিকে ঝুঁকিলে, অন্যদিকে কম পড়িতে বাধ্য। পরমহংসদেব বলতেন,—"আর কতদিন ওপর ওপর ভাসবে? ডুব দাও। একটাকে পাকা ক'রে ধরো। আঁট আনো। তবে ত হবে। এধারে কমাও, তবে ত ওধারে—এগোবে।" এইটুকু বুঝিয়া, শ্রেয়ের দিকে, ঝোঁক দেওয়া সমীচীন। আবার সংসারের সজোর টানে সেই শ্রেয়ের দিকে কোনমতেই যাইতে দেয় না। মানুষ-বুঝে, জেনেও, সামলাতে পারে না। পরমহংসদেব যেমন তাঁহার অনবদ্য সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলতেন, যখন বন্যার তোড় আসে, কেউ সামলাতে পারে না। ঘরের আঙিনায় পর্যন্ত একবাঁশ জল দাঁড়ায়। অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ, পাপং চরিত পুরুষঃ—মহাবীর নিদ্রাজয়ী যোগী অর্জুনও এই কথা বলেছেন। এরূপ হ'লে উপায় নাই। আকুল প্রার্থনার ভিতরে, ব্রহ্ম ফুটিয়া উঠেন। কিন্তু, চরমক্ষেত্রে ভোগের পথে, মানুষ প্রার্থনা করবার শক্তিটিও হারাইয়া পূর্ণ দ্বিপদ পশু হইয়া দাঁড়ায়।

যতটা যুক্তিতর্ক বিবেকের আল-বাঁধ মানে, সেই ভূমির কথাই হইতেছে। আবার শ্রেয়বুদ্ধিও এক একজনের এক এক রকম! বুদ্ধিতে যেটি শ্রেয় বলিয়া বোধ হয়, সেইটেই অনুসরণ ছাড়া গতি নেই। তবে বুদ্ধি আবার পাকা আছে। কাঁচা আছে। কোন গর্হিত কর্মে ইষ্টতাবুদ্ধি আসিল, কেহ যদি তর্কস্থলে এই কথা বলেন। তদুত্তরে বক্তব্য, ভিতরে বিবেক বলিয়া এমন একটি সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন বস্তু আছে, যাহাকে অধিককাল আঁখি ঠারিয়া জীব চলিতে পারে না। চলিলেও মাঝে মাঝে খোঁচা লাগিবে। ডাঙ্গস্ লাগিবে। আর সাধক-প্রবর্তক অবস্থায় জীবনে এগোনো পিছানো যতটা চেষ্টাসাপেক্ষ, তাহার ভিতর এটা বলিতে আমরা বাধ্য যে, ভালমন্দের মধ্যে ভালটার ভিতরেই সত্যের প্রকাশ বেশী। সুতরাং কর্মকৌশলী মাত্রেই সৎকে, সুনীতিককে অবলম্বন করিয়া চলিতে পরামর্শ দিবেন। সতে নিষ্ঠা আসিলেই, আমাদের ঠিক পথে (হয় ত একটু আধটু ঘুরাইয়া) লইয়া যাইবেই। অব্যভিচারী হইয়া, এই এককে লইয়া কিছুকাল পড়িয়া থাকিতে হয়। সাধক অবস্থায়, সাগ্‌রেদী দশায়, সঙ্গীত-সাধনরাজ্যে —আদর্শ পাত্‌লা বা চটুল হইয়া যাইবার ভয়ে, ধ্রুবপদ শিক্ষার্থী অন্ত ঢপের

গান—এমন কি কানে শোনা পর্যন্ত, কিছুকাল নিয়ম করিয়া বন্ধ রাখেন। ঘৃণার দিক দিয়ে নয়। অপর পর্যায়ের গীতকে খাটো করবার জন্যও নয়। নিজ অভীপ্সিত আদর্শবিদ্যায় পারদর্শিত্ব লাভের জন্য।

শাস্ত্র যখন চরম আদর্শের কথা বলেছেন, তখন 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'. জীবন্মুক্ত-বিবেকের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। সেই দৃষ্টি নিয়ে বলছেন,—কর্ম—সে ত "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।" মোক্ষই আমাদের সকল খেলার 'বুড়ী'। তাকে ছুঁতেই হবে। আবার সে চরম পদবী হচ্ছে—বাক্যমনাতীত। ইঙ্গিতে তৎসম্বন্ধে বলা হয়েছে মাত্র। স্বসংবেদ্য, পরসমাধিগম্য জ্ঞান। অস্তি-ভাতি-প্রিয় বচনের দ্বারা উপলক্ষিত। একটি কবিতায় স্বামীজী এই অবস্থাকে—ইহাকেই 'শান্তি' নাম দিয়া জীবনের একমাত্র লক্ষ্য যে ইহাই, তাহা বলিয়াছেন—Peace, its only goal. আমাদের জন্ম জন্ম সংস্কারের জন্য যে অসাম্য-চাঞ্চল্যকে আমরা বুকে ধরে, বয়ে নিয়ে ঘুরছি, বেড়াচ্ছি—সেইটির সমূল উৎপাটনই, সাধনের উদ্দেশ্য। তাহাই "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা।" প্রতিমা-পূজা, প্রার্থনা, সাকার-নিরাকার, কর্ম, যোগ, জপতপ, বিদ্যা-জ্ঞান-বিচার,—যে পন্থা যখন যে ধাতে খাপ খাবে, নিতে হবে। কোন পথই ছোট নয়। যদি বড়, ইহার ভিতর কোনটা থাকে ত সেই পরম সাম্যপদবী। সেই বুড়ী। আখেরে বহুর' জ্ঞান দাঁড়ায় "মোঘজ্ঞানে" অর্থাৎ অনর্থসাধক নিষ্ফলজ্ঞান, যাতে সেই এক—"একম্ সতে" না নিয়ে যায়, ইহাই বেদশীর্ষ উপনিষদ-মুখ শাস্ত্রার্থের নির্দেশ। "একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি।" সরল ভাষায় এক কথায় পরমহংসদেব বলতেন, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। পরমহংসদেবের জীবনের সব আয়োজন, সব লোকসংগ্রহ ঈশ্বরকে লইয়াই। তদর্থে। সবব্যাপারের সার্থকতা পরমেশ্বরে। নরেন্দ্র-রাখালকে কেন চাই? ঈশ্বরের মহিমা প্রকট করবার জন্যই।

যে মানুষ ভগবানকে, পরমাত্মাকে পিছনে রেখে নিজেদের সামনে আনতে চায়, তেমন লোক শ্রীরামকৃষ্ণ চান না। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন বলিয়া, শুনিয়াছি,—ঠাকুর ছিলেন জ্ঞানময়। মনটাকে নামিয়ে রাখবার জন্য ভক্তি-ভক্ত চাইতেন। তাই নিয়ে থাকতেন। নিজ রচনায় তাঁর সম্বন্ধে লিখছেন—"অদ্বয় তত্ত্বসমাহিতচিত্তং। প্রোজ্জ্বল ভক্তি পটাবৃত বৃত্তং।" এ যুগের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আধার নরেন্দ্রের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁর জ্ঞানময় সত্তা প্রকট করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? আবার গৃহস্থের নিকট—সাধারণের নিকট—

নারদীয় ভক্তির শিক্ষাদাতারূপে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে প্রতিভাত হইয়াছেন। দুই-ই প্রয়োজন। দুই-ই সত্য। আমরাও দেখিয়াছি গুরু-পদাঙ্কানুসারী স্বামী সারদানন্দ তাঁহার জনৈক অতি পবিত্র ত্যাগী বালকের নিকট জ্ঞানের কথা, জ্ঞানের উপদেশ, জ্ঞান-সাধন ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গই প্রায় করিতেন না। জ্ঞানের অত্যুচ্চ সোপান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই মর্মে সাফ বলছেন—"আমি বলি, মা! আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল—কিছুই চাই না। কেবল তোমায় চাই! মানুষ নিয়ে কি করব?" যুগলীলা-প্রকটকারী রামকৃষ্ণ তখন যেন নিরাকারা তারায় ডুবিয়া গিয়াছেন। আবার, অপর সময়ে নরেন্দ্রকে পাইবার জন্য তিনি কি অদৃষ্টপূর্ব-রূপে চঞ্চল হইয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত তরুণের প্রতিভূ ও পুরোধা নরেন্দ্র যেদিন চিন্ময়ী কালী দেখিয়া, কালী মানিয়া সারারাত মার নামে মাতিয়া থাকেন, সেইদিন দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণ গদাধর নিজের জীবনোদ্দেশ্যে যেন চক্ষের সমক্ষে সফল হইয়া গেল, ইহা ভাবিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। জগৎকে সর্বাঙ্গসুন্দর নরেন্দ্র দিয়া, নরেন্দ্রের ভাবপ্রসূতী শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

সামারূঢ় শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন—Talk not but let the power the power of purity, of chastity, the power of renunciation emanate from every pore of your body ......the more of such men any country produces, the higher is that country raised. That land where no such men exist is doomed কথায় আর কাজ নেই। পবিত্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্যের বল, ত্যাগের অমোঘ প্রভাব,—শরীরের প্রতি রোমকূপ থেকে বিনির্গত হোক। যে কোন দেশে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো যতলোকই জন্মাবে, ততই সে দেশ উঠবে। উন্নত হবে। আর যে দেশে ও রকম মানুষ থাকবে না, সে দেশ জাহান্নমে যাবে।

আবার বলছেন—We must transcend matter and go beyond body. The whole life of man is really an effort to do this. জড়ের পারে, দেহের উপরে উঠতে হবে। মানুষের সমস্ত জীবনটাই এই চেষ্টারই পরিচায়ক হওয়া উচিত। তবে জেনেশুনে এইটা কত্তে হবে।

স্বামীজীর সমগ্র বাণী এবং তাঁহারই চিহ্নিত গুরুভাই ও শিষ্যদিগের জীবন আলোচনা করলে—তাঁহার বিভিন্ন, বহুল উপদেশের যে ইহাই শেষ উদ্দেশ্য ও

তাৎপর্য তাহা মনে হয়। চিঠিতে কোন কোন জায়গায় তিনি যে যুক্তি-ফুক্তি ফেলে দিতে বলেছেন, সেটা অর্থবাদের দিক দিয়ে বুঝতে হবে কি না, সুধী-সমাজ ধার্য করবেন। ঠিক্ ঠিক্ না করতে পারলেও, কর্মপথে থাকিয়াই চেষ্টা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি-অন্তে জ্ঞান লাভ সম্ভব, ইহাও স্বামীজী ইঙ্গিত করিয়াছেন। তমোগুণে নিমজ্জিত দেশবাসীকে দেশের কাজে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই কর্মের প্রশংসা করেছেন। এবং তাহা ঠিকই করিয়াছেন। তবে পরিণামে 'আত্মবন্তং' হইতে হইবে। তাহা হইতে পারিলেই কর্ম আর আমাদের বাঁধতে পারবে না। নতুবা পদে পদে বিপদ। "যোগসংন্যস্ত কর্মাণং-জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ং। আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥"৪।৪২॥

কতো পরিবর্তন হোলো, তথাপি অবস্থা প্রায়ই সেই। অন্ততঃ আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কিয়ৎদিনের জন্য সুফল পাওয়া গেলেও, বামুন ঘর যাইলেই আমরা লাঙল তুলিতে থাকি। বাংলার পল্লী, শুধু বাংলার বলি কেন, ভারতীয় পল্লীর পর্বত্র সাধারণ হিন্দু নরনারী পুরাণধর্মী—তন্ত্রাচার-আচরিত। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, তুলসীপূজা, সরিৎ-সাগর-বন্দনা, পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচার, ষোড়শোপচার পূজা, ষষ্ঠি, মাকাল, শীতলা, বৃক্ষতলে শিলা, সাঁওতালদের বংঙা বংঙী, ঘোড় সাহেব, সত্যপীর, মা-মনসা, রক্ষাকালী, মনসাতলার মাটির ঘোড়া, হাতী, উঠ, পীরের দরগায় সিন্নী, কালীঘরে পাঁঠা, নানাপ্রকারের মানৎপ্রথা—পূর্ণ প্রকট। সর্বত্র ইহাই ঘরোয়া, সাধারণের লোকধর্মের Popular Religion বাহ্যরূপ। এই সবের পিছনে অবশ্য গূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব, পরব্রহ্মতত্ত্ব লুকায়িত রহিয়াছে। তবে ভবী ভোলবার নয়। ঘরোয়া ধর্ম লইয়া সংসারের মানুষ ঘর করিয়া থাকে। বিভিন্ন পুরাণাদিতে ইষ্টনিষ্ঠায় মানুষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, অনন্ত গাথা, ঠাকুরমার ঝুলির গল্পকথা, রুচিকর মনোহারী আখ্যায়িকা—কথা-সাহিত্যের বিরাট সৃষ্টি—সংঘটিত হইয়াছে। (কালীভক্ত বলছেন ও তোর কৃষ্ণের ইষ্ট—আমার মা। আবার কৃষ্ণ-অনুরক্ত পাণ্টা বলছেন, অষ্টশক্তি তাঁর দাসী। ওরে আমার কেষ্ট—সর্বোৎকৃষ্ট।

এক মজার গল্প মনে পড়ে। একজন বেতনভুক্ পাদ্রী, গরীব বাঙালী চাষাভুষোদের যীশুর মহিমা বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর মজার ভাঙা ভাঙা বুলি—"টমোডের টুলসী পাটা একটা ডেবটা। কিণ্টু ইহা কী করিটে পারে, বোলো? এই ডেখো; ইহা আমি পায়ে ঘষি। কী হইবে? আবার ডেখো। টোমাডের রামচন্দ্রো একটা ডেবটা। বাঁন্দরের সাহায্য লইয়া পড়িবারকে রক্ষা কড়িল।

নিজের খেমটা কুছু ডেখাটে পারলে না। টোমাডের মা কালী আর একটা ডেবটা। লেংঠা। অসভ্য। মাহুষের মাথা খায়। আর যীশু মানুষকে পেম ডেন—তিনি পাপীকে উড্ডার কোরেন! টিনি ক—টো বড়ো !!!"—ইত্যাদি।

একজন রসিক অথচ বুদ্ধিমান কৃষক, শ্রোতাদের ভিতর হইতে উঠিয়া, কতকগুলি বিছুটি পাতা লইয়া প্রচারককে বলিল—"এই বড়ো টুলসী টুমি পায়ে ঘষোটো ডেখি? ইহার কিছু খেমটা আছে কি না, ডেখো।" পাদরী সানন্দে উহা ঘষিতে না ঘষিতেই নিরানন্দময় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বক্তৃতা মাথায় চড়িয়া গেল। অসহ্য জ্বালায় নেটাপাটা খাইয়া বলিলেন—"হাঁ, আমি মুক্টো কন্ঠে আজ স্বীকার করছি—টোমাডের টুলসী পাটা খমটা ঢরে। খুবই খমটা ঢরে। মাইরি বলছি !!!"

—শাক্তে, বৈষ্ণবে, গাণপত্যে, সৌরে (যথা, কোন কোন পূর্ণকুম্ভমেলায়) মাঝে মাঝে যেরূপ গণ্ডগোল ও সঙ্কীর্ণতা দেখা যায়—তন্নিবারণে, যুক্তির সকল বল, আঁটিয়া উঠিতে পারে না। পূর্বোক্ত গল্পের কিছুটিই হয়তো এই রোগের পরমৌষধ।—কে জানে?

শাস্ত্রের তাৎপর্য যে অর্থবাদে—পরনিন্দায় নহে, পরের ইষ্টকে খাটো করায় নয়, স্বেষ্টে নিষ্ঠা বাড়াইবার জন্যই যে পূর্বোক্ত প্রশংসামূলক অর্থবাদরূপ কৌশল পুরাণকারেরা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াই তো যত গণ্ডগোল হইয়াছে।

প্রকৃত নৈষ্কর্ম্য-পদবী যে পরম পদবী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বিবেকানন্দ বলছেন—Not matter, but *spirit*. All that has name and form is subject to all that has none. This is the Eternal Truth the Srutis preach. Bring in the light the darkness will vanish of itself.

জড় নহে। আত্মচৈতন্য চাই। নামরূপ-বিশিষ্ট যাহা, সে সবই নামরূপ-বিহীনের অধীন। শ্রুতি এই সনাতন সত্যই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এই আত্মিক আলো নিয়ে এসো। আনাত্ম-অন্ধকার দূরে পলাইবে। এই নির্গুণত্বে লইয়া যাইবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এত তোড়জোড়। আত্মিক শক্তির বিকাশসাধনই উদ্দেশ্য। নির্গুণত্ব বুঝিতে হইলে এবং তদুদ্দেশ্যে দুঃখময় স্বার্থবলিদানের জীবনকে হাসি মুখে বরণ করিয়া লইতে হইলে, খুব তীক্ষ্ণ,

সূক্ষ্মবুদ্ধির আবশ্যক করে, প্রথমতঃ। যদিও ইহা শেষে,—বুদ্ধির পারের কথা। মনোনাশের ব্যাপার। মোক্ষকথা ও প্রাণমন-বুদ্ধির শুদ্ধিপ্রসঙ্গ পরে আরও আলোচিত হইয়াছে। এখানে সেই প্রসঙ্গের চুম্বকরূপে পত্তন করিয়া রাখা মাত্র।

রামকৃষ্ণের পূর্বগ সমাজসংস্কারক কেহ কেহ, উপনিষদাদি হইতে ভাষায় অনুবাদ করিয়া একেশ্বরবাদ ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য। কিন্তু আচরণ পৃথক বস্তু। ইঁহাদের ভিতর কেহ কেহ বহুভাষাবিৎ ছিলেন। লৌকিক শিক্ষায়, রামকৃষ্ণ অপেক্ষা অনেক উচ্চে আসীন ছিলেন। স্থূল প্রতিমা-প্রতীক পূজাকারী যে, পরিশেষে ওঙ্কারাদি শব্দ সূক্ষ্ম-প্রতিমাপূজকদিগেরই ন্যায় —পরব্রহ্মে বা এক ঈশ্বরে পঁহুছিতে পারেন, ইঁহাদের তথাকথিত উদার মন, কার্যক্ষেত্রে এই সত্য সর্বসমক্ষে স্বীকার করিবার মত, মানিবার মত প্রকৃত উদারতা, চিত্তের সমগ্র পরিধির মধ্যে খুঁজিয়া পান নাই। তাই, হৃদয়মনের শিক্ষার দিক দিয়া মনে হয়, রামকৃষ্ণ ১৯ শতকে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার উদার চরিতকথা পাঠ, বর্তমান যুগের প্রত্যেক উদারতা শিক্ষার্থীর শ্রেষ্ঠ পাঠশালা-বিশেষ। যাঁরা তাঁহার প্রাণপ্রিয় মা-কালী মানেন নাই, পুতুল-পূজা বলিয়া উপহাস, অবজ্ঞা, অবমাননারত ছিলেন, তিনি তাঁহাদেরও ভক্তি করিয়াছেন, প্রণাম জানাইয়াছেন। তাঁহাদের মানিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীরা অনভিপ্রেত মতের প্রতি এরূপ আচরণ দেখান নাই। একজন জীবনের শেষে রামকৃষ্ণকে প্রণতি দিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ত্যাগ—কর্মতপস্যা ও যোগ—উচ্চতম আদর্শবাদ

জগতে চিরকালই যোগী ও ভোগী—এই দুই শ্রেণীর লোক ছিল। আছে। থাকিবে। প্রথমশ্রেণীর সংখ্যা আবার অবশ্যম্ভাবীরূপে চিরদিনই অল্প। অধিকাংশের ভোটে, এ ক্ষেত্রে সত্য নির্ণয় হওয়া দুষ্কর। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সকলকে কেহ কেহ সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন। ভারতে ইঁহারাই আধ্যাত্ম-নেতা। আবার বহুতে—রূপ-রস-শব্দ প্রভৃতি বিষয়নিচয় ইন্দ্রিয়-অগ্নিতে

আহুতি দেন। "শ্রোত্রাদীন্ ইন্দ্রিয়াণি—অন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি। শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।"—গী ৪।২৬

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি যে আবশ্যক, একমাত্র কাম্য,—ক্ষণিক সুখের বিনিময়ে পরমানন্দ আদরণীয়, ইহা সুদূরপ্রসারী অধ্যাত্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন ধীমান্ ব্যক্তি ভিন্ন কে বুঝিবে? যিনি ক্ষণিক উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়-বিতাড়িত, তাঁহার ন্যায় হতবুদ্ধি মানবাকৃতি পশু, কি বুঝিবে? তিনি যে সম্মোহিত, নিত্যানিত্য-বিবেক-বিজ্ঞানবিহীন। স্নায়ুতাড়িত ও তন্তুত্তেজিত। সুখং আত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ং ৬।২১। সেই জন্য সন্ন্যাস বা ত্যাগব্রতের গাম্ভীর্য, মাধুর্য, পরম শ্রেষ্ঠত্ব, একান্ত কাম্যত্ব—সূক্ষ্মধী ভিন্ন বুঝা দুষ্কর। বেতার বার্তায় যে বৈজ্ঞানিক যাদু-বিদ্যা প্রকট—অনুবীক্ষণ বা দূরবীণ যন্ত্রে যে সূক্ষ্ম স্থূল জগদভিব্যক্তি প্রকটীকৃত, তাহা গাঁওয়ার বা প্রাকৃত-জনের বোধে আসা দুঃসাধ্য। আবার চাষের কৌশল, কর্ষণের মহানন্দ—কেতাবকীট পড়ুয়া বাবুর অনুভূতির বাহিরে।

'বিবেকী'কে শঙ্কর 'পণ্ডিত' আখ্যা দিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা-মুখে সত্ত্বগুণারূঢ় ত্যাগীকেই 'মেধাবী' বলিয়াছেন। কারণ, বেশ বুঝা যায়, উচ্চদরের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে, আপাতরম্য ভোগ্যবস্তু সকল হইতে উপরতির চেষ্টা আসিতে পারে না। এই দিক দিয়া ত্যাগী খুবই calculating—খতিয়ান-বুদ্ধিযুক্ত। ত্যাগী···মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ (১৮।১০) এইরূপ ব্যক্তিরই পরিশেষে হৃদয়গ্রন্থি 'ভিন্ন'—সর্ব সংশয় সংছিন্ন। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইঁহাকেই 'যোগী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মনে, ভোগের চিন্তা উদয় হইলেই, অশেষ পীড়ার সঞ্চার হয়। শরীরের দ্বারা ভোগ করিতে হয় না—অতদূর নিম্নে নামিতে হয় না।

পুঁথিগত বিদ্যার্জন অপেক্ষা—আত্মসাক্ষাৎকারী যোগী যে লক্ষ গুণে বড়, তাহাও এখানে উক্ত—তপস্বিভ্যো অধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী। তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ৬।৪৬। ইহার তাৎপর্য—চান্দ্রায়ণাদি সুদুষ্কর ব্রত অভ্যাসরূপ তপস্যানিচয়রত যাঁহারা, তাঁহাদের অপেক্ষা যোগী বড়। যোগী কে? যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয়—এই তিন হইয়াছে। 'জ্ঞানী'দের চেয়েও যোগী বড়। এই 'জ্ঞানী' বলিতে এখানে পড়ুয়া, কেতাবা পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। পুঁথিগত বিদ্যার ব্যাপারী। শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যানবিৎ বাগবৈখরী, শব্দঝরী। আবার সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—যোগী, কর্মী (নিষ্কামকর্মী?) অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

নব্যভারতে এই আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশকে মুখ্যভাবে ধরিয়া, জীবনের সবক্ষেত্রে বিচরণ করিবার উপদেশ বহন করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এসেছিলেন। তাঁহাদের কঠোর সাধন কিসের জন্ম? রাসমণির বাগানে পূর্ণ এক যুগ কি উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ—কালী কালী করিলেন? বাল্যাবধি (নরেন্দ্র বাল্য হইতে জ্যোতিঃদর্শন করিতেন) যাঁহারা ঈশ্বরৈকমুখ তাঁহাদের ত্যাগ তপস্যা কর্মপ্রতিষ্ঠা,—লোকহিতায় নহে তো, কিসের জন্ম বলিব? পরমহংসদেবের কথা বলিতে বলিতে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—Give up wealth. What docs it matter? অর্থকে—কাঞ্চনকে ত্যাগ করো। তাতে কি এসে যাবে? "সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন"—পরমহংসদেব "টাকা মাটী, মাটী টাকা", সাধন করিয়াছিলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই এই কড়া উপদেশের চরম শীর্ষস্থান হইতে একেবারে পাতালে পড়তে হোলো। আমাদের প্রতি রোমকূপে রোমকূপে কামনা। টাকার কামনা। এ যে বেজায় আদর্শের গোলযোগ—গোলকধাঁধায় পড়ে গেলাম। একজন কান মলিয়া যেন বলিল, আরে হতভাগা, ভারতে যে অন্নের হাহাকার। ভোগীই হোতে পারে না। তো আবার যোগী? বাধ্য হোয়ে অনাহারী—আমরা হলাম সেই শ্রেণীর। মার্কিনে 'রূপচাঁদ' অনেক হয়েছে। সে এখন বেদান্ত শুনুক। তার ক্ষমতা আছে, বথৎ আছে। নিত্য দুর্ভিক্ষ আমাদের! রসবর্জং ইব প্রতিভাতি। বাইরে থেকে দেখে ব'লে বোধ হবে, বুঝি বিষয়-রসস্পৃহা নাই। কিন্তু সত্য তাহা নহে। ভগবানই বলছেন—'রস অপি অস্য' অন্তরে নিহিত ভোগ-স্পৃহা থাকিলেও।

এ বিষয়ে অন্যত্র বলা হইয়াছে। এখানে এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, এরূপ "যোগী" হইবার উপদেশ, শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। তাহা মিথ্যাচার। যাঁদের ভোগের সুবিধা আছে, তাঁরাই ত্যাগী হতে পারবেন। বিকারে বিকৃত হবার সাবকাশ সুবিধাসত্ত্বেও যাঁরা স্বেচ্ছায় উচ্চ আদর্শ মন্ত্রে লইয়া, তা হতে ক্রমশঃ বিরত হবার জন্য চেষ্টিত, তাঁহারাই এ পথের উপযোগী। তা নয়,—গায়ে নেই আমার এক ফোঁটা শক্তি, বললাম,—"তোকে দয়া ক'রে ক্ষমা করলুম। রেগে গেলে ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিতুম।" ইহা বহ্বারম্ভ ভিন্ন আর কিছু নহে। আবার ইহাও সত্য, মনে মনে থাকিলেও, সবটাই বাইরে ভোগ অন্তে ক্ষয় করতে হবে, তাহাই বা কেমন করিয়া হইবে? বিচার চাই। বিবেক চাই—কর্তব্য-অকর্তব্য বোধ চাই। শনৈঃ শনৈঃ শুভ

সংস্কারের প্রলেপ মনের উপর পড়িতে থাকিলে, বিষয়-আকাঙ্ক্ষার ক্ষত সরিয়াও যায় ক্রমশঃ। সব সাধকই ইহা বলিয়াছেন। কার্যক্ষেত্রে সকলেই ইহা দেখিতেছেন। তবে উপবাসী লোকমাত্রেই যোগী নহে, খুব ঠিক কথা। তারা রসবর্জং, বিষয়-রস ভোগ করছে না, করতে সুবিধা পাচ্ছে না। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, ভোগের জন্য সব আকুলতা নির্মূলে সেই দিনই যাইবে, যেদিন 'পরং দৃষ্টবান'। আত্মসাক্ষাৎকার—সত্যস্বরূপের উপলব্ধিতেই সব অবসান। "কাঁচা আমির"—পাকা আমিতে আমূল পরিবর্তন। আর বেচাল হবে না। যে অবস্থা লাভ করলে—তদ্‌ব্যতিরিক্ত সব লাভকেই অলাভ মনে হয়।"

যোগী হওয়ার সুষ্ঠু আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বামীজী সর্বকর্মের ভিতর—আত্ম-উপলব্ধি করিবার ভাব লইয়া——সেবাশ্রম বলো, পাঠ-শালা, তাঁতশালা, কলাভবন, শিল্পাশ্রম, মঠ, যা কিছু সবের ভিতর দিয়াই নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী—পরিণামে যোগপদারূঢ় করিবার জন্যই, ব্যবস্থা-নিচয়—পন্থাসমূহ ছকিয়া দিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকারের কর্ম পত্তন করিয়া যাইবার ভিতর স্বামীজীর এই মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ে জাগরূক ছিল। কর্মমার্গ বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে উপযোগী, ইহা তিনি জানিতেন। শরৎ মহারাজকে স্বামীজী স্পষ্টই একবার বলেছিলেন—"ওরে, এইসব করে গেলুম। এ না হোলে ছোঁড়ারা বাড়ী ফিরে যাবে। তার চেয়ে তো Better ভাল হবে।" কিন্তু আচার্যপাদের বা বেলুড় মঠের আজীবন সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের—নিজ নিজ জীবনে এবং উপদেশের ভিতর, মূলকথার উপর, সত্যলাভের উপর জোর বরাবরই থাকিত।

পরমহংসদেব কাপ্তেনকে বলিয়াছিলেন—"কর্ম কি চিরকাল করতে হবে? মৌমাছি ভন্‌ভন্ কতক্ষণ করে? যতক্ষণ না ফুলে বসে। মধুপানের সময় ভনভনানি চলে যায়।"

স্বামীজীর ভাষায়, দক্ষিণেশ্বরের "জৃম্ভিত (প্রকট) যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বরের" জীবনাবলম্বনে—"নিরোধন, সমাহিত মন, নিরখি তব কৃপায়"—অবস্থা লাভ-করাই উদ্দেশ্য। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অবস্থালাভে পরিতৃপ্ত, তিনি শেষ পর্যন্ত রজোগুণকে অতিক্রম করিতে পারিবেন, ইহাও শ্রীনরেন্দ্রের ধীর শান্তভাবে লেখা রামকৃষ্ণ স্তোত্রের ভিতর বলা হইয়াছে। বলিতেছেন—হে রামকৃষ্ণ। তোমার (দ্বারা প্রকটীকৃত) ঋত পথে যার অনুরাগ আসে, তার তোমাকেই পেয়ে সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়। সুতরাং সে ব্যক্তি শীঘ্র রজোগুণকে অতিক্রম করে। "তেজস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ। রাগে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে!" তমঃ অপেক্ষা

যথেষ্ট ভাল হোলেও, রজোগুণ সদোষ। তবে শ্রীরামকৃষ্ণাদর্শে অনুপ্রাণিত দিব্য-কর্মী যিনি, তিনি লোকহিতায় সৎকর্মানুষ্ঠানে সেই পুরুষোত্তম কর্তৃকই আদিষ্ট হইবেন, নিঃসন্দেহ। তাহারও লক্ষণ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবেকানন্দের দিকে ছ্যাখো। ছবিতেই বুঝাবে। Intense rest under intense activity—আদর্শ যেন মূর্ত। কোটী আড়ম্বর কোলাহলের ভিতর তাঁহার বদনে যোগজ নিস্তব্ধতার মধুময় জ্যোতি ভাসিয়া উঠিত। তাঁর কর্মানুষ্ঠান নিঃসন্দেহ, গীতোক্ত—বিরাট পুরুষের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম। তপস্যারূপে কর্ম। আমাদের মত বালাইযুক্ত কর্ম নহে! বাহ্যতঃ তিনি যথেষ্ট কর্ম করিয়াছেন। কিন্তু ভিতরের ভাব, সাধারণের মত কামনা-বাসনা মাখা তাঁর ছিল কি? নিশ্চয়ই নহে। তাঁহার সর্বাংশে অনুগ—সারদানন্দ মহারাজকে দেখিয়া, ইহা বেশ বুঝিয়াছি। স্বামী সারদানন্দ বলিতেন, "আমাদের ভিতর ঠাকুরকে স্বামীজীই ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন। আর ঠাকুরকে বুঝতে গেলে স্বামীজীর ভেতর দিয়ে ছাড়া, গত্যন্তর নেই।" স্বামীজীই বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিবার সূত্র। বিবেকানন্দের ভিতর দিয়াই রামকৃষ্ণ-যুগচক্রের আত্মপ্রকাশ। বিবেকানন্দের বিবেকের উপর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁর ভিতর যথেষ্ট ভাব ছিল। পাকা ভাব ছিল। কিন্তু স্নায়বিক দৌর্বল্যজাত ভাবপ্রবণতা ছিল না। কলিকাতার পথে পথে শোভাযাত্রা করিয়া, "হে কলির জীব, রামকৃষ্ণ না ভজিলে তোমাদের গতি নাই। রামকৃষ্ণই এক মাত্র পথ।"—এরূপ বালকোচিত পাদরীগিরিতে তাঁর রুচি ছিল না। জোর করিয়া নিজের বিশ্বাস অপরের উপর চাপানো, তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর শরণাগত যাঁহারা হইতেন, তাঁহাদিগকে তিনি অবশ্যই তাঁহার প্রাণের কথা বলিতে বা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিজে যাহা বুঝিয়াছিলেন, লেখায় তাহা ব্যক্ত করিতে কার্পণ্য করিতেন না। দ্বিধা কোন দিন করিতেন না। বিবেকানন্দ তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে উদ্দেশ ক'রে লিখেছিলেন,—হে প্রভো —"তুমি আঁখি মম, তবরূপ সর্বঘটে।" শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা না বুঝিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব অবলম্বন না করিয়া শ্রীবিবেকানন্দ কোন কাজই করেন নাই। তাঁর শ্বাসে প্রশ্বাসে ভাব-ঘন-মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের স্বতঃস্ফূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার সপ্রেমে তাঁকে বলেওছিলেন—"তুই যেখানে আমাকে নিয়ে যাবি, আমি সেই-খানেই যাব।" বিবেকানন্দই বিশেষ করিয়া মার্কা-মারা। কল্পনাতীতরূপে কাম-কাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম তড়িৎশক্তি ধারণ করিবার মত উপযুক্ত আধার, 'লোক-শিক্ষক' বীরেশ্বর শ্রীশ্রীনরেন্দ্ররই ছিল। তিনিই এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত।

যোগী হইবার পূর্বোক্ত আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাস লইয়াই, কর্মময় জীবন-পথে সচরাচর আমাদের চলিতে হইবে। পরমহংসদেব আরও একজন প্রথিতনামা ব্যক্তিকে বলেছিলেন, "লোকে হদ্দ বল্‌বে অমুক বাবু বেশ বল্লেন। লোকটা খুব জ্ঞানী। .....অহংকার নাশ করো।" তেমনি বলা যাইতে পারে, লোকে হদ্দ বল্‌বে "অমুক প্রতিষ্ঠানটা বেশ পাকা লোকে চালাচ্ছে। বেশ ব্যবস্থা। হিসাব কিতাব সব পাকা।" এ গৌরব মন্দ নয়। বেশ ভালই। কিন্তু পরমহংসদেব যেন আজও বলছেন,—"বৎস, বেশ, কিন্তু ততঃকিম্?" আদর্শ-পরিশুদ্ধি, আদর্শ-প্রাপ্তির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল কতকগুলি কাজ, (যার পদে পদে আগা থেকে পাশ্‌তলা পর্যন্ত সবটাতেই বিবেকী চিত্ত-অন্তঃকরণ কেবলই ব'লে উঠছে—মন বুঝেছে গো, প্রাণ তো বোঝেনা। মনেরে আঁখি আর কতদিন ঠারবে রে ভাই?) করতে থাকলেই কি,—হে মোর আদর্শবাদী মন, তোমার যথেষ্ট হল? সব কাজে আদর্শ বা মুক্তি বা সত্য-সাক্ষাৎকার মিলে না। "ভয় হয় পাছে তোমার কাজে আমারে করিহে প্রচার।" গীতাকার তজ্জন্য বলিয়াছেন "দূরেণ হি অবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ।" বুদ্ধিযোগ, তত্তৎ বুদ্ধি, ভাব নিয়ে কাজ করলে তবেই রেহাই। গঙ্গাস্নান, কেউ বা স্বাস্থ্যবুদ্ধি নিয়ে করছে, কেউ বা প্রায়শ্চিত্ত ও অনুতাপবুদ্ধি তাতে চড়িয়ে করছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি ফল একটু স্বতন্ত্র পাবেই। বুদ্ধিযোগ হইতে কাম্য কর্ম অতীব নিকৃষ্ট। যাঁহারা মোক্ষপ্রার্থী সত্যলিপ্সু অথচ কর্মরত (কারণ স্বভাবই আমাদের অনিচ্ছন্নপি কর্ম করাবেই) তাঁহাদের এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। আদর্শ পরিশুদ্ধির দিক হইতে অনেক সময় অনেক কিছু,—হয়ত নির্মমভাবে বন্ধু চটাইয়া, আত্মীয়ের মনে ঘা দিয়া বর্জন করিতে হয়।

মোক্ষ মানাও কি একটা যা তা? অনেক জন্মের কর্ম ক্ষয় হলে তবে—ও দিকে নজর পড়ে। যা কিছু করছি, সবই করা চাই। না করে উপায় নাই। পক্ষহীন মন-বিহঙ্গম! "এ যে নহে পথ পালাবার!" আবার সিদ্ধ সাধক ভাবের-মানুষ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন "লবে কড়ার কড়া, তস্য কড়া, এড়াবে না রতিমাষা।" নির্মমা প্রকৃতি। Condemn not that ye be not condemned. পরস্পরে গালাগালি সুর করলে তার থেই বা অন্ত কিছুই পাওয়া যায় না। কর্মীকে সাধনভজনশীল ব্যক্তি খাটো জ্ঞান করে, যদি বলতে থাকেন—"দম্ভ অহঙ্কারে মট্ মট্ করছেন। প্রাতস্মরণীয় লোকদের নাম করে কেবল মোসাহেবদের, খোসামুদের মধুচক্র রচনা করছেন।" কর্মীও ইহা

শুনিয়া ছাড়িবেন না,—প্রবর্তকে প্রবর্তকে ঝগড়া বিরামবিহীন চলরে। কর্মী রেগে বুক ফুলিয়ে বলবেন—"ওরে আলসে কর্মনেশে। বেয়াদব অবধূত! এক কড়ার কোন মুরদ নেই। খালি বসে বসে ল্যাজ নাড়া! দুষ্ট গরু। হরিঘোষের গোয়াল পেয়ে গেছ? খালি বচন, আর বসে বসে অন্ন ধ্বংস। রোসো সব তাড়াবো। ধর্মের নামে পরচর্চা। নিষ্কর্মা। হাবাতে।"

"কি করে বসে বসে দিবারাত্র জাবর কাটছে, বলো দেখি? লজ্জাও নেই। ছ্যা!"—প্রথম তরফ। দ্বিতীয় তরফ।—"কি করে গুরুর নামে স্বার্থ-সিদ্ধি, ভোগ-পরিতৃপ্তি, জাল-জুয়াচুরী, ঠগবাজী করছে বল দেখি? ওরে কর্মের দুখীরাম এই কি তোমার কর্মযোগ?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিষ্কামকর্মী বা ধ্যান-সাধন-শ্রবণ-মনন-সম্বল যিনি—দুজনেরই চরিত্র কষ্টিপাথর। পরিচয় পত্র। তা হতেই জানা যাবে, তাঁহারা আপনাপন আদর্শে খাঁটি কি না। আত্মম্ভরিতা বাড়ছে না কমছে, তাহাও দেখিতে হইবে।

নবজাতি-সংগঠনের বিজয়-বিষাণ দেশে দেশে বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, যেখানে যে পৈঠায় এই গঠন-প্রক্রিয়ার ব্যক্তিগতভাবে শেষ সীমানা, যার বাড়া আর গড়িবার কিছু থাকে না, তার কথাও কইতে হবে। কারণ, অনন্তকাল ব্যক্তিগতভাবে গড়িতে থাকিলে ত চলিবে না। গঠন-ক্রিয়া—মোটের উপর মায়ার মতই অনাদি। কিন্তু, ব্যষ্টির পক্ষে সান্তও বটে। এক জায়গায় তাহাকে শেষে থামিতেই হইবে। সেখানকার কথা এসে পড়া শেষে অনিবার্য। চলিয়া চলিয়া পা ত একদিন ভারিবেই। তখনই আমার বিশ্রামের পালা। চলার তালে চিরসোম। শিক্ষাক্ষেত্রে নয়া বাংলার দাতাকর্ণ স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়, একবার ব্যবহারাজীবদের এক আসরে, উচ্চ আদর্শবাদ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন।—"For believe me, you cannot fall into the habit of prizing low and gross ideals without suffering deterioration in your intellectual as well as moral fibre"—স্থূল নীচু আদর্শকে কদর করতে আরম্ভ করলে, তোমাদের মানসিক ও নৈতিক উচ্চতা ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে বাধ্য।—হে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামে উৎসৃষ্ট নব্য-সমাজ, আমাদেরও এ কথা ভুলিলে চলিবে না। তবে পরমহংসদেব যেমন বলতেন,—"অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এ ভাব বুঝিতে পারিবে। ন মণ তেলও পুড়্‌বেক নি, রাধাও লাচবেক নি।"

রাজনৈতিক অধিকারের জন্য চেষ্টা কমাইলে চলিবে না। কারণ জাতিহিসাবে

অনেক কিছু উহার উপর নির্ভর করিবে। আবার শুধু উহা হইলেই চলিবে না। সামাজিক—অর্থ নৈতিক, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পথও সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ত করিতে হইবে। আজ দুনিয়ার চারদিকে রাজনৈতিক স্বাধীন দেশগুলির প্রতি চেয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে—"ততঃ কিম?"—শঙ্করের এই চিরন্তন প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে বাধ্য। আন্তর জীবনের পূর্ণতা সম্পাদনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। স্বাধীনজাতিদের ভিতর য়ুরোপে যে অগ্নিকাণ্ডটা হইয়া গেল, তাহা কি অন্তরের শান্ততা, তুষ্টি, পূর্ণতার পরিচায়ক? পৃথিবী লুটে খাবো একাই, আর যেন কেউ তার ভাগ না পায়, দুর্বলগুলিকে ছলে বলে কৌশলে পিষে ফেল্‌বো। নরহত্যাটা কিছুই নয়—লড়ালড়ি, জৈবত্বের দিক দিয়ে জৈবজ প্রয়োজন। বিজ্ঞানে বলে—Biological Necessity—না মারলে, বাঁচা যায় না। ইত্যাদি।—

সমস্যাও অনন্ত। মহাজন-মজুরে দুনিয়া জুড়ে বিসম্বাদের বাঁশী বাজিয়ে তুলেছে। এর সমাধান—adjustment—কোথা?

আসল কথা, সমাজজীবনের সু-স্থিতির জন্য বিষয়-চর্চা, জড়-পূজা ও নির্বিষয়ত্ব দুই-ই চাই। দুইয়ে মিলে তবে ওজনের পাষাণ-পাল্লা ঠিক রাখবে —নৃশংসতার দিকে ঝুঁকে পড়তে দেবে না। পুরাপুরি নির্বিষয়ত্বে পৌছানো কঠিন। সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার উচ্চাদর্শ জীবনে ফলানো চিরদিনই বিরল। তথাপি এইকল্পে যতটা চেষ্টা হয়, ততটাই মোটেরউপর ব্যক্তি ও জাতিগত উভয় জীবনে কল্যাণপ্রদ। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়সে মহতো ভয়াৎ। পৈশাচিক হিংসাদ্বেষরূপ মহাভয়ের তাণ্ডব লীলা হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে রেহাই। এরূপ হইলে সমাজজীবনের তাল ও ধাত—উভয়ই ঠিক থাকে। নতুবা বেতালের দিকে, অসাম্যের দিকে, অশুভের দিকে, একপেশে হয়ে পড়ে। আজ দিকে দিকে দেশে দেশে জাতি সকলের মানসিক ও আধ্যাত্মিক অস্বাস্থ্য ঘটিয়াছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরমবৈদ্য। তৎপ্রতিবিধানার্থে, সেই স্বাস্থ্য আনয়নার্থ, তাঁহাদের আগমন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটি কথা

Bring forth the *power of the Spirit* and pour it over the length and breadth of India and all that is necessary will come *by itself*. The Spirit is omnipotent. *Say not, you are weak.*

আত্মশক্তি পরিস্ফুরণ করো। আর সেই শক্তিই ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঢেলে দাও। যা কিছু তারপর দরকার, তা' আপনা আপনিই এসে যাবে। আত্মা সর্বশক্তিমান্। বলিও না, তোমরা দুর্বল।

সমগ্র জীবন দিয়ে এই আত্মিক শক্তি—আত্মার মহিমাকেই মানুষের সমাজে শ্রেষ্ঠ পূজা-অর্ঘ্যের আসনে বসাইয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চলিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের নাম লওয়া, মানুষের জীবনে সার্থক হউক। পারছি না, আরও শক্তি দাও—এই প্রায়শ্চিত্ত বুদ্ধি নিয়ে সংগ্রাম করাও শ্রেয়। অন্তর্যামীর কাছে, দয়াল রামকৃষ্ণের করুণার রাজত্বে, তা হ'লে কৃপালাভ ও সঙ্গে সঙ্গে নবশক্তির উন্মেষ ও সঞ্চার হয় ব'লে—সাধুমুখে শুনেছি। কিন্তু দাম্ভিকের রেহাই নেই।

নানা কর্মের ফেরে, পরিশেষে আক্কেল জন্মাবার জন্যেই, নিজেকে (এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে) জড়ানো দরকার। 'বকধার্মিক' সাজিলে চলিবে না। পরমহংসদেবের অনুপম ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—এ'তো সাধু 'সেজে' বসে থাকা নয়। অভিজ্ঞতাই বড় খাসা, সুন্দর, সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। পরম মূল্যবান্ রত্ন। না ঠেকিলে ঠকিলে, বুদ্ধি গজায় না। আবার শুনিয়াও শিখিতে হয় বটে। কাম্যকর্মরূপ মরীচিকার পাছে পাছে ছুটাও চাই। আর হে ভগবন্! আমার বাহিরে এত কাজকর্ম, যা তোমা থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে কমিয়ে নিয়ে, তোমার কোলে টেনে লও,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এ প্রার্থনা করতেও শেখাচ্ছেন।

মরীচিকা সত্যেরই আভাস। তবে প্রকাশের তারতম্য আছে। তত্ত্বের দিক দিয়া বলিতে গেলে (কর্ম-কৌশলীর দৃষ্টিতে নয়) বলিতে হয়, সর্ববিষয়েই —যাবৎ বিষয়েই সেই চৈতন্যের মহিমা বিঘোষিত হইতেছে। আমাদের চোখ

নাই, বুঝিতেছি না। মহাজনদিগের জীবন দেখিয়া ইহার সত্যতা ধারণা হইয়াছে। সর্বত্রই সেই পূর্ণ সত্যেরই আভাস। পদে পদে—"ন ইতি ন ইতি" ক'রে চিরজীবন সবকালে সবদেশে সব মানুষ জীবনের তীর্থাভিযানে লোকতঃ—কখনও এগিয়ে পড়েছে, কখনও খানিকটা টাল খেয়ে হটে, পিছিয়ে পড়ছে। চলেছে সবাই,—অবিরাম স্রোতের গতি বেয়ে। সময়ও নাই, সাবকাশও নাই। ভাবনায় কিছু হয় না। আবার না ভেবেও উপায় নাই। সাবধানের মার নাই। আবার মারেরও সাবধান নাই। মায়ার মজার ঘূর্ণিপাক। শাস্ত্র চরমে বলছেন, সর্ব বাসনা, এষণা, সর্ব কামনার নিঃশেষ লয় না হ'লে পূর্ণচ্ছেদ নাই। যতক্ষণ না মনের মত গড়ন হবে ততক্ষণ এই সৃষ্টির নির্মম, কিন্তু পাকা কুম্ভকার, কোটি কোটি জীবাত্মাকে তার সদাই-চলতি চাকে চড়াবে, পাক খাওয়াবে। খুব ঘুরুবে। ছুটি নাই। স্বামীজী বলছেন,—ever *running never* reaching—খালি ছুটাছুটি। যেন কখনও নাইক বিরতি। ভেবেছি ঐশ্বর্য হ'লে সুখী হব। তারপর খুব খেটেখুটে, ঐশ্বর্য হ'ল। দৈব অনুগ্রহ হন। তৃপ্তি কিন্তু সুদূরেই রইল। বললাম, আপনার মনকে, বড়ই বিরক্ত হ'য়ে,—ঐ ওপাড়ার লাখপতিটার সামিল—আণ্ডিল আণ্ডিল রূপেয়া যেদিন আসবে, সেই দিনই হব সুখী। চার মহল বাড়ী। দেউল। দেউড়ী। সান্ত্রী, সেপাই। লোক লস্কর। পণ্ডিত। ভাঁড়। সভাসদ। ভার্যা। প্রজা। মজা। পুষ্করিণী। মরাই। অন্ত নাই। পুত্র। কন্যা। তাও হয়ত হ'ল। রূপে গুণে—মা লক্ষ্মী-সরস্বতী, জমজমাট হয়ে ঘরে প্রতিষ্ঠিত। বেশ আছি। সুখে আছি। সমাজে অনেকের ওপর ওপোর ওয়ালা হয়ে আছি জারিজুরি করবার সাবকাশ হয়েছে। কিন্তু, কি যেন উঁকি মারছে। তথাপি "অন্তর না তিরপিত ভেল।" চির অশান্ত চিত্ত। শরীরচর্যাই করে আসছি। মনের চর্যা কোন দিনই করি নি,—তার ধার দিয়েও যাই নি, পাছে সৎসঙ্গের হওয়া লেগে ভাল হয়ে যাই। হয়ত, শেষতক্ জরাই তিলে তিলে ধীরে ধীরে উঁকি মারলে। নিশ্চিন্ত হবার জো নাই। একদিন ছেড়ে যেতে হবে, চিন্তা পর্যন্ত করতেও ভয় এল।

আজ ভাবছি, এটা হাতে পেলেই ব্যাস্। মার দিয়া কেল্লা। কিন্তু ভিতর হ'তে বারে বারেই বলে দিচ্ছে, রে মূর্খ! ন-ইতি, ন-ইতি,—এগিয়ে চল।

বিবেকানন্দ বলছেন, That *freedom*, friend! This world, nor that can give—সখাহে, সে মুকতি কোথা পাবে? ভূর্ভুবে দানিতে নারিবে॥ আবার বলেছেন, পরম উৎসাহ-প্রদীপ্ত হ'য়ে—Stones and trees ne'er

break the Law but stones and trees remain. বৃক্ষ কিরে কভু ভাঙে বিধাতার বিধি? নিসর্গেরে—পাষাণে কি টুটে নিরবধি? "ভ্রান্তিরূপেণ যা সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।" য়ুরোপের উনবিংশ শতাব্দীর নব কল্পনায় রঙীন, বেদান্ত চিন্তায় অনুপ্রাণিত কবি রবার্ট ব্রাউনিং মানুষকে, সৃষ্টিনাট্যের এক অতি বড় অংশ অভিনয় করিবার জন্য বিধিকর্তৃক বিনির্বাচিত জ্ঞানে, তার সব স্খলন-বিচ্যুতির রক্তমাখা পথের বুকের উপর দাঁড়াইয়া, পরম সাহসের সহিত তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—ওরে অবুঝ! বারে বারে ভুল করার অধিকার——এ তোমার। নহে অন্যজনার। Irks *care* the cropful bird? Frets *doubt* the maw-crammed beast? যে পাখিটা পেট ভরে গিলেছে, সে কি অন্তরের কোন চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করে? না,—যে জানোয়ারটা ভরপুর খাদ্য পেয়েছে, সে কোন আন্তর সন্দেহ দেখায়?

আমরা অদ্বৈত-বেদান্তবাদী। বিবেকানন্দের ভক্ত। আমরা সকলেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ চিদাভাস হতে পূর্ণ চিৎস্বরূপেই অভিযান করছি, নিঃসন্দেহ। এ পথে সুনীতির সমর্থনও অবশ্যম্ভাবীরূপেই আসিয়া পড়িবে। দুর্নীতি আর অদ্বৈতবাদকে মূর্খে এক বলিয়া জানে। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, শুভের, সতের ভিতর দিয়াই, চেষ্টা চালাইতে হইবে। দাম্ভিক, নির্লজ্জ বদমাসের কথা স্বতন্ত্র। সাধক অবস্থায় পবিত্র না হইলে অদ্বৈতে পৌছান যায় না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সত্যজীবনই ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অ-চিৎ হইতেই আমরা চিৎ-এ চলেছি। প্রথমে যেমন উপনিষদ উল্লেখ করেছেন—কেউ ভাবছেন, শরীরই আত্মা। স্বতন্ত্র এ ছাড়া কিছু নেই। না,—মনই আত্মা? তারপর—তাও নয়। প্রাণ? তাও নয়—বুদ্ধি? তাও নয়,—এসব কিছুই নয়। ইত্যাদি। ধাপে ধাপে। "অন্ধকার থেকে আলোকে" নয়—এক হিসাবে। ছোট আলো থেকে, উজ্জ্বলতর আলো। আরো, আরো—আলো। We travel not from darkness to light, but *from light unto more light*—সুন্দর কথা। মরীচিকা কচুরীপানার মতো মানুষের মনের খাঁজে খাঁজে, অলিতে গলিতে, নিভৃতে ক্রমাগত জন্মাচ্ছে—গজাচ্ছে। ফলতঃ সত্যকেই শেষে বড় করে ধরবে বোলে। নিজের বেয়াদবী সমর্থন ও প্রচারের জন্য নয়। মোক্ষরূপ মার্তণ্ডসূর্য নানা কাম্যকর্মরূপ কালো মেঘগুলোকে প্রকাশ কোরে, তাদের দৌড় কতদূর, তা সপ্রমাণ কোরে, শেষে একমাত্র নিজেই প্রকাশিত রহেন—ভাস্যং মেঘাদিকং ভানু র্ভাসয়ন্ প্রতিভাসতে। তথা স্থূলাদিকং ভাস্যং ভাসয়ন্

প্রতিভাত্যয়ং। শঙ্করের—অদ্বৈতানুভূতিঃ, ৬৩ শ্লোক। তখন নানা কাম্যকর্মের মেঘ কাটিয়া যায়। আত্মাই একমাত্র রহেন।—স্বাধীন, স্বতন্ত্র, নিরঙ্কুশ, নির্মুক্ত, নির্মল, নির্লেপ। অলেপ।

সেই জন্য মিথ্যাও এক হিসাবে সত্যের দৌবারিক। মানুষকে বলিও না, যে সে পাপী। বলো, সে দেবতা। Say not man is a sinner. Tell him that he is divine. Even if there was a devil, it would be our duty to *remember* God *always* : and not the devil. শয়তান বোলে কেহ থাকলেও, আমাদের কর্তব্য, সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণে রাখা। কারণ শেষে ভুলগুলির অসারত্ব ও অন্তঃসারশূন্যত্ব বুঝে নিয়ে, এমন এক অবস্থায় মানুষ এসে পড়ে যে, তার পক্ষে নিরপেক্ষ সত্যকে (*Absolute Truth*) বুকে জড়িয়ে ধরা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। জেনেছি তোমায়, বুঝেছি তোমায়, পেয়েছি তোমায়, হে প্রিয়! এতদিন ফাঁকি দিয়েছিলে! আমাদের চিত্তকে যিনি অনুক্ষণ, অনন্ত লীলার মাঝে জাগরিত করছেন, সেই প্রেমময় ভগবান—জীবকে অনন্তকাল নিম্নভূমিতে থাকিতে দিবেন কি ? তাঁহার দয়া হইলে বা (জ্ঞানীদের মতে) ঠিক কাল আসিলে—মোহ টুটিয়া যায়। তখন সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম ভূমিকা-গুলিতে উঠিতে বাধ্য হই। স্থুল শরীরের এলাকা পার হইয়া সূক্ষ্মরাজ্যে প্রবেশা-ধিকার ঘটে। তারপর কারণশরীর। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্মাত্রার উপাদানে গঠিত। ক্রমে আরও উচ্চে—তুরীয়ে। চিৎস্বরূপে শেষে লয়। মনোনাশ, বাসনাক্ষয়।

শুদ্ধ ভক্ত ও শুদ্ধ জ্ঞানীকে পরমহংসদেব একই আসন দিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, দ্বৈত দিক হইতে জীব যেদিন নিজেকে "নিত্য কৃষ্ণদাসরূপে" বুঝিতে পারে, সেদিনও "কাঁচা আমির" হাত হইতে মুক্তিরই দিন। ভক্তের বিরাট তুমি আর জ্ঞানীর সোঽহঃ—পাকা আমি বা বিরাট আমি—একই বলিয়া বোধ হয়। এই যোগের তত্ত্বকেই, বেদাদিপ্রমুখ জ্ঞানশাস্ত্র কথিত বার্তাকেই, লোকপ্রিয় তন্ত্র—কুণ্ডলিনীশক্তির ঊর্ধ্বগতির দৃষ্টান্ত দ্বারা, চক্রের পর চক্র, পদ্মের পর পদ্ম চিত্র দেখাইয়া—সুবোধগম্য করিয়া, সহজ ধরা ছোঁয়ার ভিতর দিয়া, অতি সুষ্ঠু সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। "ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ সংস্থিতাং। শ্যামাং সূক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং। সৃষ্টিস্থিতি লয়াত্মিকাং। বিশ্বাতীতাং জ্ঞানাতীতাং। চিন্তয়েৎ ঊর্ধ্ব-রূপিণীং॥"

এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হয়, সময় না হইলে কাহারও বুঝিবার অধিকার নাই। উপায় নাই। "কালেন আত্মনি বিন্দতি"—গীতা

অরণ্যে রোদন করিয়া, ভাবভাঙ্গিতে পরমগুরুর নিষেধ। এই নৈষ্কর্ম্যাদর্শে বা নিষ্কাম কর্ম, নিষ্কাম ভক্তি-আদর্শে পৌঁছাইয়া দিবার সহায়তাতে, কর্মের, ধ্যানের, বিচারের, জপের, ভজনপূজার, সেবার—সব সার্থকতা, প্রয়োজনীয়তা। চিরশান্তি, ব্রহ্মজ্ঞান বা সেই 'অবাঙমনস গোচরং'-কে, সেই অব্যক্তকে যে আখ্যাই দেই না কেন, তিনি বা উহা অপ্রমেয়—তর্কের বাইরে। দৃক্ বস্তু। তাতে না উপনীত হলে বা চলিত কথায়, তা না পেলে, নিস্তার নেই। ভগবানের ভাষায়—"প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং।" বিবেকানন্দও বলছেন——"In books and temples vain thy search." বন্ধু হে! বৃথা অন্বেষণ তব। দিবে না দেউলে কিম্বা কেতাবে। ভারতীয় চিন্তার এই অত্যুচ্চ শিখরের সহিত যোগ অক্ষত রাখিয়াই বাংলার দুলাল, বিজ্ঞানরসিক আচার্য শ্রীজগদীশ From the Vioced to the Unvoiced 'ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত'—আখ্যা দিয়া, এই বাণীকেই স্বীয় বিজ্ঞানমন্দিরের প্রধান পুরোধার পীঠস্থান হতে সর্বপ্রথম বিঘোষিত করেছেন। ভারতের শুভ্রশির উপনিষদের সাধনাজাত উপলব্ধির দার্শনিক ভিত্তির উপর, তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। বিজ্ঞানাচার্যের সহিত ভারতের পুরাতন অধ্যাত্ম-ধর্মাচার্যের এই কোলাকুলি বড়ই সুমিষ্ট—নয়ন-মনোরম। সেই একং—একত্বের মহাসাগরই যে সব সাধনের শেষ। "রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ-ঋজুকুটীল-নানাপথজুষাং নৃণাং একো গম্যস্তমসি পয়সাং অর্ণব ইব।" (শিব মহিম্নস্তোত্র) রুচিভেদে আঁকা বাঁকা সব পথেরই গম্য—তুমি, বিভু—ভগবান। স্রোতস্বিনী সমূহের যেমন মিলনভূমি মহাসমুদ্র। গৌণভাবে —বহু আছে, থাকিবে, ছিল। মুখ্যভাবে সেই পরম অজ, অব্যয়, নির্বিশেষ—একত্বই সর্বপ্রচেষ্টার সর্ব কর্মের তাৎপর্য—পরম গন্তব্যস্থল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লৌকিক আচার ও সন্ন্যাস

বিভিন্ন দৃষ্টি, বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন আধার, বিভিন্ন মত। ইহা লইয়াই জগৎ। এই বৈচিত্র্যই সংসার, সমাজ, সঙ্ঘ।

কেউ বলছেন—"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চেলাদের মানি। কারণ তাঁদের সর্ব জাতিতে মৈত্রীভাব আছে।"—"তাঁরা যে সব দেবদেবীর পূজো বজায়

রেখেছেন, সেইটেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।"—"তাঁদের সাধন-তপস্যার জীবনটা বেশ।"—"তাঁদের সমাজসেবা, আর সাধারণের টাকাকড়ির সুন্দর হিসাবপত্র রাখারূপ সদ্‌গুণের, গোলাম্ আমরা। ভারতের নবজীবনে সেই জন্যই এঁদের একটা মস্ত স্থান। তাঁহাদের প্রতিমাপূজা বা দৈবীতত্ত্ব অর্থাৎ রামকৃষ্ণ অবতার। আর তাঁর শিষ্যেরা কেউ কেউ ঈশ্বরকোটি, কেউ কেউ জীবকোটি ইত্যাকারক কথাবার্তা—আমাদের রুচিসঙ্গত, মনোমত নয়। জীব-সেবাই শিবসেবা। (যদিও আমরা শিব মানি না, তবে শিবের ছবি, শিবের কল্পনাকে পেয়ার করি। এবং যদিও যাদের কাছে আমাদের সাময়িক পত্র বিক্রয় হবে তাঁরা সব অনেকেই শিবপূজক। শিব মানুষের একটা কুসংস্কার বিশেষ।) আমাদেব কৃষ্টি, সংস্কৃতির ভাষা অনুযায়ী বলতে গেলে বলতে হবে, এঁদের মানবপ্রীতি চমৎকার। ঈশা কেমন বলেছেন—In as much as ye have done it to these very lowest of my brethren, ye have done it unto me. পতিতের জন্য যা করেছো, তা আমাতেই পৌঁছেছে। পতিতের ভগবানের এই বাণী বর্ণে বর্ণে এঁরা সফল, সার্থক করবার চেষ্টা করছেন।" আবার কেউ বা বলছেন, "এদের ভেতর সব ভদ্র, লক্ষ্মীমন্ত ঘরের লোক আছেন। লেখাপড়াও সব জানেন। শাস্ত্রবিৎ।" আবার একজনে ব'লে উঠলেন—"ও সব থো করে গো। থো করো। এঁদের হৃদয়ের বিকাশই বড়।" ইত্যাদি। নিছক দোষ দেখেন, তাও আছেন। বহুতে, বহুরূপীর বহু রঙ্ দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন ও ভাব আশ্রয় করিয়া যাঁহারা চলিতেছেন, তাঁহাদের ভিতর যে-কোন এক দিক দিয়া ঠিক সাঁচ্চা জিনিস ফুটিলেই মানুষ তাঁহাদের মানতে বাধ্য।

গৈরিক বা লাল বসন যাঁরই অঙ্গে উঠেছে, তাঁকেই লালেতরেরা সময়ে সময়ে পরিপূর্ণ দেখতে চান। লালের সম্মান সাধারণ অশিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে খুব। গৈরিকধারীরা যে অনেকেই সাধক—গৈরিক যে গুরুদত্ত রক্ষাকবচ, সে কথাটাও বিচারের সময় ভুললে চলবে না।—কেন আপনারা এইটে খাবেন? এইটে পরবেন? আপনাদের কেন দোষ থাকবে, রাগ থাকবে—এসব কি খাজা, কাঁচা লোকেরই প্রশ্ন?—আমরা সব কিছু করবো। আর তোমার পান থেকে এতটুকু চুন খসবার জো নেই। আপনি সন্ন্যিসি, আপনি ঘুমোবেন কেন? আপনাদের "গুড়াকেশ" হওয়া উচিত।—একব্যক্তি বড়ই বিজ্ঞভাবে ব'লে উঠলেন। আপনি

যদি সাধু, আপনার দৃষ্টিশক্তির বিকার হবে কেন? ইত্যাদি। অ-সন্ন্যাসীতেই সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা ক'রে থাকে। কোন জায়গায় প্রশ্নবৃষ্টির পিছনে চটুলতা, নিছক দম্ভ। কোথাও অনুসন্ধিৎসা। যেখানে শেষোক্ত ভাব, তথাকার অবগতির জন্য এখানে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

অধ্যাত্ম ধর্ম সবটাই খাওয়াতেই নয়। বস্তুগুণের তারতম্য অনুসারে খাদ্য-দ্রব্যের উত্তেজকতা অনুত্তেজকতা আছে। দুষ্প্রাপ্য সুপ্রাপ্যের কথা আছে। দেশ-কাল-পাত্রের, নিজ নিজ কর্মের সার্থকতা আছে। মাত্রা, সহনশীলতা, অভ্যাস——এ তো ইহার ভিতর আছেই। ফস্ করে মন্তব্য হবে না। ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনের তারতম্য আছে। সাধারণ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও— এতগুলি কথা। আবার আমাদের চক্ষে জীবন্তশাস্ত্র—শ্রীপরমহংস-বিবেকানন্দের উপদেশ-আদর্শ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাম-উপভোগ পরিত্যাগের উপর সর্বাপেক্ষা বেশী নজর দিতে বলিয়াছেন। তাঁর উক্তি আছে—যে—ও সুখ ত্যাগ করতে পরে, তার সবই ত্যাগ হোলো। এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক উঠিলে আমরা মুখ্য কথাটি ভুলিয়া যাই। ঈশ্বরপ্রেম, বৈরাগ্য, সর্ব জীবে মমতা, নিঃস্বার্থপরতা—এসব, যে আহারের ফলেই মানুষে আসুক না, তাঁকে অবনত মস্তকে মান দিতে হবে। ছুঁই-ছুঁই-সর্বস্ব পল্লীবাসী নরনারী জানেন কি, পরমহংসদেব স্পষ্ট বলিতেন—গোমাংস খেয়ে যদি হরিভক্তি থাকে, তো তা হবিষ্যান্নের তুল্য? আর হবিষ্যান্ন খেয়ে, যদি হরিভক্তি না থাকে, তো তা-ই গোমাংসের তুল্য? পরমহংসদেবের সমস্ত বস্তুর— মূল্য-নির্ণয়ের তৌলদণ্ড, ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের দিক হইতেই। তাই এইরূপ নির্ভীক সাফ্ জবাব।

আমাদের বোঝা উচিত, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কামাসক্তিবিহীন, কাঞ্চন-মোহমুক্ত, ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনের মূলটি ছাড়িয়া, শুধু গাল পাড়িলে, ফিট্ফাট সাজিয়া থাকিলে, রেলষ্টিমারে ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে চাপিলে, আর আমিষ আহার করিলেই, তাঁদের অনুবর্তী হওয়া যায় না। আহার বা পোষাক বা শারীরিক স্বচ্ছন্দতা প্রয়োজন মাফিক্, মাত্রা মাফিক্, অভ্যাস অনুযায়ী লইতে হইবে। এইগুলি গৌণ। দেশ কাল পাত্রের বিচার চাই। ভক্তি বা জ্ঞানই মুখ্য। তাহা দেখাইবার জন্য বা আমাদের সাহস দিবার জন্যই বোধ হয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ "শুঁট্কো সাধু" সব সময়ে সাজেন নাই। কিন্তু তাঁরা কঠোরতাও যথেষ্ট করিয়াছিলেন। আর পরমহংস ইহাও বলিতেন যে, পোষাক-বিশেষ পরিলে

স্থানবিশেষে যাইতে ইচ্ছা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন তাঁহাদের—"যখন যেমন, তখন তেমন"-ভাব খুব ছিল। ভোগ না পাইলে ক্ষোভ, বা পাইলে স্পৃহা-লালসা, তাঁহাদের চরিত্রে ছিল না। ভারতের বহু প্রদেশের বহু লোকে নিরামিষ খান। সকলে কামকাঞ্চনত্যাগী হন না। বিবেকানন্দস্বামী পরিব্রাজক অবস্থায় দুইচার ক্ষেত্রে মাছ মাংস খাইলেও সাধারণতঃ এইকালে নিরামিষ। আর আমিষ পাওয়াও যাইত না; অনেক ক্ষেত্রে। অন্য সময়ে খাইতেন। মাছ মাংস খাইয়া যদি লাখ বিবেকানন্দ সৃষ্ট হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। আমিষ আহার সদোষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ উদ্ভিদ-শরীর অপেক্ষা প্রাণীশরীরে প্রাণের প্রকাশ বেশী। সেজন্য সচরাচর আমরা উদ্ভিদকে 'জড়' আখ্যা দিয়া থাকি। আর যদি আমিষ বা নিরামিষ আহারবিশেষে, ত্যাগী সৃষ্ট না হয়, তো কিছুই কিছু নয়। একটি সংস্কৃত শ্লোকে আছে, পায়রা মাংস খায় না, কিন্তু ঘন ঘন রমণ করে। সিংহ মাংস খায়। কিন্তু দীর্ঘকাল অন্তর রমণ করে। আধারের তারতম্য সর্বত্র স্বীকার্য।

মূল ভুলিলে, উন্মূল হইতে হইবে। এমন দিনকাল এসেছে যে, লোকে আর নিজের দুর্বলতা সমর্থন-জন্য, মহতের দোহাই দেওয়া শুনে না, মানে না। ইহা ভালই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসের আদর্শ বিভাগ

অতঃপর সন্ন্যাসীদিগের যে শাস্ত্রীয় শ্রেণী-বিভাগ মোটামুটি আছে, সে বিষয়ে বলিতে চাহি। এই বিষয়টি নিবদ্ধ করিতে গিয়া, মদীয় অধ্যাপক পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের শাস্ত্রসারমথিত পয়ার গীতা (২য় সং) হইতে ইঙ্গিত লইয়াছি।

সন্ন্যাস দ্বিবিধ। মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য দুইরূপ—বিদ্বৎ ও বিবিদিষা। যাঁহারা সিদ্ধ তাঁহারাই বিদ্বৎ-পর্যায়ভুক্ত—সর্বশ্রেষ্ঠ। পরমহংসদেব কথিত—জগদ্গুরু। বিধি-নিষেধের পার। জীবন্মুক্ত। সর্ব লিঙ্গ বিবর্জিত। তিনি যখন যেমন, যেভাবেই থাকুন না কেন—"সর্বথা বর্তমানঽপি" (লোকদৃষ্টিতে যতই কটু হউক)

সংযমে পাকাপাকি সুপ্রতিষ্ঠিত—তিনিই বেদকে অবেদ করেন। তবে, বেচালে পা তাঁর পড়ে না। বাহির হইতে, দুষ্টে বা অদূরদর্শী মানবে তাঁর নিন্দা করিতে পারে। কিন্তু তিনি সবের পারে। ইহারা চার থাকের। প্রথম—কুটীচর্ক। যিনি এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। (কুঠিয়ায় বা কুটীরে কি ?) দ্বিতীয়—বহূদক"। অনেক জায়গার উদক, জল যিনি পান করেন, পরিব্রাজক—ঘুরে বেড়ান। পাছে মায়া পড়িয়া যায়, দীর্ঘকাল একস্থানে থাকেন না। "বহতা পাণি রমতা সাধু।" "ঘরবাড়ী"-বুদ্ধি গজাতে পারে না। অনিকেত—স্বতন্ত্র। তারপর আছেন তৃতীয়—হংস। চতুর্থ পরমহংস। এই দুই শ্রেণীতে, জ্ঞানের সম্ভব উনিশ-বিশ বা সামান্য তারতম্য আছে। আমাদের উপনিষদাদি জ্ঞানশাস্ত্রে 'হংস' কথাটিকে জ্ঞানের প্রতীকরূপে লওয়া হইয়াছে। হংসের গতি ও কার্যবিধি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, দুধে জলে মিশাইয়া দিলে, হংস দুধটুকু শুষিয়া খাইতে পারে। জল পরিত্যাগ করে। হংসৈ র্যথা ক্ষীরং ইব অম্বুমধ্যাৎ। নীতিশাস্ত্রে এই উপমাটি পাওয়া যায়। সেই মতই কি ইহারা নিত্যানিত্য বিবেকে সদা সজাগ, সু-প্রতিষ্ঠিত ? পরমহংসদেব সোজা বাংলায় বলেছেন—"আর হাঁসের গতি দেখেছো ? একদিকে—সোজা—চলে যাবে।"—একদিকে। সোজা—সুধীর—আদর্শৈকগতি। পরমহংসত্ব সর্বোচ্চ পদবী। হংস ও পরমহংস—এই দুই নামে—একের নিগুর্ণ ও সগুণের ভিতর অনবরত গতিবিধি, আর অপরের নিগুর্ণে স্থিতি,—ইহাই ইঙ্গিত করিতেছে কি না, ভাবিবার বিষয়। পরমহংসদেব এ বিষয়ে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ব'লে গেছেন—"এখানকার (তাঁর নিজের) অবস্থা (দর্শন, অনুভূতি, জীবনোদ্দেশ্য—ইত্যাদি) শাস্ত্রকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।"

যে নিগুর্ণে অবস্থিতি জীবপক্ষে একুশ দিনের বেশী নাকি হয় না, তিনি তাহাতেই ছয়মাস কাটাইয়াছিলেন। এবং তৎপরে জগদম্বার ইচ্ছায়, লোক-শিক্ষাকার্যের যন্ত্র-স্বরূপে নামিয়া আসিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার শরীর থাকিত না। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে একটি সন্দেহ ও তাহার নিরাস কিরূপভাবে আপনা আপনি হইয়াছে, তাহা বলিতে ইচ্ছা করি। পরমহংসদেবের উক্তির ভিতর আছে, "ঈশ্বরেচ্ছায় সব হতে পারে। তাঁর আইন, তিনি ভাঙ্গতে পারেন।" ইহা এক দিক। আর যুক্তি বলে, তাঁর আইনের কতটুকু অংশই বা আমরা জানতে পেরেছি ? পুরুষ-শরীর তীব্র চিন্তাসহায়ে স্ত্রীশরীরের ন্যায়—অধ্যাত্ম সাধনার জীবনে পুষ্পিত হয়। ঈশার ক্রুশবিদ্ধ, রক্তমাখা মূর্তির

একাগ্র ধ্যানে, তদ্‌ভক্তের শরীরেও রক্ত ফাটিয়া বাহির হইয়া থাকে,—হে যুক্তিবাদী, এই যে "প্রাকৃতিক" নিয়ম, ঈশ্বরের এই "নিয়মের" মহিমা প্রকট করিতে, ব্যক্ত করিতে একজন রামকৃষ্ণ পরমহংস বা একজন সাধু ফ্রান্‌সিসের আসা দরকার হইয়াছিল। সূক্ষ্মরাজ্যের যে সব বিধি, তাহার অভিব্যক্তি বুঝিতে হইলে, দেহযন্ত্রকে প্রস্তুত করিতে হয়। যোগশাস্ত্রে বলে, সুগন্ধকে "দেখা যায়"। তার "রূপ" আছে। বিজ্ঞানও বলছে আজকে—সুরের—শব্দের ছবি আছে! রাগ-রাগিণীর রূপ, সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনাকারীর নিকট সুপরিচিত।

কিন্তু স্বামীজী, পরমহংসদেবকে "বেদমূর্তি" বলিয়াও বাংলা মূল প্রবন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। শাস্ত্রের সহিত তাঁহার জীবনের অনেক কিছুর অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখা যায়। যে দুই-চারি স্থলে মিল দেখা যাচ্ছে না, সেই বিষয় লইয়াই এ প্রসঙ্গ। প্রথম সমাধান—এইমাত্র তাঁহারই কথায় ও প্রাকৃতিক "নিয়ম"-বাদচ্ছলে, ব্যক্ত হইল। দ্বিতীয়টি এই। বেদাদি শাস্ত্র, অপৌরুষের, বিরাট। ঈশ্বরের দ্বারাও প্রণীত নহে—উগরিত, প্রোক্ত, উজ্‌ঝিত। প্রলয়ের পর বার বার সৃষ্টি করিয়া সৃজনকর্তা এই বেদরূপ জ্ঞানরাশি কল্পে কল্পে দান করেন। ইহাই শাস্ত্র-উক্তি। সেই দিক দিয়া, বেদ অভ্রান্ত। অলৌকিক তত্ত্বে, অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু কথা হচ্ছে, কালক্রমে নানা রাজনৈতিক বিপ্লবের ওলটপালটের ভিতির দিয়া আসিতে হইয়াছে বলিয়া (বিশেষতঃ উত্তর ভারতে আক্রমণকারী জাতির পর জাতি—ধারাপ্রবাহের ন্যায় আসিয়াছে। দাক্ষিণাত্য এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে রেহাই পাইয়াছিল), ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, অমুদ্রিত প্রাচীন বেদবিদ্যা বহুশঃ লুপ্ত। যাহা বিদ্যমান, তাহাও সম্যক্ চর্চা অভাবে অনাদৃত। বহুশাখাসমেত বেদশাস্ত্র উদ্ধার অসম্ভব। প্রচলিত বেদে যে সব শাখার উল্লেখ আছে, সবগুলিই কোন একজনের সংগ্রহ আছে বলিয়া, শুনা যায় নাই। সুতরাং পরমহংসদেব যখন বলেছেন—"শাস্ত্রকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে—এখানকার (তাঁর) উপলব্ধি"—তাহা কি প্রচলিত, সচরাচর পঠিত, জ্ঞাতশাস্ত্রকেই লক্ষিত হইতেছে না? হয়ত অনন্ত বেদশাস্ত্রের লুপ্তাংশে বহু অনুসন্ধানে সে সব কথা বাহির হইতে পারে—কে জানে? কিন্তু সেগুলি পাবার আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই, ঐরূপ কথা বলিয়াছেন।

বিদ্বৎসন্ন্যাসের যে চারি শ্রেণীর কথা হইল, সকলের ভিতরই—আত্মা অকর্তা, —এ ভাবটি প্রকট থাকে। তাহার পর মুখ্যসন্ন্যাসের দ্বিতীয় স্তর। বিবিদিষা। "সাধক" অবস্থা। উচ্চে উঠিতে সচেষ্ট। কিন্তু দান, যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম বিবর্জিত।

ইঁহাদের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—এই ত্রিত্বই জীবনে সার হয়। পথের সম্বল। আত্মা যে অকর্তা—এই ভাবটিতে ইঁহারাও সুপ্রতিষ্ঠিত।

আত্মজ্ঞানের "বুড়ী" না ছুঁইলে বিদ্বৎসন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আবার তিনি জীবন্মুক্তও বটে। প্রারব্ধবশে কিছুদিন নিষ্কাম কর্মের ঢেউ তাঁদের শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যায় মাত্র। সাপের খোলস যেমন হাওয়াতে উড়ে চলে, সেইরূপ। সর্বদা সুপ্রসন্ন—আনন্দময়। কোন আঁট তাঁহাদের থাকে না। তাঁরা নির্লিপ্ত। বিবিদিষা সন্ন্যাসী ব্রহ্মলীন বা পরমসমাধিস্থ হইবার পূর্বেই, প্রারব্ধবশতঃ যদি দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে আবার তাঁহাকে আসিতে হয়। কিন্তু "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" যোগভ্রষ্টের অভিজনম। শুদ্ধ লক্ষ্মীমন্ত ঘরে। ঋষিকুলে বা পবিত্র ধনীর গৃহে। ইহাই এতৎসম্বন্ধে গীতাবাক্য। যোগভ্রষ্ট অর্থ—যোগ-অসমাপ্ত।

মুখ্যসন্ন্যাসীদিগের ছয়টি লক্ষণের কথাও আছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা কখনও জড়বৎ, বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ। ইত্যাদি। তাঁরা 'অজিহ্ব' (ভালমন্দ ভাবিয়া যিনি ভোজন করেন না। জিহ্বা থাকিয়াও যেন নাই)। ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণের যোগের অভাবই, সম্ভব ইহার দ্বারা সূচিত হয়। ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু······অশ্নন······কুর্বন অপি ন লিপ্যতে। আবার হিত ও পরিমিত সত্য বাক্য বলেন। 'ষণ্ডক'—সদ্যজাতা, বৃদ্ধা বা যুবতী, এ তিনই তাঁহার কাছে সমান। দর্শনে নির্বিকার। ষণ্ডক শব্দের আভিধানিক অর্থ—নপুংসক। ঈশার ভাষায়—Eunuchs for His sake জন্মগত নহে ঈশ্বরার্থে কর্মগত নপুংসকত্ব! 'পঙ্গু'—ভিক্ষাতরে কিংবা মলমূত্র বর্জনার্থ যিনি যোজনাধিক গমন করেন না। 'অজগর' শ্রেণী। যাঁহারা অজগর সর্পের মত স্থির হইয়া পড়িয়া থাকেন। কাহারও ইচ্ছা হইল, তো আপনা আপনি আসিয়া আহার্য দিয়া গেল। 'অন্ধ'—বেড়াইবার সময় বা সচরাচর চক্ষু যাঁহাদের দূরে যায় না। আঁখির চঞ্চলতা নাই। মনোহর, অহিত, শোককর, হর্ষকর—সর্ববাক্য তাঁহার কাছে তুল্যমূল্য। সেইজন্য তিনি নির্বিকার বা 'বধির'। আবার তিনি 'মুগ্ধ'—বিষয় সামনে রয়েছে, অথচ ইন্দ্রিয় অবিকল, অবিকৃত। যেন তিনি সুষুপ্তবৎ। জগৎটাকে স্বপ্ন বোলে ঠিক ঠিক পাকা বোধ হইয়াছে। দুনিয়ায় কিছুই তাঁদের বিচলিত করতে পারে না, প্রকৃত বিবিক্ত। 'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন—রাজর্ষি জনকের এই বচন—বিষয়ে অনাসক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই দিক দিয়েই বুঝতে হবে। আবার সন্ন্যাসীর সাত গুণ আছে। মৌন, যোগ, তিতিক্ষা, যোগাসন, একান্তশীলতা, নিস্পৃহত্ব এবং সম ভাব।

সকল লক্ষণগুলির ভিতর হইতেই একটি তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁদের সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। ভারতবর্ষে এখনও এই ধাঁচের সন্ন্যাসী বর্তমান আছেন। ভাগ্যবানেই তাঁদের দর্শন পান। এইরূপ "পওহারী বাবা"-শ্রেণীর সাধু মহাত্মাগণ যদি হিমগিরির গহ্বরবিশেষে সাধন করিয়া দেহান্ত হন—সমাজের কাজ করতে না নামেন, তাহা হইলেও দেশের বায়ুমণ্ডলে অলক্ষ্যে তাঁহাদের সাধনজাত শক্তি সঞ্চারিত রাখিয়া সূক্ষ্মভাবে অশেষ জীবনিবহ-কল্যাণ সংসাধিত করেন। জীবসমূহকে তাঁহারা শ্বাসে-প্রশ্বাসে সন্তানজ্ঞানে সদা দূর হইতেই আশীঃসিক্ত করেন। স্বামীজী তাঁর জ্ঞানযোগে, বুদ্ধপ্রমুখ, অবতারকল্প লোকগুরু-দিগেরও উর্ধ্বে স্থিত, "অতিবুদ্ধদিগের"—দেব মানবদের (শুক, সনক যাহার সম্ভব দৃষ্টান্ত) কথা অতীব শ্রদ্ধার সহিত জগৎবাসীকে শুনাইয়াছেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

অতঃপর গৌণসন্ন্যাস। ইহা ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। কর্মের ফলত্যাগ করিয়া যে কর্ম-আচরণ, তাহাই এই গৌণসন্ন্যাসের মোটামুটি লক্ষণ। ইঁহারা যজ্ঞ, দান, তপ—এসবই চিত্তশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান করেন। চিত্ত-শুদ্ধির কামনা, কামনা নহে। পরমহংসদেবের ভাষায়, মিছরীর মিষ্টি, মিষ্টি নহে। হিংচে শাক, শাক নহে। অর্থাৎ অনিষ্টত্ববিহীন। ইহাই সাত্ত্বিক গৌণসন্ন্যাস। তাহার পর এই শ্রেণীর, রাজস সন্ন্যাস। কায়ক্লেশের ভয়ে যে কর্মত্যাগ, তাহাই রাজস। তারপর তামস গৌণসন্ন্যাস। ভিতরে বাসনা রহিয়াছে (? অথচ, সম্ভব কি আলস্যবশতঃ ?) তথাপি নিত্যকর্মত্যাগ। আপনা হতে খসিয়া পড়া নহে—টেনে ছেঁড়া। জ্ঞানীর ত্যাগ নহে। জ্ঞানের ভানকারীর ত্যাগ।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সাত্ত্বিক ত্যাগী, শুদ্ধচিত্ত হইয়া পরিশেষে গৌণকোঠা অতিক্রম করিয়া, পূর্বকথিত মুখ্যরাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হন এবং অভীষ্ট লাভ করেন।

ইহা অল্প কথায়, সন্ন্যাসের শ্রেণী-পরিচয়। কে কোন পর্যায়ভুক্ত, তাহা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের সাহায্যে নিজে নিজেই ধার্য করিতে হইবে। আচার্য শঙ্কর এই কথাই বলিতেছেন—এতৎ ন পরপ্রত্যক্ষং……নহি স্বাত্মবিষয়ংদ্বেষং আকাঙ্ক্ষাং বা পরঃ পশ্যতি। গীতাভাষ্য ১৪।২২। ইহা পরের প্রত্যক্ষযোগ্য চিহ্ন নহে·· আত্মবিষয়ক দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা অপরে কখনই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। অন্তর্যামী বিভুই আমাদের ভিতরের ভাব—ঈশ্বরমুখী, বা স্বার্থসিদ্ধির, শরীর পরিতৃপ্তির ভোগমুখী, কিনা তাহা জানেন। এবং আমরাও নিজে নিজে জানি।

পরণে রক্ত-শ্বেতে কিছু আসিয়া যায় না। এক জীবনে বা বহু জীবনে সকলকেই মুখ্য সন্ন্যাসমুখে আসিতে হইবে। সন্ন্যাসীর কর্মানুষ্ঠানে, আর সাধারণের কর্মানুষ্ঠানের তফাত মালুম হবেই। নয়ত শুধু খেতাব, নূতন নাম ও ভেকধারী হইলে কি হইবে?

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

নৈতিক সংযম—ভাবপরিশুদ্ধি

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশীর্বাদ-পূত দুইটি চক্ষের অভ্রান্ত দৃষ্টির আলোকে যাঁরা নিজেদের, ভারতের ও জগতের জীবন দেখতে আরম্ভ করেছেন, দেখতে শিখছেন—তাঁদের একটি বিষয় এখানে অনুধাবন করতে অনুরোধ করি। বিষয়টি বড়ই গুরু। আরোগ্যশালা নিয়েই থাকুন, বক্তৃতা নিয়েই থাকুন, শিক্ষাশালা নিয়েই থাকুন—ছেলেপিলে মানুষ করা বা সাংসারিক প্রচলিত বিষয়কর্ম নিয়েই থাকুন—আর দেশের রাজনীতিসেবা নিয়েই থাকুন, কারুরই রেহাই নাই। ওলটপালটভাবে রামকৃষ্ণের কয়েকটি উক্তি তুলিয়া ধরিতেছি।

সাধু সাবধান। সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। জিতেন্দ্রিয় হলেও, লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে না। বেশীক্ষণ নয়। ছোকরাদের সাধনার অবস্থা। এখন কেবল ত্যাগ।

মেয়ে ভক্তেরা আলাদা থাকবে। পুরুষ ভক্তেরা আলাদা থাকবে। তবেই উভয়ের মঙ্গল। মেয়ে ভগবতীর অংশ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে, সাধুর পক্ষে, ভক্তের পক্ষে—ত্যাজ্য। এই এক তরফ।

অন্য তরফ।—যথা—তোমাদের পক্ষে নির্জলা একাদশী নয়। তোমরা রসে বশে থাকো। দুটি একটি ছেলেপিলে হবার পর, ভাই-বোনের মতো থাকবে।

······বেশী এগোতে গেলে সংসার-টংসার ফক্কা হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ বা মেরীনন্দন পরিত্রাতা, পতিতপাবন শ্রীঈশার ন্যায় ব্যক্তি, যখন কথা বলেন, তখন সমস্ত প্রাণমন নিয়োগ করে, অতীব তীব্রতার সহিত সত্য ভাবগুলি শ্রোতা ভক্তদের মনে বসাইয়া দিবার উদ্দেশ্যই, তাঁহাদের ভিতর প্রবল ও প্রধান থাকে। ঈশা যেমন বলিয়াছেন—যা কিছু আছে, দান করে দাও।

আর আমার সঙ্গে ভিড়ে পড়ো।……কাজে করা তো বহু দূরের কথা, যে মৈথুন-চিন্তা করবে, আমি বলবো, নিশ্চয় বলবো, তার ওটা, ঐ কাজ করারই সামিল হোলো।……যদি ডান চোখটা অপরাধ করে, সেটাকে উপড়ে ফেলে দাও।……অর্থ আর পরমার্থ একসঙ্গে উপাসনা চলে না।……ইত্যাদি।

রামকৃষ্ণের উপরি-উদ্ধৃত দুই তরফের কথাগুলির ভিতর অধিকারবাদের উপর নজর, আদর্শ-পরিশুদ্ধির প্রতি একান্ত মনোযোগ এবং বেপরোয়া অতিশয়োক্তির ভাব হয়ত সবই রহিয়াছে। কিন্তু আসলে তিনি অযুক্তিকর কিছুই বলেন নাই। অক্ষরের বা ভাষার দিকে নজর না রাখিয়া, ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে যে ছোকরা সন্ন্যাসীকে অহরহ বিবসনা, নবীনা রমণী শ্রীঈশাণীর চিত্রপট দর্শন, ধ্যানধারণা, নামজপ করিতে হয়, তিনি ত রামকৃষ্ণের ভাবরাজত্বে প্রবেশ করিতে পারেন না। কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁর বলবার ওরূপ উদ্দেশ্য নয়।

যাঁরা এখনও রামকৃষ্ণের বা গুরুর দয়ায় সব স্ত্রীতে মাতৃ-দর্শন বা সব পুরুষে পিতৃদর্শন, বা সর্বভূতে শ্রীগুরু অথবা শ্রীঅভীষ্ট-দর্শন করেন নাই, তাঁদের নিজেদের ভিতরের পশুত্বকে জব্দ করিতে, নিজেদের দুর্নীতি হইতে বাঁচাইবার জন্য নির্মমভাবে সাবধান হইতে হইবে। কল্যাণ-দৃষ্টি বা শুভদৃষ্টি বা শুভ ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, বা চলিত কথায় "পাকা ঘুঁটি" হইয়া গেলেও (আর তাহার কোন বাঁধা বয়স নাই) রামকৃষ্ণের বা ঈশ্বরের কাজের জন্য ছাড়া পরস্পরের সম্বন্ধ বা (স্ত্রীপুরুষ) মেলামেশা সমর্থনযোগ্য নহে। মধুরভাব সাধনে রামকৃষ্ণের কথা ধরো। এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে খোদ রামকৃষ্ণের উপরই যুক্তিবাদী দোষ দিবেন। কারণ, আদর্শ লাভ করিয়া অনেকেই এই সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। অসীম প্রতিভাশালী শ্রীবিবেকানন্দ বয়সে ছোকরাই ছিলেন, শেষ পর্যন্ত। ভক্ত বলিবেন, যাঁহারা ইঁহাদের জানিতেন তাঁহারা বলিবেন, বিশ্বাস করি এবং আচরণ দেখিয়া জানিয়াছি যে, ইঁহারা অনেকে জিতেন্দ্রিয় লোকাচার্য। রামকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু ত বটেই। সেই শ্রীরামকৃষ্ণের দয়াতেই আবার অনেক লোকাচার্য্য নিশ্চিতই হবেন। তা না হ'লে রামকৃষ্ণ-রূপ যুগভাবধারাই মিথ্যা হ'য়ে যাবে। ভক্ত আরও বলিবেন,-বিশ্বাস করি না, ভগবান্ রামকৃষ্ণের চিহ্নিত বা মার্কামারা ভাববাহীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট। বা শেষ হইয়া গিয়াছে। বা শীঘ্রই হইবে। যেদিন তাই হবে, সেদিন রামকৃষ্ণও সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া যাইবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাসে, আচার্য বুদ্ধ, আচার্য জরথুষ্ট্র,

কন্‌-ফুসিয়াস্‌, লাউৎসী, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমহম্মদ, বল্লভ, নিম্বার্ক, শঙ্কর, রামানুজ সেদিনের শ্রীচৈতন্য, কেহই এখনও মনুষ্য-জীবন-প্রবাহ হইতে অদৃশ্য হইয়া যান নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ কি সৃষ্টি-ছাড়া হইবেন? রামকৃষ্ণের সমজদার সমসাময়িকেরা ধন্য। রামকৃষ্ণের পরবর্তী রামকৃষ্ণমতে বিশ্বাসী যাঁরা, তাঁরাও ধন্য।

গৃহস্থ, সন্ন্যাসী—যিনিই স্বেচ্ছায় রামকৃষ্ণ ভজিবেন, তাঁহারই (যতই নিজের সুবিধামত ঠাকুরের উক্তিরাশি হইতে স্বপক্ষে মত উদ্ধৃত করি না কেন) ফাঁকি দেবার জোটি নাই। সকলেই রামকৃষ্ণের সন্তান। রামকৃষ্ণ-নামরূপ যন্ত্রে সকলের সব দোষ, সব বেয়াদবি সিধে হয়ে যাবে। যেখানে থাকিলে শনৈঃ শনৈঃ সুচারুরূপে যাঁর আদর্শ-লাভ সুসম্পন্ন হইবে, তাঁকে সেই স্থানেই রামকৃষ্ণ রেখেছেন। বড় সবাই, আবার বলি। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সমবেদনা চাই। আচার্য বিবেকানন্দের একটি সুন্দর, ভারি এবং দামী উক্তি বঙ্গসাহিত্যে কিছুকাল পূর্বে শুদ্ধানন্দ দান করিয়াছেন। স্বামীজী উৎসাহ দেবার জন্য চাইছেন, "ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ।" নরেন্দ্রপ্রমুখ অনেকেই যে অনেকটা বা কিছু কিছু রামকৃষ্ণ-তুল্য হইয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দুই বার বিবাহ করিয়া সংসারে থাকিয়াও দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় কিছু কিছু রামকৃষ্ণবৎ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব বলতেন, তাঁকে (ঈশ্বরকে) জেনে সংসার করো। অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কর্তব্য করার উপদেশ দিতেন। লোক-সংগ্রহার্থ, লোক কল্যাণার্থ, সমাজধারা অব্যাহত রাথার জন্য, অকামহত হইয়া আদর্শ গৃহীর পুত্রোৎপাদন করার বিধান উপনিষদে আছে। জ্ঞানীর স্বদারায় গমন, আর ইতর সাধারণের ঐ ব্যবহারে আকাশপাতাল প্রভেদ। রাজা জনক, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা ভারতীয় সাধনার ধারায় আদর্শ গার্হস্থ্যের সুন্দর চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ইস্‌লামের মূর্ত প্রতীক শ্রীমহম্মদের সংসারকেও এই দৃষ্টি হইতে দেখিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ বা ঈশ্বরজানিত অন্যান্য ব্যক্তিদের উক্তির ভিতর সব রকম, সবকিছুই বলা থাকে। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি গোড়ায় তাঁরা বলেন। শ্রীসারদাদেবীকে কেউ কেউ বলছেন, "মা বিয়ে করব কি?" তার ভাব বুঝে মা তখনি বললেন, "বিয়ে করবে বৈকি, বাবা। দেখনা, সংসারে সব—ছুটি ছুটি। একটি—কোথাও নেই।" আবার কাহাকেও বলছেন, "বিয়ে কখনো করো না। কিছু না হোক, ঘুমিয়ে বাঁচবে।" কাউকে কাউকে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন,—খেয়ে নে, পরে নে, যা ইচ্ছে করে নে।—এইরূপ

কথাগুলি, ব্যাপকভাবে আক্ষরিক হিসাবে লইয়া, সব ক্ষেত্রে খাটাইলে, সর্বনাশ!

ছেলে কিছুতেই দুধ খাবে না। তার মাথায়, মানতের জন্য রাখা মস্ত লম্বা লম্বা, থোকা থোকা, গোছা গোছা চুল হয়েছে। মা সেইগুলি রোজ রোজ যত্নের সহিত বিনুনি ক'রে, সুন্দর উঁচু চূড়া বা খোঁপা বেঁধে দেন। চূড়ার উপর ফুল দিয়ে সাজানো। ছেলে চূড়া, ফুল এসব বড় ভালবাসে। মা, বললেন, 'ওরে বোকা, তোর জুড়ি নেই ত্রিভুবনে। দুধ শিগ্‌গির শিগ্‌গির খেয়ে নে। চূড়ো আরও বড় হবে।

ঠিক এইরূপেই নিখিলের মাতৃস্থানীয় কল্যাণকামরত জ্ঞানীকুলও অবুঝ্ ভক্ত মানববৃন্দকে, জননীহৃদয়ের দরদ লইয়া কথা বলেন। একদা এক ব্যক্তি—যাঁর সাত চড়ে আওয়াজ বেরোয় না, মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে গোছের লোক,—সাধু হবেন বলে, বেলুড়মঠে যান। বিবেকানন্দ তখন গঙ্গার ধারে পায়চারী করছিলেন। শুনেছি, ঐ ব্যক্তিকে তিনি বলেন, "সাধু হওয়া,—অত সোজা নয় হে! আগে চুরি ও বদমায়েসী করে, তারপর ফিরে এসো। সাধু হবে, তার আর কি? আগে দুনিয়া দেখে নিয়ে, পরে বিরক্ত হবে।"—এই সব উক্তির তাৎপর্য-নির্ণয় ও ভাবগত অর্থ বুঝাইবার জন্যই মহাজনদের কথার উপর "মল্লিনাথ"-মণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। উপায় নাই।

আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবন পঙ্গু। যাঁরা সত্য সত্য বিবেকানন্দকে মানবেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত—যেমন সব ছেলেদের ঘাড়ে একটা করে বলপূর্বক বিবাহ চাপিয়ে দেবার অধিকার মা-বাপ বা অন্য কোন অভিভাবকেরই নাই, মেয়েদের সম্বন্ধেও তাই। ঋগ্বেদের সমাজে চিরকুমারী ছিল। সত্যের জন্য, সমাজের অযথা নিন্দার ভার যাঁরা বহনে অসমর্থ, তাঁরা কেমন বিবেকানন্দভক্ত? বাঙালী পরিবারে দেখা যায়, অর্থাভাবে বত্রিশ বছরের মেয়ে অবিবাহিতা থাকেন। সেক্ষেত্রে কাণাঘুষা সহ্য করা অবশ্য—অবশ্যম্ভাবী। মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার অবকাশ দেওয়া দরকার। সনাতনী, গতানুগতিক ধর্মের নামে, হীন দেশাচারের অজুহাতে, তাঁদের কেবল ভোগের যন্ত্রস্বরূপ বানিয়ে রাখলে চলবে না। পল্লীতে ও নগরে অনেক পৌরুষহীন পুরুষকে দেখা যায়, বাহিরে জারিজুরী করিবার সব কবাট বন্ধ হওয়াতে, তাঁদের যত বদ কর্তামি—ঐ ঘরের মেয়েদের ওপোর। তাঁরা ভয় করেন. শিক্ষা পেলে মেয়েরা তাঁদের "পতি পরমগুরু"-বোলে মানিতে চাইবেন

না। "মেয়েদের পদদলন" ও উহা নিবারণের কথা স্বামীজী চিঠিতে তাই বলেছেন।

বিবেকানন্দের কথা অনুযায়ী কাজ করতে অনেক তথাকথিত, গৃহস্থ বিবেকানন্দ-ভক্তও হয়তো পেছপাও হবেন। বিবেকানন্দ স্ত্রীমঠের পত্তন ও স্ত্রীসন্ন্যাসিনী করিয়া গিয়াছেন। সচরাচর ক্ষেত্রে—স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বিবাহ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহা বলাই বাহুল্য। কাহারো (কি স্ত্রী, কি পুরুষ) অধ্যাত্ম ধর্ম জীবনে বা সামাজিক—অথবা রাজনৈতিক উচ্চ আদর্শ ধরবার চেষ্টায় হাত দেওয়া, মহা অনধিকার। সংসার ও সঙ্ঘে এইরূপ যিনি বা যাঁহারা করেন তাঁহাদের অপরাধ—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনালোকে—অত্যন্ত গর্হিত, একান্ত নিন্দিত—আর একেবারে অমার্জনীয়। শুধু মেলার প্রাঙ্গণে উৎসবের সময়, ভোগ খেয়ে, ব'সে ব'সে ঝিমুতে ঝিমুতে স্বামীজী মহারাজের জয়, রামকৃষ্ণ মহারাজের জয় দিলে চলবে না। স্থূল প্রসাদ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সূক্ষ্ম ভাবপ্রসাদও ধারণ করিতে হইবে। নতুবা সবই হুজুক বা ফাঁকা হৈচৈ।

আজ দেশের ডাকে, দেশের কাজে বাংলার তরুণ জাগিয়াছেন। তরুণীও জাগিতেছেন। যৌন সম্বন্ধে পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে সব আন্দোলনের প্রভাবই ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। বিপদ গুরুতর। বাংলার তরুণদের রাজা, নেতা নরেন্দ্রনাথের একটি নিজ লিখিত সাবধানবাণী আজ বাংলার নারীর হাতে, নরের হাতে ধরিতেছি। নিখিল বিশ্বের সকলের কাছেই। নীতি লইয়া আজ সব সুসভ্য দেশই বিষম সমস্যার সম্মুখীন। ভাব বুঝিয়া আমাদের সকলকে সাবধান হইতে হইবে।—"পাশ্চাত্য-দেশে যাঁহারা স্ত্রীপুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে, তাহা না জানিয়া, স্ত্রীপুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই।" (বর্ত্তমান ভারত)

যে স্ত্রী বা যে পুরুষ বিবাহ করিয়া রামকৃষ্ণ ভজিতেছেন, তাঁহার কর্তব্য (যতদিন না ভিতরে আদর্শ উপলব্ধি করিতেছেন) পুরুষের সহিত বা স্ত্রীর সহিত যে মেলামেশাতে ইন্দ্রিয় সংযম নষ্ট হয়, তাহা বর্জন করা। জননী সারদা দেবী রামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত মেয়েদের সুন্দর বলতেন, ওগো তোমরা পুরুষমানুষ থেকে তফাত থাকবে। আজকাল ঠাকুরের ভাব ছড়াচ্ছে। মেয়েরাও কেউ কেউ বিয়ে করতে চাইছে না।…অমুককে বলি, সোয়ামীর সঙ্গে শুবি না।

নিজেও জ্বলবি, আমাকেও জ্বালাবি। ইত্যাদি।—এইরূপে বিবাহিতা কন্যাকেও সারদাদেবী আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট সাবধান করিয়াছেন। সংযমে প্রতিষ্ঠিত না হইলে রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর যুগভাব ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের করুণা কিছুই বুঝা যাইবে না।

আজকাল সভ্য সমাজে নানাপ্রকার কৃত্রিম যন্ত্র ও ঔষধের সাহায্য লইয়া দাম্পত্যজীবনে সন্তানোৎপাদন বন্ধ রাখিবার সন্ধান বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। শরীর বিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহা কতটা অবলম্বনীয়—সে বিষয়ে মতভেদ চিকিৎসকদের আছে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ইহাকে মারাত্মক ব্যাধিবিশেষ বলিলেও বলা চলে। ফল—বিষময় বলিয়া বোধ হয়। ভীরুতা, ব্যভিচার, লাম্পট্য—এই সবই ইহার আওতায় উৎসাহিত হইবে। যদিও নিঃসন্দেহ—যে অর্থনীতির দিক দিয়া, অভাবের দিক দিয়া, ইহা একটি আশু প্রতিকার—চমৎকার প্রতিবিধান বলিয়া বোধ হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে নবজাগ্রত গৃহস্থ মানব মানবী! তুমি এতৎ সম্বন্ধে সজাগ হও। আপনাপন কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হও। অনিষ্টকর বলিয়া যদি বুঝিয়া থাক, জাতিকে সাবধান কর। সংযম ও ব্রহ্মচর্যই নৈতিক দুর্বলতার একমাত্র মহৌষধ। বেশী সন্তানের জন্ম বন্ধ করিতে যাইয়া গৃহস্থ যেন শতগুণে মারাত্মক দেহজ ও নৈতিক-মানসিক দোষসমূহ সমাজে আবাহন করিয়া ঘরে ডাকিয়া, না আনেন। জাতির শরীর ও মনের স্বাস্থ্য আজিকার দিনে বিশেষ ভাবনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইন্দ্রিয় সংযম লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দম্ভ আসিয়াছিল বলিয়া একবার মা তাঁহাকে নাকামী চোপানী খাওয়াছিলেন। তিনি এ বিষয় অহঙ্কার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। "মা মা, রক্ষা করো গো" বলিয়া প্রতি পুরুষ ভক্তকে—আর "বাবা গো বাঁচাও" বলিয়া প্রতি সাধিকাকে, জীবনের পথে, সাধনের পথে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে আগুয়ান হইতে হইবে। আর বলিতে হইবে, হে জগদম্বে, হে জগন্নাথ, ওগো আমি শরণাগত। রক্ষা, রক্ষা, রক্ষা।

যদি ছবি আঁকিতে পারিতাম, আঁকিতাম, ঘোর অমানিশা। মন্দির, চত্বর প্রাঙ্গণ, নহবৎ, কাছারী, কুঠী, সদাব্রত, পাকশাল, ঘোড়াশাল, পুষ্করিণী, নাটমন্দির, উদ্যান, গঙ্গার এই তট, গঙ্গার ঐ তট, গঙ্গার স্নেহমাখা সুস্নিগ্ধ মধ্যবক্ষ—সব নিঝুম, নিস্তব্ধ। মায়ের দেউলে, মৃন্ময়ী শ্যামামায়ের রমণীয় আলুলায়িতকুন্তলা, কনককান্তিময়ী সালঙ্কারা মূর্তিতে চিন্ময়ীর চৈতন্যরাশি

বিচ্ছুরিত। ভক্তের চক্ষু, স্বতন্ত্র চক্ষু। ভক্তের ভাব—স্বতন্ত্র ভাব। মায়ের সন্তান যুক্তকর—সরলতার আকর। উপাসিতা ও উপাসক—সম সত্তাবিশিষ্ট। পূজারীর আসনে মায়ের বাছা, বালক রামকৃষ্ণ উপবিষ্ট। তিনিও চৈতন্যময়। তাঁহার এখন তন্ত্রমন্ত্র, প্রাণনিয়মন, সব ঘুচিয়াছে। মাকে দেখে, তাঁকে সর্বদা কাছে রাখবার জন্য অসাধারণ হৃদয়াবেগই সম্বল হইয়াছে! তাঁহার কলিজার মধ্য হইতে, মরমের মধ্য হইতে মধুর, নির্ভর ভাব গুঞ্জরিত হইতেছে। যদি সেই পবিত্র, পরম শুভ, গোপন মুহূর্তে কোন ভাগ্যবান কান পাতিয়া শুনিয়া থাকেন, তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিয়া—গলিয়া গিয়াছেন। বায়ুমণ্ডল কাঁপাইয়া প্রাণের সমস্ত বেদনার পুঞ্জীভূত জমাটবাণী—ঠিক্ ঠিক্ নিজেকে অসহায় ঠাওরাইয়া ফুকারিয়া উঠিতেছে—মা, মা, মা! শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত!

ষাটহাজার বৎসর তপ করিয়া ঋষির ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতেছে। এবম্প্রকার অতিশয়োক্তিপূর্ণ আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া আমাদের পুরাণ—সাধক-কুলকে দম্ভনাশ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আসল কথা, রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া যিনি ইন্দ্রিয় সংযমের সহিত ব্রহ্মচিন্তা বা আত্মসাক্ষাৎ-কারের জন্য চেষ্টিত, তিনি ধন্য। আবার যিনি তাঁকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতিচ্ছবি ভাবিয়া ঐ কাজে রত আছেন. তিনিও বাহাদুর। একদিন সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, "যে কেহ ঠাকুরের ভাব লইয়া জীবন যাপন করবার চেষ্টা করছে, সে-ই তাঁর।" শুধু রামকৃষ্ণদেবের বা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী জানিলেই চলিবে না। জানা ভাল। অনেক বুদ্ধিমান সাংবাদিকে তাহা জানেন—কিন্তু তাঁদের অনুবর্তী হওয়া চাই—উচ্চভাব কাজে ফলানো চাই! বিবেকানন্দ একবার ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া কার মুখে যেন শুনিয়াছি—আমি মরে গেলে তোরা যদি আমাকে অবতার বানিয়ে আমার ছবির সামনে খালি পিদিম ঘুরুবি তো আমি ভূত হয়ে এসে তোদের ঘাড় মটকাবো।—আচ্ছা কথা।

কিছুদিন পূর্বে এক শ্রেণীর এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলাম। আমাদের দৃষ্টিতে, তিনি দুর্ভাগ্য। তিনি কোন রামকৃষ্ণ মঠের বড় বাড়ীর—ঐশ্বর্যের সংস্পর্শে এসেছেন। মুগ্ধ হয়েছেন। ভাবসম্পদ—যাহা আসল, তাহা কিছুই ধরতে পারেন নি। বল্লেন, অনেক কথার ভিতর—রামকৃষ্ণের কি দরকার ছিল, ষোড়শী পূজো করবার? পত্নীর সঙ্গে মাতৃ-সম্বন্ধ পাতাবার। মুখে মা না বলে, পত্নীর সঙ্গে ঐরূপ আচরণ করতে পারলে, তবে তাঁকে বাহাদুর বলতাম।

বল্লাম, ঠিক কথা। কিন্তু তিনি নিজেকে যে জগদম্বার অসহায় বালকরূপে প্রায়ই ভাবতে ভালবাসতেন। বালকভাবই তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধভাব। বেশী 'বার ফট্টাই' তিনি করেন নাই। করতে মানা করেছেন। তাঁর পক্ষে মা, মা —বলে সব নারীর সান্নিধ্যে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ, আমরা বুঝি বা না-বুঝি, তিনি যাবৎ নারীশরীরে তাঁহার প্রাণের প্রাণ, শ্যামা মাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া সর্বদাই মোহিত ও মাতৃময় থাকিতেন। আর কতো জবর রকমের ব্যক্তি ছিলেন তিনি, দেখুন। ছাঁদনা তলায় সাত পাক ঘুর খেয়ে ফুলের বাঁধনে (সচরাচর যেটা, লোহার চেয়েও শক্ত, পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন, দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায়) এক গ্রাম্য বালিকাকে বিবাহের বাঁধনে বেঁধেও, তিনি বলতে পেরেছিলেন—আমি স্বপ্নেও পর্যন্ত কখন 'স্ত্রী' লই নাই। মাইরী বলছি ! —হয় তিনি মস্ত ঠগবাজ, দমবাজ। নয়তো তিনি সম্পূর্ণ তারই উল্টো—পরম, চরম জ্ঞানীর শিরোমণি !!

পাশ্চাত্য শিক্ষার, পাশ্চাত্য হাবভাব-আদবকায়দার প্রথম চোখ-ঝলসানো চটক, তখনও বাংলার নরনারী কাটাইতে পারেন নাই। রামকৃষ্ণের পূর্বে সমাজ-সংস্কারক-কুল বাংলার আঙিনায় দেখা দিয়াছিলেন, সত্য। রামকৃষ্ণ ছিলেন —সন্ন্যাসী। তিনি যে নৈতিক চরিত্রের আদর্শ বজায় রাখিয়াছিলেন, গৃহস্থ সংস্কারক-কুলের আদর্শ—তাহা হইতে বিভিন্ন, বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তিনি যে সংযম আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান যুগে অদৃষ্টপূর্ব। সন্ন্যাসীতেও এইরূপ মনে প্রাণে, চিন্তায় ভাবে—সংযম-সাধন, কোন যুগেও পারিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। যদি সংযমকে মানিতে হয়, তাহা হইলে পরিপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ, সংযম-আচরণকারী শ্রীরামকৃষ্ণকেও সমগ্র মানবসমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া মানিতে হয়। তারার ছিটে ফোঁটা মিটি মিটি আলো স্বীকার করিতে হয়—আর পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের সুশোভন মনোহারী ছবিতেও মুগ্ধ হইতে হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ আদর্শটি সাফ, সরল, পরিষ্কার। পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই ধরিতে পারিবেন, বুঝিতে পারিবেন,—অনুকরণ করিতে পারিবেন কিনা, জানি না। কোন ঘোলাটে ভাব, এখানে নাই। ঈশ্বর যাঁহার যৌনস্পৃহা করুণা করিয়া ঈশ্বরের দিকেই মোড় ফিরাইয়া লইয়াছেন বা লইতেছেন, আর যিনি আন্তরিকভাবে অর্থের গোলামি বর্জন করিতেছেন—তাঁহার দ্বারাই সব চেয়ে বেশী কাজ হইবে, সুনিশ্চিত।

স্বামীজীর জীবনব্রতরূপ পরম মহৎ কর্মে যাঁহারা গৌরবময় অংশ লইতে চান

তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি একজন পাশ্চাত্যবাসীকে একটি কথা জোরের সহিত বলিতেছেন,—They *must* be pure in heart.—তাঁহাদের হৃদয় পবিত্র হওয়া একান্ত প্রয়োজন—গীতায় ভগবানও বলিয়াছেন অকৃতাত্মানো—অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি যত্নশীল হইলেও আত্মসাক্ষাৎকার করিতে অক্ষম হয়েন।

অপর জায়গায় রামকৃষ্ণদেব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"যদি তুমি নিঃশেষে যৌনক্ষুধা ও অর্থ-পিপাসা পরিত্যাগ করতে পারো—ত তোমার আর বক্তৃতা না দিলেও চলবে। তোমার হৃৎপদ্ম তাহাতেই ফুটে উঠবে,—আর সেই ভাব—আপনা হতেই ছড়াবে। যে কোন মানুষ তোমার কাছে যাবে, সে-ই—তোমার অধ্যাত্ম-অগ্নির সংস্পর্শে এসে তাজা, গরম, বলদৃপ্ত হ'য়ে উঠবে……চরিত্রই আমাদের সর্বত্র লাভবান করবে, ফল দর্শাবে।" (অনুবাদ)

এক কথায় মনে রাখিতে হইবে যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত তাঁহারাই, যাঁহাদের দেহমনরূপ আধার—পরম পবিত্র! পবিত্রতার বিদ্যা পরম শুভকরী, পরম লাভকরী, পরম পাবনী। তাঁহাদের বাহ্যবিদ্যা, কসরতী, বিভিন্নমুখী প্রতিভা ইত্যাদি—যদি নাও থাকে, ত কোনই ক্ষতি নাই, দুঃখ নাই। *Doing good* is a secondary consideration. We must have an Ideal. Ethics itself is not the end, but the means to the end. আচার্যের এই জ্ঞানবচন বিশেষ প্রতিধানযোগ্য। লোকের ভালো করা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। আমাদের একটি আদর্শ থাকা চাই। আবার একমাত্র সুনীতিই চরম-গন্তব্য নহে। উহা গন্তব্যে পৌঁছিবার উপায়।

আদর্শ-প্রীতি এবং তল্লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাই সাধুজীবনের—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার বিশেষত্ব। বাহ্যগুণের সমাবেশ না থাকিলেও, মনস্তাপের কোন কারণ নাই। ইঁহাদের অনুবর্তিগণ ঐ একান্ত কাম্য এক গুণেই—ঐ একের জোরেই 'বাজীমাৎ' করিয়া দিতে পারিবেন। আর প্রভুর কাজের জন্য, প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাদের শুদ্ধ সংযত ধীশক্তি—লৌকিক বিদ্যাবিশেষে খাটাইয়া পারদর্শিতা অর্জন করিয়া লইতেও পারেন। ঐ মূলের ঘরে বিশেষ ফাঁক থাকিলে, যদি আমাদের ভিতর লক্ষ লক্ষ কেরামতীও থাকে, —চতুরতার চূড়ান্ত থাকে, তো সকলই নিষ্ফল। সবই প্রতারণায় পরিপূর্ণ, সম্মোহিনী যাদুবিদ্যার সামিল। সকলই—বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। আর ঐ এক

অমূল্য দ্রব্যটি—আমাদের স্বভাবের শোভারূপে, অঙ্গের আভরণরূপে, ধমনীর রক্তপ্রবাহরূপে লাভ করিয়া, বাড়ার ভাগ—যত গুণ, যত কৌশল, যত শিক্ষা লাভ করিতে পারি, ততই মঙ্গল—তাহাই শ্রেয়ঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জাতি-সংগঠনে আত্মিকশক্তির আবশ্যকতা

দেশের রাজনৈতিক সমস্যা, আজ এক নূতন অধ্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আচার্যপাদ বিবেকানন্দের সেই কথাগুলি এখন মনে হইতেছে—"আত্মশক্তিই ভারতকে তুলবে। পশুবল পারবে না।······ভেতরের দেবত্বকে জাগাও, তার মহিমাতেই তোমরা ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণ—সব সহ্য করতে সক্ষম হবে।······ তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য, তোমাদের সোয়াস্তি, তোমাদের আমোদআহ্লাদ, তোমাদের নামযশ ও পদলাভের আকাঙ্ক্ষা—মায় জীবন পর্যন্ত, বিসর্জন দিতে বলি।······শান্তি ও আশীর্বাণীর সহিত মহিমময়ী ভারতমাতার মহিমা বিশ্বের সর্বত্র বিঘোষিত করো।" (তর্জমা)

বর্তমান যুগে কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত গুর্জর-জাত মহাত্মা—এই বাণীর জীবন্ত বিগ্রহ। গান্ধীর অহিংস আন্দোলন কার্যকরী ও সফল হইলে, শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীর রাজনীতির অনেক নীতি পাল্টাইতে হইবে। বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ (সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ) সংঘ বা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত, অ-রাজনৈতিক দলগুলির, বর্তমান সমস্যায় কর্তব্য কি, তাহা নির্ধারণ করিবার সময় আসিয়াছে। যাঁহারা নিজেদের অ-রাজনৈতিক সেবকদল বলিয়া রেজেস্টারী করিয়াছেন, তাঁহাদের সাক্ষাৎ রাজনীতিতে যোগ দেওয়া চলিবে না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর দল হিসাবে, রুচি অনুসারে, নিজেদের মতবাদ-অনুযায়ী স্বেচ্ছায় তাঁহারা ঐ ভাবে একীভূত হইয়াছেন। ইহাও ঠিক। এবং রাজনীতিতে নেতৃত্ব করিতে অ-রাজনৈতিক দলসমূহ কোন কালে চান না, ইহাও যথার্থ। রাজনীতি ক্ষেত্রও —সমাজসেবা ও দেশ-সেবায় একটা মস্ত প্রয়োজনীয় অংশ, সন্দেহ নাই। তবে রাজনীতি হইতে তফাত থাকিবেন বলিয়া যাঁরা স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের

সর্বাংশে ঐ প্রতিজ্ঞা পালন করাই বিধি। রাজনীতির পথে থাকিয়া পবিত্রতা ও সত্য-সততার সহায়ে মিস্টার গান্ধী—মহাত্মা গান্ধী হইলেন।

বিবেকানন্দের ভাবসমুদ্রের কতকগুলি ভাব আমরা এতদিন সম্যক্ বুঝিতে পারিতাম না। গান্ধীকে দেখিয়া, সেইগুলির যাথার্থ্যে আরও দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছে, স্বামীজী কত বড় যে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ছিলেন, তাহারা আর ইয়ত্তা নাই। তাঁর প্রতি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হইতে বাধ্য—যথাকালে। অধ্যাত্মজীবনই যে ভারতীয় সভ্যতার মূল ও শীর্ষ, একথা সেদিন কলিকাতাতে মহাত্মাও বলিয়া গেলেন। কারে পড়িয়া আমাদের জাতি হিসাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেককেই আত্মনিয়োগ করিতে হইতেছে। বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যেও এই কথা বারম্বার স্মরণ করানো আছে। ইহা বলিলে, গান্ধীর মৌলিকতার কিছুই হানি হয় না। বিবেকানন্দের মতে, রাজ-নীতির পদ্ধতি স্বতন্ত্র—অধ্যাত্ম ধর্মনীতির স্বতন্ত্র। আততায়ীকে শারীরিক বলপ্রয়োগে গৃহস্থ মানব হটাইবেন,—মনু মহাত্মার এই উপদেশ পুনর্বার গৃহস্থদের উপর স্বামীজীর বাণীরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ইহাই জনগণ-ধর্ম। গান্ধীর জীবনধর্ম, রাজনীতি ক্ষেত্রে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, পরখ করিবার সুযোগ হইয়াছে, হইতেছে—ব্রিটিশ ভারতের নিরস্ত অবস্থার জন্য, ইহাও ঠিক। তথাপি, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যাইবে, বিবেকানন্দের কতকগুলি ভাব-সূত্রের ভাষ্য রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীমহারাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। একবার বেলুড়মঠে ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব দর্শন করিতে আসিয়া, গুর্জরসিংহ স্পষ্ট বলিয়াছিলেন,—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও উপদেশ পড়িয়া, আমরা দেশপ্রীতি সুদৃঢ় হইয়াছে। স্বামীজীর দরিদ্রনারায়ণ সেবামন্ত্রে, গান্ধীজী দীক্ষা লইয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে গান্ধীর পূর্বেও সত্যাগ্রহী ছিলেন। ভারতের প্রহ্লাদ, বাংলার নিত্যানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রীসের সোকরাতেস, এশিয়ার যীশু। য়ুরোপেও এ শ্রেণীর মহামানব জন্মিয়াছেন।

কিন্তু, তাই বলিয়া বিপুল আকারে, ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে এ আদর্শ সফল করিবার চেষ্টায় ইতঃপূর্বে কেহ নামিয়াছেন, বা এই আদর্শে অনুরূপ অনুবর্তী পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না।

পাঠকবর্গ, বিবেকানন্দের বাণী শ্রবণ করুন। তারপর, গান্ধীর প্রতি তাকান। স্বামী—"আমাদের জীবনের রক্ত হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। রাজনৈতিক, সামাজিক ভারতের বহির্বস্তু-গত যা কিছু দোষ, মায় তার দারিদ্র্য পর্যন্ত আরাম হবে, যদি

এই আধ্যাত্মশোণিত পরিষ্কার থাকে। * * * * ত্যাগই ভারতকে পূর্বে জয় করিয়াছে, আবার ইহাই ভবিষ্যতে করিবে। * * * * অধ্যাত্মধর্মই ভারতীয় জীবনের কেন্দ্র।...আর যা কিছু সব—গৌণ। * * * যদি এই অধ্যাত্মধর্ম তোমরা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও; তোমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে। * * * জগতের সব জাতের ভিতর, একা আমরাই রক্তপাত করিয়া, অপরকে রাজনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি নাই। আর এই আশীর্বাদের জোরেই আমরা আজও বেঁচে আছি। * * * যেদিন "ম্লেচ্ছ" শব্দ আবিষ্কার করে আমরা অপরের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করেছি, সেই দিনেই আমাদের পতনের চাপরাস তৈয়ের হয়েছে। * * প্রতি ব্যক্তির সত্যের উপর ভারতের মুক্তি নির্ভর করছে। প্রত্যেককে তার ভিতরের দেবত্বকে জাগাতে, উপলব্ধি করতে, কার্যকরী করতে হবে। * * জেনো, পল্লীর কুটীরে কুটীরেই জাতটা রয়েছে। কিন্তু হায়, তাদের জন্য কেউ কিছু করে না। * * পাশ্চাত্যের আঘাতে মনে হচ্ছিল, বুঝি বা আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, মূলাধারস্বরূপ—অধ্যাত্মধর্মকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু, তা হবার জো নেই। তাই এই মহাশক্তিরূপে রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।" (অনাক্ষরিক ভাষান্তর)

ভারতীয় কৃষ্টির অবিনাশী, অপরিত্যাজ্য সুন্দর ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই যে, আমাদের ব্যক্তি ও জাতি সংগঠন করিতে হইবে, পরদেশীর দুয়ারে শিখিতে হইবে,—বলিলে সম্ভব অত্যুক্তি হইবে না; সর্ব পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিবর্জিত সত্যকার সাধনার ধন—পরম কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়, সাং কামারপুকুর, জিলা হুগলী, বা রামকৃষ্ণ পরমহংসই প্রথম এই ভাবের—ভারতীয় জাতীয়তার প্রথম মঙ্গল-বৈতালিক। তিনিই আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত নবজীবনের ভগবান্—আমাদের মহনীয় উদ্বোধন-মন্ত্র। আর, তিনি কতকগুলি ইয়ং বেঙ্গলকে এই মন্ত্র লওয়াতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার ফলেই, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন। বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ভারত ও ভারতেতর দেশসমূহেও এই যুগভাবধারা ক্রিয়াশীল। এই তরঙ্গের একটি মহোর্মি—স্বামী প্রেমানন্দকে বলিতে শুনিয়াছি—"ওরে আমরা কি-ছাই ঠাকুর দেবতাকে পেন্নাম করতে জানতুম্? ঠাকুর আমাদের হাত ধরে, তাও শিখিয়েছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ ঘটিবাটি দেওয়ার ন্যায় অধ্যাত্মধন মানুষকে দিবার ক্ষমতা ধরিতেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ মানুষকে জীবনে দিব্য, চিরশান্তি, চিরঅভয়লাভের উপায়স্বরূপ তিতিক্ষা, নিত্যানিত্য-বিচার এবং পরিশেষে প্রণতি, নতি, শরণাগতি বা ঐশ্বরিক শক্তির সমক্ষে চরম আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সুন্দর বলিয়াছেন,—"সভ্যতার কাজ হইতেছে, চরম পূর্ণতা প্রাপ্তির যে আদর্শ, তাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে মানুষের কাজ ও সরল বিশ্বাস জাগ্রত রাখা। সভ্যতা,—শিল্পীর সৃষ্ট বস্তু। কল্পনা-শক্তি সদা সর্বদা, মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং তাহার পরিবেষ্টনীকে গড়িয়া তোলে।"

—এই দিক দিয়া দেখিলে, পরণের কাপড়ের ঠিক না থাকিলেও, রামকৃষ্ণকে সভ্যসমাজের চরম শীর্ষ-স্থান দিতে হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে—তিনি শিল্পীর সেরা. শিল্পীর রাজা—শিল্পীর ঠাকুর। তিনি কবি,—মহাকবি। চরম কল্পনার পরম নায়ক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে অলৌকিক ভাবসাধনা

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাববাহী যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদিগকে গীতার জ্ঞান ও নিষ্কামকর্মের সমন্বয় স্মরণ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানসপুত্রগণ ও স্নেহের কন্যাগণ হইবেন তত্ত্বদর্শী, ক্রান্তদর্শী ঋষির গণ—সদা সর্বতোভাবে জীবহিতে ব্রতী (৫।২৫ গীতা) ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ··· ··সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ আর তাঁদের কর্মফলাসঙ্গ থাকিবে না। তাঁরা যে নিত্যতৃপ্ত (৪।২০)। ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো······কর্মণি অভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ আর যদি ঠিক ঠিক ভাব না লইয়া কার্য করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে শ্রীগীতাবক্তার ভাষায় সেই কাজ "মোঘকর্মাণো" হইবে। বৃথাই কর্ম। অবশ্য, আদর্শের দিক হইতে। সে কর্ম যতই আড়ম্বরযুক্ত হউক না কেন, তা থেকে নিশ্চয়ই আমাদের স্বভাবসংস্কার কোন কালেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দমুখী, পরব্রহ্মমুখী হইবে না।

পরমার্থজ্ঞানের পরম অবলম্বনশূন্য—তুচ্ছ কোন এক বস্তুকে আদর্শ ভাবিয়া

যিনি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকেন, তাঁহার সেই ভাবটি তামসিক জ্ঞানপ্রসূত কর্ম করিতে হইবে—নিয়ত আসক্তিশূন্য রোগ-দ্বেষ বিবর্জিতভাবে। কর্তৃত্বের অভিনিবেশ থাকিবে না। শুদ্ধানন্দ এক রাত্রে, স্বামী বিবেকানন্দকে ঘুমন্ত অবস্থায় তালপাখার হাওয়া করিতে করিতে, বলিতে শুনিয়াছিলেন—"অংহকারটা নাশ ক'রতে হবে।" ফলাকাঙ্ক্ষাও থাকিবে না। ফলাভিলাষ—ব্যক্তির নিজের জন্য হইলে ত স্পষ্টতঃ আদর্শচ্যুতি হইলই। কিন্তু, যদি নিজেকে মুছিয়া—সমষ্টির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য কেহ ফলেচ্ছা রাখেন, সেটা মিছরির মিষ্টির মত নির্দোষ কি না, ভাবিবার বিষয়। হিংসা যদি থাকে, দম্ভ যদি থাকে, বড় কর্মী বলিয়া পরিচিত হইবার সাধে, ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ জেদ করিয়া করিতে যাওয়ার ভাব বর্জনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কৃপায় তন্নামাঙ্কিতকে কখনও অযুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন, অনম্র, শঠ, পরের অবমাননাকারী, অলস ও দীর্ঘসূত্রী হইলে চলবে না—(গীতা ১৮।১৬-৪০)। আর স্মরণ রাখিতে হইবে, —সর্বশেষে "শান্তরজসং" (৬।২৭) রজোগুণকে শান্ত করিতে হইবে।

পৃথিবী এক দিক দিয়া গুণের গোলাম! লোকে কি ঠাকুর বানাতে পারে? গুণে বানায়। বিভূতিবান্ যাঁরা শ্রীমান, বলশালী যাঁরা তাঁরাই ত জগতে চিরকাল সর্বযুগে, সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব করে আসছেন। তাঁদের হটাতে কেউ পারবে না। ঘরে বসে হিংসা করতে পারবে। সর্বক্ষেত্রেই ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের হাত থেকে রক্ষা নাই। কাব্যে ঠাকুর আছে। শিল্পে ঠাকুর আছে। ব্যবসায় ঠাকুর আছে। মনস্তত্ত্বে, বিজ্ঞানে, অধ্যাত্ম ধর্ম-সাধনে, শুধু ঠাকুর নয়, বাপুবাছা, বাপের ঠাকুর।

শক্তি না মেনে উপায় নাই। সে বড় শক্ত সত্য। শক্তিমানদের সামনে মানুষ প্রদীপ ধরে, শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে থাকে। যারই ভিতর ফুল ফুটবে, মৌমাছিরা এসে গুণ গুণ শব্দে গুণগান করতে থাকবে। বুদ্ধদেব বললেন,—প্রতিমায় কাজ কি? প্রতিমাপূজা ক'রো না। আমিও তোমাদের মত দোষে দুষ্ট মানুষ ছিলাম, কিন্তু, চেষ্টার জোরে জ্ঞান পেয়েছি। মানুষ মানলে না, সে কথা। কেবল বুঝলে—আশ্বাস, উৎসাহ দেবার জন্য 'মেত্তা'ময় পুরুষসিংহ ভগবান সকলের সঙ্গে নিজের সমান আসন দিচ্ছেন। উহা তাঁর আরও একটি অত্যুচ্চ, লোকোত্তর উদারতা নম্রতা গুণেরই পরিচয়। একটু বিচারশীল হ'য়ে ভক্ত-মন বললে, আদর্শ, নীতি, এ সব ব্যক্তির চেয়ে বড় বটে। কিন্তু এইগুলিকে ঠিক ঠিক বড় ব'লে লোকের মনে ধারণা জন্মিয়ে দেবার জন্যে—বড়লোক,

মহান ব্যক্তির, ভগবান তথাগতের আসা প্রয়োজন।—ফল এই মাত্র আখেরে ফললো। মানুষের বুকের রক্ত দিয়ে, মনের নৈষ্ঠিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁকে পুজাই করলে। আর তাই আজও করে চলেছে। অনন্ত মূর্তি, অনন্ত অসংখ্য তাঁর মন্দির, পট, মঠ, গুহা, গুম্ফা গড়ে উঠলো।

যে বিশটা যুবকে বজ্রবাঁধনে প্রভু রামকৃষ্ণের আদর্শকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, যাঁদের পুণ্যে, যাঁদের সাধনে, যাঁদের সত্যে, কাজের পাকা বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহারা সাধের নায়ক-সঙ্গ (তাও বেশী দিন নয়—কেহ দেড়, কেহ তিন, কেহ বা হদ্দ ছয়বছর পেয়েছিলেন) দীর্ঘ কাল পান নাই। যে তালিম তিনি দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁদের ভিতর অসাধারণ অধ্যাত্মশক্তি নিহিত ছিল বলে, তাঁদের ভিতর পবিত্রতা সরলতার প্রকাশ সমধিক ছিল বলে, তাঁরা অনেকেই শীঘ্র ফুটে উঠলেন। অঘটন ঘটালেন। পরমহংসদেবের তাঁহাদিগকে চেনা এবং ইঁহাদের তাঁহাকে চেনা—দুই-ই অদ্ভুত। দুই-ই বিচিত্র। ইঁহারা নগ্ন, অল্প বা নিরাহারী রহিয়া, ক্লেশের চরম সহ্য করিয়া, সাফল্য-গঙ্গা এনেছেন। উচ্চাঙ্গের গানের বারো আনা শিক্ষানবীশের নিজের ভিতরেই আসা চাই। আনা চাই। বাকী চারি আনা ওস্তাদের স্পর্শ। সঙ্গতদারদের কৃতিত্ব। এই জন্যই ক্ষণজন্মা, প্রতিভাবান্ মহাপুরুষদের সম্মান। যদি ইঁহাদের জীব বলো, ত বলতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে, পূর্বজন্মে কত কাজ আগানো ছিল। আর যদি সকল রাজ্যের এই প্রকার গুণী, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সিদ্ধপুরুষ বলো, তো বলতে হবে, লোকশিক্ষার বাহক ক'রে, ভগবান্ তাঁর দিব্য কর্মের জন্য এঁদের আনেন। নতুবা চেষ্টার দ্বারা গড়ে-পিটে এ জীবনে (যদি নির্বিঘ্নে চেষ্টা করাটাও সম্ভব হয়) বেশ পটু পোক্ত, কাজের লোক বানানো নিশ্চিতই যায়। হয়ত তার ভিতর প্রতিভার স্বাভাবিকস্পর্শের অভাব হবে। কিন্তু, তাতে দমবার কিছু নাই।

অধ্যাত্মধর্মের অনধিকারীকে পরমহংসদেব বলতেন, ওগো, যাও তোমরা রাসমণি কেমন সুন্দর Building (মন্দির-বাড়ী, ঘরদোর) করেছে, ঘুরে ফিরে দ্যাখোগে। তাঁর সমাধি, ভাব—এসব কারুর কারুর নিকট ছোট ভট্চাযের ন্যাকামি, পাগলামি ব'লে বোধ হোতো। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কখন কখন দেখা যাইত, লম্ব-শাট-পটাবৃত বাবুর সঙ্গে কেবল গাছ, বীজ, চারা, ফুলের রকমফের, ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা কয়ে—বিদায় দিলেন। তিনি বাহিরে এতদূর সচরাচর চাপা ছিলেন। অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ বিশেষ উৎসুক অধিকারী ব্যতীত অজিজ্ঞাসিত হইয়া—কহিতেনই না।

নিজেকে একেবারে অনধিকারী ঠাওরাইয়া ছাড়িয়া দিলেও কি চলিবে? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নামে যে সব গৃহস্থ বলিদত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও দায়িত্ব গুরু। হেলার জিনিস নহে। একথা ভুলিলে চলিবে না। সৎ গার্হস্থ্য ও সৎ সন্ন্যাস একহারে গাঁথা। প্রভুর যুগচক্র সংস্থাপনে কাহার দ্বারা কতটা হইবে, কি হইবে, কখন হইবে কিছুই জানা নাই। এঁদের আশ্রিত এক আক্ষিপ্ত গৃহস্থের প্রতি একবার স্বামী সারদানন্দকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"তুই মার ছেলে। তোর ন্যাতাজোবড়া গেরস্ত হলে চলবে কেন?" আমি তাঁর সন্তান, আমাকে ভাল হইতে হইবে—এই ভাবটি আনা চাই। ঠাকুরের সংসার যেন দেখিয়াই বুঝা যায়। তিনি যে সবাকার। কাহাকেও—একটিকেও বাদ দিবার উপায় নাই। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, ভগবান মন দেখেন, কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। বেশ্যালয়ে মৃতব্যক্তিকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে যায়। আবার ভাগবত সভায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত মানবের সূক্ষ্ম-শরীরকে যমদূতে ঘাড়ে ধাক্কা মারতে মারতে যমালয়ের পথে নিয়ে চলে। ভাগবত সভাতে সাধুসঙ্গেই থাকিতে হইবে, পরন্তু সাধুসঙ্গে, ভাগবত সভার উপযুক্ত ভাবরাশি মনে লইয়াই।

ধ্যান করিতে ইচ্ছা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সদা সংসার-বিস্মৃতত্ব, উদভ্রান্ত, উন্মনাভাব। উচ্চ ভূমিকায় মনের পুনঃপুনঃ আরোহণ। আবার "মা—মা" বলিতে বলিতে পুনঃ অবরোহণ। মাতৃত্বের অবমাননা বাংলায় সহজিয়া যুগে ষোলকলায় সংঘঠিত হইয়াছিল। অতি কদর্য ঘৃণিত, পতিত বৌদ্ধ তন্ত্রাচারের আবরণে ব্যভিচারের চরম। কঠিন পরকীয়া প্রেমের নামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমপাবননামে, কলঙ্ক-কালিমায় সমাজ-দেহ তখন জর্জরিত ভরপুর। ব্রাহ্ম-আন্দোলন এই স্রোতে প্রবল, প্রয়োজনীয় বাধা প্রথম দেন। তারপর জননী আপনি এবার সোহাগের রামকৃষ্ণ বিগ্রহে মূর্ত হইয়া বাংলাকে "মা" বুলি শিখাতে এসেছেন। বাংলার লাঞ্ছিত নারীর গভীর মর্মবেদনা "সর্বতঃ শ্রোত্রঃ সর্বতঃ চক্ষুঃ" মায়ের পরাণে বাজিয়া উঠিয়াছিল। তাই এবারে সমগ্র জাতির অপরাধের জন্য দক্ষিণেশ্বরের আপনভোলা পূজারীর, বরষ বরষ ব্যাপী তিল তিল করিয়া আপনার উপরই প্রায়শ্চিত্ত-বিধান। অপূর্ব আত্মবলিদান। আপনি আচরি জীবে, এই মহাশিক্ষা দান। এত চড়াভাবে তিনি শক্তিপূজা শিখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ ঘরের যাঁহার যাঁহার দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছে সকলকেই এই পরম বিদ্যায় পারদর্শী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তবে আমরা ভোলানাথের সন্তান। তাই এ শিক্ষা শীঘ্রই ভুলিবার আশঙ্কা।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেদেহে কুণ্ডলিনী শক্তির পিপীলিকা, ভেক, বানর, পক্ষী. সর্প ইত্যাদি প্রত্যেক প্রাণীটির গতিযুক্ত হইয়া, নিম্নস্থান হইতে উর্দ্ধদেশে আরোহণের কথা কহিয়াছেন। আবার নিজ শরীরগত পাপপুরুষের দহন, তাহাও বলিয়াছেন। মানবত্বের দিক দিয়া, সাধকভাবের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ইতিহাসে কোনযুগে এক শরীরে অতগুলি সাধন-প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় নাই। তিনি পিঁপড়ের নিঃশব্দ গতিতে শ্যামের নূপুরধ্বনি শুনেছেন! তিনি কেমন, কত বড় দরের সুন্দর শিল্পী, ক্রান্তদর্শী, সূক্ষ্মধী—কবি, কে জানে? কচি সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে লোক চলে গেছে। চৈতন্যময় মহৎ সত্তায় সদাজাগরূক শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা দেখিয়া বড় কষ্ট হইতেছে। তাঁহারও বুক, সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই [illegible] হইয়া উঠিল। অপূর্ব ভাবতনুর উপর—ভাবের অপূর্ব প্রক্রিয়া। সচরাচর এরূপ দৃষ্ট হয় না। একজনকে, একজন নির্দয় প্রহার করিল। তাঁহার পিঠে সেই আঘাতের দাগ কোথা থেকে আসে? চৈতন্যযুগে বাংলা একবার চরম ভাবসাধনা করিয়াছিল। রামকৃষ্ণলীলায় তাহাই আবার পুনঃ জাগরূক হইল। লোকের ছাতা লাঠি রাখার রকম দেখে তিনি তাদের স্বভাব ধরেছেন। কারুর কারুর ভিতরটা, কাঁচের গ্লাসের মত চোখের সামনে প্রকট দেখছেন। কাহাকেও কাহাকেও নিকটে টানিয়া জগদম্বার কাজে লাগাইবেন বলিয়া, শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘুমন্তে—জাগ্রতে পরীক্ষা করিয়া লইয়া সন্তানত্বের তিলক মাথায় পরাইয়া দিয়াছেন। স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দপ্রমুখ অনেক সন্ন্যাসীই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। লুচির ফুল্কোর ঘায়ে আবার এক সময়ে তাঁর জিব কেটে গেছে। তখন তিনি কোমলাদপি কোমল। ঘন ঘন সমাধি-স্রোত শরীরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়া তাঁহার অস্থিপুঞ্জকে অপূর্ব অসাধারণ ভাবে বাঁকচোর করিয়া, বিভিন্ন মুদ্রায় নমিত করেছে। 'জিমনাষ্টিক'—কুচকাওয়াজ কসরতীতে সেধে, ইচ্ছাপূর্বক অতটা আনা যায় কি না সন্দেহ। পরমহংসদেবের শরীরে যে অস্থি ছিল, তাহা শিশুতেও বলিবে। কিন্তু পূজনীয় রামকৃষ্ণানন্দ বা শশীমহারাজ তাঁহার কোন এক সেবককে একদিন বলেছিলেন,—"ওরে আমি বলছি, তাঁর অঙ্গ-সেবা করে দেখেছি, তাঁর শরীরে হাড় ছিল না"! ইহা আক্ষরিক সত্য নহে। কিন্তু ভাব-সাধনা করিতে করিতে, যুগাদর্শ যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী তনু কিরূপ কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল—শশীমহারাজের উক্তিটি এই দিকের সাক্ষ্য হিসাবে লইতে হইবে নিঃসন্দেহ।

হে রামকৃষ্ণ-রসিক নব্যবঙ্গ! Ecco Homo! তাঁর দিকে তাকাও।

ছাখো ছাখো, "তাঁর প্রসন্ন বয়ান—চিত্তবিনোদন। ভুবনমোহন।" আমরাও কি ইঁহারই? যদি সত্যই তাই হই, তবে সূক্ষ্মরাজ্যে আমাদেরও তৎপ্রসাদে দৃষ্টি খুলিতে বাধ্য। আমরাও যে ইঁহার নির্দিষ্ট—ইঁহারই অভিপ্রেত পথে চলবার চেষ্টায় আছি। ভক্তের ভয় কি? দ্বাপরে প্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী আজও ভক্তমুখে ঝঙ্কৃত হইতেছে। বাপকা বেটা হইতেই হইবে। তিনি "কুছ্ কুছ ভি" অন্ততঃ করাইয়া লইবেন। তিনি যেন সদাই বলছেন, হে কর্মরত! একবার একবার অন্ততঃ নিরত, বিরত হও। আমায় ছাখো—আর জীবনে—জীবন মিলিয়ে নাও। ভাবো—কোন্ পথে চলেছ? কেনই বা চলেছ?

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যেন মহাসমুদ্ররূপে রয়েছেন। বিশাল, বিরাট। আর আমরা হাঁড়ির মাছ। মহাসমুদ্রের তীরে দীর্ঘকাল স্থিরচিত্তে বসিয়া থাকিলে মন যেন অনন্তে মিশাইয়া যায়। নিজের অজ্ঞতা, ক্ষুদ্রত্বভাবনা কোথায় উড়িয়া যায়। তাই নিত্যঅভ্যাস কিছুক্ষণ প্রয়োজন।

দিব্যচক্ষে কল্পনা করা যায়—করিতে লাগে ভালো, সমবেদনা মাখানো শ্রীবিবেকানন্দের পদ্ম-অক্ষি-শোভাধারী অপরূপ মনোহারী মুখশ্রী। তীরবিদ্ধ—দরদরধারায় ধরণী-বিলুণ্ঠিত, আঘাতপ্রাপ্ত, স্নেহের শাবককে পক্ষীমাতার ন্যায় পরম দরদের সহিত আলিঙ্গন করিয়া, তিনি আমাদের ঘন ঘন সান্ত্বনা দিতেছেন। শরীরে সর্বত্র রোমাঞ্চ-পুলককর, তাঁহারই মধুরিমাময় সুখস্পর্শ। আর শিরে আশীর্বাদের সুকোমল কর-রেখা। বলছেন, বৎস! বেশ, বেশ!—কিন্তু বাছা, আরও এগিয়ে যেতে হবে। Excelsior—Higher, higher, still, Bravo, my dear children, my darlings! দূরে—বহুদূরে। "যোজন—যোজন সে বিস্তার। অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে।······ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা, শত শত বিজলী-প্রকাশ।·····শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর··· ··এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান······বাজে তথা অনাহত নাদধ্বনি।—তব বাণী।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্ময় জীবনের দীপ্তিতে

দেবাদিদেব মহাদেব, মানবকুল-তিলক শ্রীরামকৃষ্ণের একজন শ্রেষ্ঠ ভাববাহী, বেলুড় রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও মিশনের নরেন্দ্র-নির্বাচিত (আজীবন) সম্পাদক, যুগগুরুর উপযুক্ত ভাব-ব্যাখ্যাতা লোকনায়ক ধীর, গম্ভীর, সদা-অচঞ্চল শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দকে গ্রন্থাবশেষে বিশেষভাবে স্মরণ হইতেছে। কারণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বোধপথে তিনিই আমাদের সত্য সত্য হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। খেই ধরাইয়া গিয়াছেন। বুঝিবার ও বোঝাইবার তিনিই হেতু। তিনিই আদর্শ। ব্যক্তিগতভাবে তিনিই মূল। তিনিই উপলক্ষ্য। চক্ষের সমক্ষে—দীপ্তিমান রবিবিম্ববৎ সর্বদা বিরাজমান। অধ্যাত্ম মহাকাশে প্রোজ্জ্বল ভাস্কর। অপূর্ব স্নেহকোমল। অথচ কর্তব্যে কঠোর। উচ্চদিকে তাকাইবার তিনিই অধ্যাত্ম-দৃষ্টান্ত। ভবজলধিপারের তিনিই কাহারও কাহারও নৌকা বা মহাসেতু। কেমন হতে হয়—তাহাই। তিনি পথ-প্রদর্শক। তিনি তীর্থঙ্কর। শুদ্ধ মুক্ত, বুদ্ধ।

আমাদের চারটির উপর পাঁচটি কাজ-পড়িলে, ঝঞ্ঝাট বাড়িলে, জপতপ ভুলিয়া যাই। মেজাজ খিটখিটে, হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞান-বিবর্জিত হইবার উপক্রম হয়। এক আধারের সহিত আর এক আধারের কি বিপুল ব্যবধান! তিনি কিন্তু কাজের বোঝা, কাজের স্রোতের মধ্যে—চরম কর্ম-তন্ত্রের মধ্যে—চরম শান্ত সমাহিত ভাবের কমছবি। জ্বলন্ত সাহস। বিশাল বুকভরা বিশাল সাহস। বলরামবাবুদের কৌলিক গুরুপুত্রের একবার মারাত্মক বসন্ত ব্যাধি। তিনি শান্তভাবে নিজেই সেবাভার লইলেন। যোগসংসিদ্ধ, স্থিতপ্রজ্ঞ ঐরূপই হয়েন। যার আমলে যখন তাঁর দম ফেলিবার সময় থাকিত না এবং পরেও—তিনি কোন দিন নিত্যকার আত্মচিন্তন-অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে দেখিলে, কাছে থাকিলে, শাস্ত্রবোধ সুগম হইত।

দেখিতাম,—তাঁর বিরাট মন যেন পদ্ধতি শৃঙ্খলার অটুট পাষাণে নির্মিত। যেন একটি বহু প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ। রাজ অট্টালিকা। দৃষ্টান্ত দেওয়া শক্ত। মনের যেন একটার পর একটা, তারপর আর একটা—কুঠরী। একটি —স্তরের পর স্তর সংন্যস্ত "বিংশ-কৌটা"র প্রতীক। একটার পরদা যেই পড়ে

গেল, একটার তালাচাবি বন্ধ হল। আর একটার কাজ সুরু হল। নূতন অধ্যায়। নূতন পর্যায়। নূতন কাঠামো। নূতন টাট। আর তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আর এক নূতন—পৃথক মানুষ। প্রথমটার চিন্তা যেন একদম ভুল। মনমত্তকরীর উপর কি বিপুল—অধিকার! হ্যাঁ, বলা চলে, জীবনে অন্ততঃ একটি অসীম মন-বল-বিশিষ্ট সাধু, শক্তিমান পুরুষ-প্রবরকে দেখা গিয়াছে। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর শরচ্চন্দ্র অকপটে ঈশ্বরার্থ কঠোর তপশ্চরণের ফলেই এই সব গুণ অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, নিঃসন্দেহ।

শরচ্চন্দ্র নরেন্দ্র অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। দুই জনেই,—উত্তরকালের দুইটি ঘনিষ্ঠবন্ধুই একই সন্ন্যাসরোগে হঠাৎ আক্রান্ত হইলেন। একজন কয়েকদিন রোগ ভোগের পরে তনুত্যাগ করিলেন।

সন্ধ্যা ছয়টায় গৃহস্থের ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে—দুই বৎসরের শিশু শ্রীমান নরেন্দ্র যখন সিমলায় আধ-আধ মধুমাখা বুলি বলিতে বলিতে হামাগুড়ি ছাড়িয়া, একটু একটু চলা সুরু করিয়া মায়ের প্রাণে আনন্দের ঝলক, আনন্দের ফোয়ারা তুলিতেছিলেন—নরেন্দ্রদের সহর কলিকাতার অপর এক নিকটবর্তী পাড়ায়, পটলডাঙ্গায় ইং ১৮৬৫, ২৩ ডিসেম্বর, লোক-পরিত্রাতা প্রেমময় ভগবান যিশুখৃষ্টের সত্তাবিশিষ্ট ও সেই আচার্যেরই জন্মকাল-সমীপবর্তী দিবসে,—প্রকৃতিগত সংসারের সর্ব শৈত্যের মধ্যে—ঐশীতপ্ততা, ঐশীসংস্পর্শ ও ঐশী ভালবাসার নিবিড়, সদা ক্ষমাময় কেন্দ্রস্বরূপ নরেন্দ্রের সাধের সহচর—এই বীর মহামানবের শ্যামতনুর অপর এক প্রসূতিবক্ষে শুভ উদয়কাল। দেবীভক্তির সূক্ষ্মতন্তুতে গঠিত—দেবীভক্ত,—উত্তরকালের এই ব্রহ্মময়ীপ্রাণ মহামানবের—দেবীর বার—শনিবার,—দেবীরই অঞ্চলনিধিরূপে মায়ের কোল জ্বল-জ্বলাট্ করিয়া যেন মার কাজের জন্যই জগতে আসা। পৌষ শুক্লাষষ্ঠী।

জীবনোদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ মহাদর্শের সেবক—বাহ্য বাক্‌রোধ-অবস্থায় যখন, তিনি আমাদের সমক্ষে শয্যাগ্রহণ করিলেন—সেও অপর এক শনিবারেরই সন্ধ্যা। শ্রাবণ মাস। তখন সেই সবেমাত্র 'উদ্বোধন'-মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঠাকুরাণীর সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি নিথর হইয়াছে। যোগী শরচ্চন্দ্রও যেন মহাসমাধিযোগে তনুত্যাগ-মানসে মহাশয্যায় শায়িত হইলেন। মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণের সুর সৈন্যদলের পরম নায়ক—যাঁহার শ্রীমুখ হইতে সুদীর্ঘ ত্রিশবর্ষ কত সাধু, কত ভক্ত, কত কর্মী, কত ত্রিতাপতাপিত সংসার-মরুযাত্রী—পথের ইঙ্গিত-উপদেশ যুগের পর যুগ শুনিয়া

ধন্য হইতেছিলেন—সেই মহামানবের মুখ আজ জগন্মাতা বন্ধ করিলেন। শরচ্চন্দ্র ছিলেন নাদ-সাধক। তাঁহার সুকণ্ঠের মধুর গম্ভীর আরাব—সব সুর স্তিমিত হইল—ধীরে ধীরে মহাকাশে বিলীন হইল। জীবনের তালে, জীবনের ছন্দে, জীবনের গানে চির-সোম আনিল—কবি কথিত 'শ্যাম সম মরণ' আসিয়া দেখা দিল। ত্রয়োদশ দিবস শরচ্চন্দ্র সঙ্ঘের সকলকে—ভাবতের দূরাবস্থায়ী ও নিকটস্থিত—সকলকেই শেষ দেখা দিবার জন্যই যেন বাক্য-হারা, শব্দবিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন।

যাঁহার ভিতরে—ব্যক্তিগত কুৎসা-নিন্দাবাদ প্রবৃত্তির তিলমাত্র স্থান ছিল না, সাধারণ মানবের স্তর হইতে অতি উচ্চ, প্রায় কল্পনাতীত মনোভাববিশিষ্ট, মানবের সর্ব দুর্বলতা পরিজ্ঞাত অথচ চিরদিন মানববন্ধু, মহিমময় চরিত্র—এই পুরুষসিংহ, এই সিদ্ধসাধক সন্ধ্যা দেবীর কৃষ্ণাঞ্চলে দেবীর কোলে কালীক্ষেত্র কলিকাতাতে দেহ ধারণ করেন। আবার শ্রীমতী সারদারূপিণী সেই শ্যামামায়ের লীলাস্থলে ঐ সহরেই, মায়ের বক্ষের ধন, মায়ের অশেষ কৃপাসিদ্ধ, তাঁর নিজ ভাষায় মায়ের "দারোয়ান"—দেবীর তিরোভাব কক্ষের ঠিক সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে, মহানিশায় নিঝুম রাতে, মায়েরই কৃষ্ণাঞ্চলে তাঁর প্রিয়, কালো মায়ের কালোছেলে শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্রের শেষ শ্বাসত্যাগ। সুন্দর মিল। দেহত্যাগ—লক্ষ্মীরূপিণী দেবীরই বারে। লক্ষ্মীবারে, শাক্ততন্ত্রোক্ত মহানিশায়—রাত্র ১টার পর। ১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৩৪, ইং ১৮ অগস্ট, ১৯২৭।

কালীনামে মাতোয়ারা শ্যামামায়ের স্নেহের বালক—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের পরমশুভ সাক্ষাৎকার—তাঁহার উনবিংশতি বৎসর আন্দাজ বয়সকালে। আর যখন তিনি একবিংশ বৎসরের বলিষ্ঠ যুবক, তখন নরেন্দ্র, যোগেন্দ্র, রাখাল, বাবুরামাদি তাঁহাদের সকলকে কাঁদাইয়া, শ্রাবণসংক্রান্তির এমনি এক মহানিশায় নিরাকারা শ্রীশ্রীতারায় ইং ১৮৮৬তে শ্রীরামকৃষ্ণ চিরবিলীন হন।

জগৎজোড়া বর্ষায়, আকাশ-ফাটা বৃষ্টিধারার সহিত, যেন প্রকৃতিরাণীর ঝর ঝর শোকবারির অভিষেকে, পর পর কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীকে এইভাবে শোকসুরধুনীর স্রোতে ভাসিতে হইয়াছে। শ্রাবণের মহানিশায় পরমমঙ্গলরূপিণী দেবী শ্রীশ্রীসারদামাতার মঙ্গলবারে তনুত্যাগ। বর্ষারাত্রে নরেন্দ্রের তনু বিসর্জন। শ্রাবণধারায় বেলুড়মঠভূমিকে সিক্ত, প্লাবিত, অত্যন্ত

আর্দ্র করিয়া, তাহার বহুদিনের পালয়িত্রী মাতৃদেবীসম শ্রীপ্রেমানন্দের বেদাগ-নিষ্পাপ-দেহকে—চতুর্দিকে ভক্তনয়নের শোকতপ্ত বারিপাতের পরিধির ভিতর, অগ্নিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার স্নেহের পুত্তলীকে ফিরাইয়া লইলেন। আবার এই ঋতুতেই শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ শরৎ-হারা হইলেন। তাহার প্রাসাদচূড়া, মাথার তাজ, তাহার অপূর্ব গঠনকারী নিজের স্বতন্ত্র গঠন, স্বতন্ত্র সত্তা মহাভূতে মিলাইয়া দিলেন। দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের দিকপাল শশিমহারাজের তিরোধানও এই ঋতুতে। শরতের সমীপ কামরায়।

ইঁহাদের সকলকে শ্রদ্ধা করা, পূজা করা—জীবনের সর্ব ঘটনাবলী আলোচনা করার মূল অর্থ কি ? অর্থ—মহান চরিত্রের পূজা। অধ্যাত্মভাবে ভরপূর হইবার জন্য কর্ম করা। চেষ্টা করা। ভজন করা।

জ্ঞানময়-কঠ-শ্রুতির উক্তি—"মহান্তং বিভুং আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।" মহান—বিভু-আত্মাকে জানিলে ধীর ব্যক্তি শোক করেন না। আমরা বলি, মহতের চরিত্র আলোচনা করো। তুমিও ধীর হইবে।

নন্দকুলচন্দ্রমা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাকেই গীতামুখে ভিন্ন আখ্যা দিয়া ধনঞ্জয়ের সমক্ষে ধরিয়াছেন। তিনিই ঈশ্বর—যিনি লোকত্রয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই পরমাত্মা। তিনিই উত্তমঃ পুরুষ। পুরুষোত্তম—১৫।১৭ ॥

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বা তাঁহাদের ভাববাহী সকলেই এই ঈশ্বর জ্ঞানের, পরমাত্মজ্ঞানের, পরাভক্তির, আত্মজ্ঞানের উদ্দীপক। উৎসাহদাতা। উদ্বোধন-কারী। তাঁহাদিগকে সম্মান করার অর্থ—তাঁহাদের চরিতকথা চর্চা করার অর্থ—এই আত্মজ্ঞানের আদর্শকে জীবনে মর্যাদা দেওয়া।

পর পর তিন চারিটি কন্যার পর মাতৃক্রোড় আলো করিয়া প্রথম পুত্রসন্তানরূপে শরচ্চন্দ্র দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তাই বড় ছেলের আদরযত্নও যে বড়দরের হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'জায়তে'র পর—'বর্দ্ধতে'। জন্মের পর বৃদ্ধি। তিলে তিলে দিনে দিনে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর খুব মোটাসোটা গোল-গাল গড়ন ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, হেয়ার স্কুলের সহাধ্যায়ীরা এইজন্য তামাসা করিয়া বালক শরৎচন্দ্রকে—'ফুটবল' নাম দিয়াছিল। আবার শৈশব হইতেই তাঁহাতে—তাঁহার জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ উপাদান, অসাধারণ সম্পদ—বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুপরিচিত ও ঐ সঙ্ঘের বৃদ্ধির মূল উপাদান, শরৎ মহারাজের সহনশীলতাগুণ দেখা দেয়। বলিতেন—

সাথীদের কিল চড় খাইতাম। পাল্টা প্রতিদান বড় একটা প্রায়শই করিতে জানিতেন না। সহপাঠি হরিপ্রসন্ন—শরৎ স্কুলে লেখাপড়ায় মাঝারি, আমি ভাল ছেলে।

ক্রমে ক্রমে এফ-এ পাশ করিয়া ফেলিলেন। শরীরে শক্তি ছিল অসাধারণ। নরেন্দ্রদের সিমলা পল্লীর অতি সন্নিকটে, তখনকার পান্তীর মাঠের আখড়ায় (এখন সেখানে বিদ্যাসাগর হোস্টেল) কিছুকাল শরীর-চর্চা করিয়া খুব পটু, দৃঢ়স্নায়ুবিশিষ্ট ও কর্মঠ হইয়া উঠিলেন।

পিতা গিরিশচন্দ্র পুত্রকে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার বানাইবার জন্য পাঠাইলেন। ছেলের ঐ বিদ্যা লাভে কাজের সুবিধা হইবে ভাবিয়া, ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের স্বপন দেখিতে দেখিতে পিতা ঔষধপত্রের একটি দোকানও খুলিলেন।

ইতিমধ্যে উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক শরৎচন্দ্র, ব্রাহ্মসমাজ হইতে জীবনালোক পাইবার আশায় ব্যর্থ হইয়া, অধ্যাত্ম-"বস্তু" লাভের জন্য ব্যাকুলভাবে চাতকবৎ পথপানে চাহিয়াছিলেন। তবে ইহা নিঃসন্দেহ তখনকার ব্রাহ্ম-আচার্যদের সুদৃঢ় সুবিমল নৈতিক চরিত্র—তাঁহার স্বভাবসুলভ সংযম ভাবকে পরিপুষ্ট করিয়াই থাকিবে। ক্রমে সৌভাগ্যরবি জীবন-গগনে উদিত হইল। দক্ষিণেশ্বরের সমাধিমগ্ন যোগীর সাক্ষাৎকার লাভ হইল। অধ্যাত্ম-"বস্তু"ও কিছু পাইলেন। কেবল "বাগ-বৈখরী শব্দঝরী" নহে।

শুনিয়াছি, শরৎচন্দ্রের পিতা প্রথমটা পুত্রের এইখানে ঘন ঘন গমনাগমনে ইতিকর্তব্যতা ধার্য করিতে পারেন নাই। অনন্যোপায় হইয়া নিজ দীক্ষাগুরু শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পরমহংসদেবের কাছে পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য, তিনি পরখ করিয়া দেখিয়া বলিবেন—ঐ যোগীর সহিত মেলামেশায় শরতের অমঙ্গল হইবে কি না। গুরু—পরমহংস দেখিয়া আসিয়া শতমুখে বলিলেন—এমন মহাজনের সঙ্গলাভে শরতের ইহ-পারলৌকিক অশেষ মঙ্গল হইবারই কথা। মহাভাগ্যোদয় হইলে তবে সংসারের মানবের ঐরূপ মহামানবের সহিত দর্শনলাভ সংঘটিত হয়।

শরচ্চন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বার বার বাহিরে দেখিলেন। ভিতরেও তাঁহাকে পাইলেন। গিরিশচন্দ্র ও গর্ভধারিণীর স্নেহ—কোথায় ভাসিয়া গেল। এই প্রেমপাথারের তুলনায় গোষ্পদের সামিল হইল। ঈশ্বরলাভের টানে টানা পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"ওরে, তুই ডাক্তার হলে আর তোর হাতে খেতে পারবু নি বাপু"—সেই কথা প্রাণে খোঁচা

লাগাইতে লাগিল। পরে ডাক্তারী বিদ্যাশিক্ষা নিষ্ঠীবনবৎ ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার আত্মিকজীবনের একটি সম্পূর্ণ নূতনরূপ ফুটিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণের চরণরেণু শরচ্চন্দ্র, রামকৃষ্ণের আশ্রিত, রামকৃষ্ণের শরণাগত শরচ্চন্দ্রকে জগৎ পাইল—সত্য পাইল। আমরা পাইলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ অলক্ষিতে শরচ্চন্দ্রকে তাঁহারই জগৎজোড়া ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে—ভবরোগ নির্ণয়ের ও নিবারণের পরমবৈদ্যে পরিণত করিলেন।

তাহার পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া উত্তরকালে ক্রমে ক্রমে ইনিই, শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথের পার্শ্বচর হইয়া, প্রায় বাষট্টি বৎসর পৃথিবীতলে দেহস্থ থাকিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অতি উচ্চদরের, শ্রেষ্ঠ পতাকাবাহীতে পরিণত হইলেন। সাধুত্বের চরম শিখরে উঠিলেন।

লণ্ডনে থাকিবার সময় স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া জার্মাণীর মহামনীষী পণ্ডিত মোক্ষমূলার, পরমহংসদেবের চরিতকথা জানিবার ও প্রচার করিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া,—একটি সংবদ্ধ জীবনী লিখিয়া পাঠাইতে, স্বামীজীকে অনুরোধ করেন।

শরৎ মহারজাকে স্বামীজী বলিলেন—তুই একটা লেখ। আমি দেখে দেবো।

তাঁর আদেশে, স্বামী সারদানন্দ যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহাই অবলম্বন করিয়া জগৎ পাইল—ম্যকসমূলরের 'রামকৃষ্ণ-জীবনী ও উপদেশ'। স্বামীজী—লেখা পূর্ণ অনুমোদন করলেন। প্রত্যেক পাতা উল্টে গেলেন। কিছুই কাটলেন না। উহা অধ্যাপককে পাঠাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ কর্তৃক আদিষ্ট ও নরেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত, চিহ্নিত, মনোনীত হইয়া জগৎকে সারদানন্দ রামকৃষ্ণ কথা শুনাইলেন।

উত্তরকালে স্বামী সারদানন্দের ন্যায় একজন অসামান্য অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রলীলা—ধীরে ধীরে সম্যক চিন্তার পর, ধ্যান ধরিয়া মাসের পর মাস, সাময়িক পত্রে লিখিয়া জগৎকে শুনাইয়া ধন্য করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ-লীলার অত্যদ্ভুত ভাব-ব্যাখ্যাতা নব-ব্যাস-রূপী শরৎ মহারাজ।

এ হেন ব্যক্তি শেষজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের চরিতকথার বাকিটুকু (কাশীপুর বাগানের ঘটনাবলী) লিখিয়া অমর 'লীলাপ্রসঙ্গ'কে পূর্ণ অবয়ব—সম্পূর্ণ গঠন দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে, একদিন বলিয়াছিলেন—"দ্যাখো, এখন দেখছি, ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছুই বোঝা হয়নি। তাঁর ইচ্ছা হয় ত, লেখা হবে।"

স্বামী সারদানন্দের এই বাণীটি মৌখিক বিনয় নহে। শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ,

যোগীন মা প্রভৃতি যাঁহাদের অবলম্বন করিয়া, তিনি ঠাকুরের কাজ লইয়া তাঁহার হোমাপাখীর ন্যায় ব্রহ্মমুখী, উর্দ্ধমুখী স্বভাব-গতিবৃত্তিকে বহুজনহিতায় নামাইয়া রাখিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় একে একে ঐ অবলম্বনগুলি—ঐ নোঙ্গরগুলি ভাসিয়া গেল। চলিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণময় তিনিও বুঝিলেন—অভিনয়ের অধ্যক্ষ তাঁহাকে রঙ্গপীঠ হইতে সরিয়া আসিতে ইঙ্গিত দিতেছেন। এই সময় তিনি কোন আবাল্য-সঙ্গপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারীকে, তাহার আত্মনির্ভরতার অভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার শরীর কি চিরদিন থাকবে? নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াও⋯ ⋯ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি পড়বার, দেখে নেবার ঝোঁক হয়েছে, দেখে নাও। ভাল। কিন্তু জেনো, বইএর ভেতর ভগবান নাই। তোমরা নিষ্ঠাপূর্বক জপতপ করতে পারো কই? তাই ঠাকুরের কাজ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে—ঐ দিকে বেশী মন দেবে। যদি কখনও খালি জপধ্যান করবার ইচ্ছা হয়, সব ফেলে তাই করবে। সাধনভজন না করলে—ঠাকুরকে বোঝা কখনও যাবে না।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দও বলিতেন—যদি একটা ছেলেও ধ্যানজপ প্রকৃতপক্ষে করে, তো তারই পুণ্যে একটা মঠ চলে।

বাবুরাম মহারাজ ও শরৎ মহারাজ ইহাও বলিতেন যে, কোন্ কেন্দ্রে অবস্থানের কালে সকলেরই ধ্যানজপ ছাড়া, কিছু কিছু অন্ততঃ ঐ কেন্দ্রের বাহ্য কর্ম করা উচিত।

ইংরাজী ১৯২৭শের প্রথম ভাগ। তখন স্বামী সারদানন্দ "ঘরমুখো"। যেমন তিনি স্পষ্ট বলতেন—"ওপারের পাসপোর্ট কাটাইয়া পুঁটুলী বাঁধিয়া" প্রভুর ডাকের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দিনের পর দিন, বাহিরের সব কাজকর্ম ছাড়িয়া, শরণাগত ভক্তদের তাঁহার নিকট ব্যক্তিগত গচ্ছিত অর্থ ও হিসাবের কাগজপত্র একে একে বুঝাইয়া ফিরত দিতেছিলেন। "সে আলোকে মহাসুখে আপন-আলয়মুখে" সংসারের প্রবাসপথ পরিত্যাগ-উদ্দেশ্যে, সব বাধা দৃঢ়হস্তে, সৈনিকের মত নিষ্কাসিত করিয়া, ভক্তবৃন্দের প্রেমের স্বর্ণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, যতই শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপসাগরে আন্তর-বিলীন হইয়া—স্বতন্ত্র সত্বার বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া—দরিয়ায় নিমজ্জিত, নিমীলিত হইতেছিলেন—সব অন্তরাল অপসারিত করিয়া কূলহারা রামকৃষ্ণ-পাথারের গভীরতা ততই উপলব্ধি পূর্বক—হয়ত বিমোহত শ্রীসারদানন্দ—পূর্বোক্ত উক্তি করিয়া থাকিবেন!

কে জানে? আমরা—অনুমান মাত্র করিতে পারি।

উপসংহার

মহাজনের কথা স্মরণ করিয়া ও করাইয়া আপনাদের বলিতে চাহি—আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি, অল্পাধারের পক্ষে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা কওয়া ও তাঁদের জীবনালোক জগতে ছড়াইবার প্রচেষ্টা বালসুলভ চপলতা বলিয়াই বোধ হইবে। গ্রন্থের প্রাণ ও বিষয়—উভয়ই প্রগাঢ়তায় ও অসীমতায় সাগর সদৃশ—উচ্চতায় গগনস্পর্শী। 'শিব মহিম্নের' কথা স্মরণ হইতেছে। সাগর যদি দোয়াত, হিমালয় কালি, পারিজাত গাছের শাখা কলম, পৃথিবী কাগজ এবং লেখিকা স্বয়ং বর্ণময়ী দেবী সারদা হইতেন এবং অনন্তকাল শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীসারদা-সমেত শ্রীবিবেকানন্দের জীবনপ্রসঙ্গ লিখনে অনুরত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাহার শেষ—তাহার পার, বুঝি পাইতেন না। ইহা কবিত্ব নহে। অতি সত্য।

পরিত্রাতা মেরীতনয়ের একজন শ্রেষ্ঠ ভাববাহী সাধু শ্রীপল মহোদয় কর্তৃক রোমকদের নিকট লিখিত পত্রের একটি বাণী স্মরণপথে ভাসিয়া উঠিতেছে।—রাত্রি অনেকটা কাটিয়াছে। দিন সমাগত ঐ। অজ্ঞান মোহাদির সহিত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী পরিত্যাগ করিয়া এসো, আমরা অধ্যাত্ম আলোকের সুদৃঢ় সংরক্ষণশীল বর্ম পরিধান করি। আমরাও এই সুরে সুর মিলাইয়া বলি—দেবী সারদা সমভিব্যাহারে দেব—শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র-রাখাল-বাবুরামাদিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত জীবনে অরুণ-উদয়কাল সমুপস্থিত। মোহময়ী ত্রিযামা বিগতা!—The night is far spent, the Day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on—the armour of *Light*.

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে কাতর-প্রার্থনা জানাইতেছি যেন, তিনি শ্রোতা ও বক্তা, পাঠক ও লেখক—উভয়কেই এই লীলা "বোধে বোধ" করাইয়া দেন! যেটুকু সামান্য আলোচনা এগ্রন্থে হইল তাহার ফলে জীবত্বের সংস্কার, জীবত্বের খাদ গলাইয়া 'কাঁচা আমি'কে সমূলে উপড়াইয়া উৎপাটিত করিয়া শিবস্বরূপতায়—শুদ্ধাভক্তি শুদ্ধজ্ঞানের হেমময় প্রভায় হৃদিস্থ জন্মজন্ম পুঞ্জীভূত গহনান্ধকার বিদূরিত হইয়া যায়। কারণ তাহাই গীতাবক্তার উক্ত—সেই মহান্ লাভ, যে লাভ ঘটিলে জগতের যাবৎ লাভই অলাভ হইয়া যাইবে।

ঈশামুখে আমাদের গদাধরেরই বাণী—I am the Light of the world he that followith me shall not walk in darkness but shall have the light of life. আমি পৃথিবীর আলোক স্বরূপ। যে আমাকে অনুসরণ করবে তার আঁধারে আসা যাওয়া ঘুচবে। সে জীবনে আলোর সন্ধান পাবে।

পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় বহুলোক যে জ্ঞানভক্তিপিপাসু হয়ে, তাঁর কাছে আসতেন, ইহা শুধু 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কারই বলেন নাই। তাঁহার অ-শিষ্য স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার কোন সমসাময়িক লেখক ইংরেজী ১৮৮৪ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখের কাগজে দেহস্থ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"A Hindoo *Jogee* lives in this holy place (Dakhinesvara), who is respected by all. On Sundays and holidays many come here from Calcutta and the neighbouring villages to pay their respects to this venerable man. His disciples are increasing in number daily.........this once solitary and deserted village has become the regular resort of devout men."

অস্যার্থ—এই পবিত্র দক্ষিণেশ্বর গাঁয়ে একজন হিন্দু যোগী থাকেন। এঁকে সকলেই সম্মান করেন। রবিবারে রবিবারে এবং অন্যান্য ছুটির দিনে, কলকাতা এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেকে এই মহাশয় ব্যক্তির নিকট আসিয়া, ভক্তিজ্ঞাপন করেন। তাঁর শিষ্য-সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আগেকার সেই নির্জন এবং লোক-পরিত্যক্ত দক্ষিণেশ্বর গ্রামখানি এখন রীতিমত পিপাসুভক্ত সজ্জনের সমাগমস্থলরূপে পরিণত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব চরিত্র জগতে তাঁহার অমোঘশক্তি পরিব্যক্ত করিতেছে। সে পূজার উদ্বোধন শ্রীনরেন্দ্র করিয়া গিয়াছেন। পুরাণের অবতার লক্ষণ সকল (বিশেষতঃ, সকল মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির ক্ষমতাটি) শ্রীরামকৃষ্ণ মিলাইয়া পাইয়া যে বহু সজ্জন তাঁহাকে ভগবান আখ্যা দিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি! কিন্তু এইমাত্র বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যকে অবতারের আসন দিয়া আমরা যাহাতে তাঁহার শিক্ষার প্রভাব আমাদের স্বভাবের উপর ফিরিয়া পাই, তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া বিশ্বাসী যাঁহারা, তাঁহাদের ভিতর এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি তাঁহারা করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু, অন্য অবতারের সম্মান যেন খাটো করার

চেষ্টা না হয়। তাহা হইলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত নরেন্দ্রোক্ত "অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়"-সৃজন সার্থক হইবে। আমাদের আত্মোন্নতির চেষ্টা ষোল-আনা চাই! ভাবের ঘরে ফাঁকি যেন না থাকে। সাধনের উপর দৃষ্টি চাই।

হে বীরেশ! হে বিবেকস্বামিন্! তুমি মাতৃভাষায় বাংলার নরনারীকে উদ্বোধিত করিবার জন্য উদ্বোধন মন্ত্র—সমগ্র জাতির জাগরণ মন্ত্র গাহিয়া গিয়াছ। পরদেশীর বচনেও, বিশ্ববাসী সকলকে আপনার জ্ঞান করিয়া প্রবুদ্ধ ভারতের কথা,—জাগরিতা, চৈতন্যবিচ্ছুরণকারিণী জননীর সাধনোদ্দীপ্ত তপোবনের বাণীদিকে দিকে শুনাইয়া মানুষকে উচ্চতর—উচ্চতম আদর্শের সন্ধান দিবার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ। ১৮৯৭ সালের প্রথমভাগে অধ্যাত্ম দিগ্বিজয়ী সার্ব্বভৌম, অশেষ শক্তিসম্পন্ন নানাগুণালঙ্কৃত বীর তরুণ-আচার্য্যরূপে পাশ্চাত্য হইতে—তুমি ফিরিয়া আসিলে। পরম কৃতী। হইলে তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমাকে লইয়া সাধ-আহ্লাদ করিবার জন্য, তোমার গর্ভধারিণী একদিন ঐ সময়ে গিরিশচন্দ্রের বাটীর সম্মুখে মা সারদা দেবীর ভাড়াটীয়া বাটীতে তোমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি কিছুতেই তোমার কাছছাড়া হইতে সেদিন চাহেন নাই। আর তুমি তাঁহার মন আরও উচ্চে লইয়া যাইবার সহায়তা জন্য পুনঃপুনঃ গর্ভধারিণী জননীকে তোমার উপর দেহাত্মিকা মমতা ছাড়িয়া, জগন্মাতার পরিপূর্ণ প্রকাশ—শ্রীসারদাদেবীর কাছে—উপরে গিয়া তাঁহার পূতসঙ্গে ধন্যা হইতে,—বেশীকাল কাটাইতে বলিলে। ভুবনেশ্বরী দেবী বালিকার মত বলিলেন,—যাবো'খন। তুই অত ব্যস্ত হয়ে আমাকে তোর কাছ থেকে তাড়াচ্ছিস্ কেন?

ভারতীয় গণচিত্তের চেতয়িতা তুমি। নিরাশের আশা। পদদলিত নিষ্পেষিত নির্ধনের তুমিই সহায়। সম্পদ, আশ্রয়। শরণ। আশীর্ব্বাদ করো, যেন তোমার শ্রীপদাঙ্ক অনুসরণে প্রবৃত্ত যাঁহারা—তাঁহাদের কলিজায় কলিজায় নির্ভরতা, জ্ঞানভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা ফুটিয়া উঠে। বলো, তোমার সেই মেঘমন্দ্রস্বরে—সুমিষ্ট অথচ সুগম্ভীর আরাবে—Once more Awake!··· strong, steady, blissful, bold and free··· ···no death for thee! Awakener, ever forward, speak thy stirring words, জাগো আরো একবার···তব মৃত্যু নাহি কদাচন।······আনন্দমগন, শক্তিমান, মুক্তবীর, হে স্থির! হে সুপ্তিহারা, চিরাগ্রণী, ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী!

From dreams awake, from bonds be free! Be not afraid

—this mystery. স্বপন ছাড়ো। বন্ধন থেকে মুক্ত হও। আর ভয়াতুর হয়ো না। ইহাই স্বাধীন জীবনের রহস্য।

সেই শিবরাত্রির পর ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া ঘনায়মানা। এমনি এক বসন্তের মধুময় ফুলসাজে সাজিয়া, দক্ষিণবাহী মৃদুমন্দ পবনান্দোলনে আন্দোলিতা বঙ্গ-প্রকৃতি—ভারত-ধরিত্রী একশত পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন! সঙ্গে সঙ্গে সসাগরা ধরণীকেও কৃতকৃতার্থা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্য ভারতের ও পৃথিবীর মনোগত ও আত্মগত সর্বপ্রকার গ্লানি, সর্বপ্রকার কপটাচার, মিথ্যাচার বিদূরিত করিবার জন্য কামারপুকুর গ্রামের এক সরল গ্রাম্য বালকের বেশে উদয় হইয়াছিলেন। চিদ্‌ঘনকায় চৈতন্যময়—সেই অনন্ত ভাবময় জীবন-মহাকাব্য, পর্বে পর্বে একটির পর একটি অধ্যাত্ম সাধন কালীবাড়ীর নির্জন বেষ্টনীতে কলিকাতা রাজধানীর অতি সন্নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। শ্যামার পূজারী ছিলেন স্বভাবসুলভ ভাবে ভরপুর—কৃত্রিমতার লেশমাত্র পরিশূন্য।

ফাল্গুনী একাদশীর পর শিব মহাচতুর্দশী। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যা ব্রত। পর পর তিন ব্রত উদ্‌যাপনের পর বঙ্গ পল্লীপ্রকৃতির কোল আলো করিয়া গদাধর-রত্ন আসিলেন। ইঙ্গিত এই। তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে আবার পাইতে হইলে ভক্তকেও ব্রতধারী হইতে হইবে। সুসংযত ক্ষেত্রে তাঁর উদয়। বলিয়াছেন, খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এলো। বল্লে, আমি যুগে যুগে অবতার···পূর্ণ আবির্ভাব। সত্ত্বের ঐশ্বর্য্য। তিন জেলার মিলন-সমন্বয় ভূমিতে অবতরণ।

বেলুড় মঠভূমিতে আচার্যপাদ বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও অনেকটা ইঙ্গিত মত বিরাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেউল দেখা দিয়াছে। ভক্তপ্রাণ সেই দিনের জন্য ব্যগ্র, বিশেষ সমুৎসুক ছিল। জন্ম-শতাব্দী অনুষ্ঠান, পালন ও উদ্‌যাপন করিবার জন্য ভারতের দিকে দিকে প্রদেশে প্রদেশে কর্মীর দল সাজ সাজ-রব তুলিয়া—"আজি শতেক বরষ পরের"-গীতিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া, মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতে নবজাগরণ আসিয়াছে। জাতি তাহার মহাজনদের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতে চাহিতেছে। দীর্ঘ দুই বৎসর ভারতের স্থানে স্থানে, বাহিরেও রামকৃষ্ণের শতবার্ষিক জন্ম-জয়ন্তিয়া নানাপ্রকারে সমনুষ্ঠিত হইয়াছে। আজিকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শ আলোচনা বিশেষ সময়োপযোগী। আবহাওয়ার অনুকূল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন—শৈত্যের পর যেন বসন্ত সমাগমের সূচক। নববেশে

নবীন ঋতুরাজের বহিঃ-প্রকৃতির তরুতে তরুতে শাল-পিয়াল-অশোক-পলাশের লতায় পাতায় ফাগুয়ার লাল নিশানার জানান্ দিয়া আসা। মনোরাজ্যেও মানবের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরণ অন্তে—নিত্যনবীনতায় মধুমাসেরই ন্যায়, সচ্চিদানন্দ স্বরূপের আত্মপ্রকাশ। শুধু আনন্দোৎসবের মেলায়, খানাপিনাতে আমরা কি অবশ হইয়া যাইব, অবসন্ন হইব? নবযুবরাজ ঋতুরাজরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-জয়ন্তিয়া দিবসে শুচিশুদ্ধচিত্তে ভাবিতে হইবে—আমাদের জাতির বাহ্য জীবনোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনোন্নয়ন ও আত্মিক জীবনালোক-লাভ কতটা হইল? রামকৃষ্ণের জাতির লোক, রামকৃষ্ণের দেশের লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক—আমরা—কেবল এই বলিয়া ফাঁকা গর্ব করিলে ত চলিবে না। আমরা—যদি যুগাবতার, পতিত অবনতের ভগবান বলিয়া তাঁহাকে হৃদিস্থ কনকাসনে বসাইয়া থাকি—আমরা তাহার ফলে—প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে কত-দূর অগ্রসর হইলাম? আর—যদি তাঁহাকে মহামানব বা যুগমানবজ্ঞানে ভিতরে স্থান দিয়া থাকি, স্বীকার করিয়া, মানিয়া থাকি,—তাহা হইলেও—একই প্রশ্ন। —কি করিলাম?—কি হইলাম? কতটুকু অধ্যাত্ম-বস্তু ভিতরে সঞ্চিত করিলাম —'আত্মনো মোক্ষার্থং'? আর "জগতের হিতায়"—ভারতভূমির দশদিকে পরিপূর্ণ অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারত-ভারতীর জীবন—পরিপূর্ণ, ধন্য করিবার পথে কতটা তাহাদের আগাইয়া দিলাম? আত্মবন্ধু ও লোকবন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের চক্ষু ফুটাইয়া সেই আদর্শ জাজ্বল্যমান করিয়া গিয়াছেন। মুষ্টিমেয় মোক্ষমার্গী—জাতির "Salt of the earth" মাথার মণি, জীবনগতি-নিয়ামক। অভ্যুদয়কামী, ত্রিবর্গতুষ্ট সর্বসাধারণের উপর ইঁহারা সদাই প্রেম-নিবদ্ধদৃষ্টি ও সকলেরই হিতকারী। সর্বোপকার-করণে সদা আর্দ্রচিত্ত। প্রাচীনভারতে, স্বাধীনভারতে ইহাই সাধনেতিহাসের ধারা। অধ্যাত্মকে না ধরিয়া কর্মে নেতৃত্ব করিলে জঞ্জাল বাড়িবে। ধরিয়া করিলে, সবই অর্থপূর্ণ সরল হইয়া যাইবে। শাশ্বতকে পাইবার সোপান হইবে। দেহ ধারণ সার্থক করাইবে।

মনোময় ও আত্মময় জগতের মহান অধিনায়ক—সর্বধর্মের সাধক ও সংসিদ্ধ শ্রীশ্রীগদাধরকে আমরা কার্যে—জীবনে কতদূর 'ফলাইলাম' কতটুকু মর্যাদা দিতে পারিলাম? দেড় শতাব্দী অন্তে যেন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত অবনত অবস্থার প্রতীকার-কল্পে বদ্ধ-পরিকর হই। উদ্বুদ্ধ হই। সজাগ হই। কোন সমাজকর্মীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—অন্তরে সোনা চাপা আছে। যদি তার সন্ধান পেতো, বাইরের কাজ কমে যেতো।

হুজুগে হাবাতে কতগুলো লোক—আদর্শ কর্মবাদের ক্ষেত্রে কণ্টক-বিশেষ। আদর্শৈকপ্রাণ, পদে পদে ত্যাগস্বীকারে ইচ্ছুক, অল্পলোকের দ্বারা জগতে প্রভূত উপকার হয়। মেলা দেখিবার জমায়েতে চিরকালই মেলালোকের ঠাসাঠাসি দেখা যায়। কেবল সংখ্যার প্রতি—কর্মযোগীর লক্ষ্য না থাকাই ভাল। একদা বহু লোককে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-মহোৎসব প্রাঙ্গণে বেলুড় মঠভূমিতে দেখিয়া কোন ভক্ত বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। ভাব-ভক্তির প্রতি, আন্তরিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পরমাভিজ্ঞ জ্ঞানগুরু বিবেক মহারাজ বল্লেন—ওরে, এরা সব হৈ হৈ রৈ-রৈ করতে এখানে এসেছে। দেখতে পাচ্ছিস্ না। হুজুগ দেখতে, মাচাতে—মেলায় মাত্র মিলেছে। মনে করিস্‌নি, সকলেই ঠিক্ ঠিক্ ঠাকুরের ভক্ত। বা তাঁকে আদর্শ বলে স্বীকার করে জীবন যাপন করবার চেষ্টা করছে। তা হলে আর ভাবনা থাকতো না।

আদর্শ-পরিশুদ্ধি ও উহার উপর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া স্বামীজী একখানি ইংরাজী চিঠিতে লিখেছেন—যদি জীবনে দুএকটি নরনারীকেও অধ্যাত্ম ধর্মের সন্ধান, পথ দেখাইয়া থাকি, তা হোলেই আমার উদ্দেশ্য সফল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধন্য মনে করি।

তিনি চাহিয়াছিলেন—সেই শ্রেণীর চেলাদের, যাঁরা Unto the jaws of death মৃত্যুমুখ পর্যন্ত অচল অটলভাবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে সাহসী হবেন।

ইসলামের প্রথম ইতিহাস মনে পড়ে। দশ বার বৎসর প্রচারের পর, একেশ্বরের মহিমায় মস্‌গুল পয়গম্বর শ্রীআচার্য মহম্মদের পঞ্চাশটিমাত্র অনুবর্তী জুটে। আর ইরাণের পরমর্ষি পারসিক লোকগুরু জরথুষ্ট্রের প্রায় ঐ দীর্ঘকালেই —মাত্র একটি। মরিয়মপ্রাণ শ্রীশ্রীঈশার কথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং? পৃথিবীর ধর্মেতিহাস-আলোচনাকারীদিগের জন্য এই সব দৃষ্টান্তের ভিতর ভাবিবার অনেক উপাদান নিহিত। যে কোন অধ্যাত্ম ধর্ম-সঙ্ঘে যিনি যোগ দিয়াছেন বা যিনি কোন সঙ্ঘ-নিয়ামকতা করিতেছেন তাঁহাদের সকলেরই আপনাপন জীবন নিয়ন্ত্রণপথে,—এই দিকে সম্যক্ চিন্তার প্রয়োজন।

পবিত্রমূর্তি প্রেমানন্দের একদিনের কথা—"ঠাকুরের মহাভাব হয়েছে। তাঁকে ধরতে হবে। পড়ে—না যান। অতি সন্তর্পণে ধরে আছি। আর মনে মনে অতি কাতরভাবে সভয়ে বলছি, দেখো বাবা, 'আঁক' করে উঠো না।"

অর্থাৎ—যদি হঠাৎ আমার ভিতরে কোন কুচিন্তার উদয় হয় তাহা হইলেই তিনি শিহরিয়া উঠিবেন। মন, সাবধান!—তখন বাবুরাম প্রভুর বিশেষ চিহ্নিত ত্যাগীগোষ্ঠীর অনেকেরই ন্যায়—বালক।

—কথাটা প্রাণে লইবার। অপবিত্রতার লেশমাত্র ভিতরে আসিলে, রামকৃষ্ণপ্রাণ প্রেমানন্দ যেন আজও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরা হইবে না। গ্রন্থশেষে আমাদের সকলের এ কথা মনে রাখা বিশেষ বিধেয়। কঠ-শ্রুতিরও বচন, দুশ্চরিত হইতে অবিরত অশান্ত, অসমাহিতের আত্মজ্ঞান আইসে না। প্রজ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় (১।২।২৪)।

স্বামী সারদানন্দ একদিন একটি ব্যাকুলচিত্ত বালককে এইভাবে সমাধান দিয়াছিলেন। বালক বলিয়াছিল—মহারাজ! আমাদের এত গলদ,—সন্দেহ হয়, ঠাকুর কি আমাদের মত হতভাগাদের দেখা দেবেন?

উত্তরে, ব্রহ্মচারীকে অশেষ সান্ত্বনা দিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন—তাঁকে ডেকে যাও, বাবা। খাদ গলাইয়া, মনকে গড়ে পিটে তৈরী কোরে তিনিই নেবেন। তিনি দেখা দেবেনই। দেবেন। ভয় নাই। বিশ্বাস করো।

স্বামী সারদানন্দের রচা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া আমরা পরমশ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে গ্রন্থ-অন্তে শ্রীসারদানন্দের জীবনদেবতাকে বলি—

সর্বধর্মস্থাপকস্ত্বং সর্বধর্মস্বরূপক।
আচার্যানাং মহাচার্যো রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ—এই আনন্দই সুরা—প্রেমের সুরা। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য—ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা।...আত্মজ্ঞান হলে সুখ, দুঃখ, জন্মমৃত্যু স্বপ্নবৎ বোধ হয়।...ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু হিসাব করবার যো নাই। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য। মানুষ মুখে কি বলবে!......ঈশ্বর দর্শন হলে রমণসুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়।...নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়। নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।...এই পাখা যেমন দেখছি, সামনে—প্রত্যক্ষ—ঠিক অমনি আমি (ঈশ্বরকে) দেখেছি।...দেখলাম তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয়মধ্যে যিনি আছেন, এক ব্যক্তি।—শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীসারদাদেবী—(গৃহস্থদের প্রতি) তোমরা একহাতে ঠাকুরকে ধরো। অন্যহাতে সংসারের কাজ করো। তবেই বাঁচোয়া।—(সাধুদের প্রতি)—তোমাদের গাছতলায় দিন কাটাবার কথা। ঠাকুরের দয়ায়—খাবার, পরবার, থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে—তিনিই ক'রে দিয়েছেন। তিন পেরুলেই ফরসা। এইবেলা সময় থাকতে থাকতে খুব ক'রে ভগবানকে ডেকে নাও। খাটো। খাটো! এরপর আর পারবে না। এরপর এলিয়ে পড়বে—তখন কেবল জাবর কাটতে হবে।

ঠাকুর কি কারুর একলার জন্যে এসেছিলেন, কি জগতের জন্য?...তাঁর জীবন না বুঝলে, বেদ বেদান্ত—অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না।...তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে—ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে।—ভারতের দুই মহাপাপ। মেয়েদের পায়ে দলন। আর—জাতি, জাতি। গরীবগুলোকে পিষে ফেলা! ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ, তাঁর পূজোয় সকলের অধিকার। যে তাঁর পূজো করবে, মুহূর্ত মধ্যে মহান্ হবে। এবারের মাতৃভাব। তিনি স্ত্রীজাতির,—ইতর, উচ্চনীচ—সকলের উদ্ধারকর্তা।......এ সব কার শক্তিতে হচ্ছে। তাঁর।—তিনি আমাদের ভালবেসে বশীভূত কোরেছিলেন। আমি তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের দাস। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায় ইউনিভারসিটির ভূত-ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বোলে পূজো করেছে।......প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে—তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা

নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই। উদ্ভাবনীশক্তির উদ্দীপনা একেবারে নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখন কাটে না, প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জলছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।—আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন ত তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে।—(স্বামীজীর মূল পত্রাংশ)—যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশ-কাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম-খণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্ব-দৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া, লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।—এই নবযুগ প্রবর্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম-প্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর।—আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক—এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও—(স্বামীজীর মূল প্রবন্ধ।)

"আমরা অল্পদিন হইল, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘোরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি ও বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্তস্বভাব, কোমলপ্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্বদা যোগেতে আছেন।"—আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ইণ্ডিয়ান মিরার, ২৮ মার্চ, ১৮৭৫—অনুবাদ।

"মানুষ মাথা পেতে নেবে না। চোক চেয়ে দেখবে না। কেবল বাজে বকবক করবে। আসল জিনিস কে চায়? সৎপথে থাকার বাধা অনেক। মহামায়া সহজে ছেড়ে দেন না। তাঁর কৃপা পাবার জন্যে অনেক খাটতে হয়। সাবধান! অন্য ছাপ যেন না আসে। খাট্ খাট খাট। সময়ের ও বয়সের সৎ ব্যবহার করে নে—খুব advanced না হোলে নিরাকার ধ্যান হয় না। প্রথমে স্থূল, তারপর কারণ বা লিঙ্গ-শরীর, তারপর মহাকারণে লয়। মানুষের স্থূল শরীর কিছুই নয়।—খুব বিশ্বাস কর্। নাম আর ভগবান।

নাম—নামী এক করে ফেল্। ভগবানই নাম হোয়ে ভক্তহৃদয়ে বাস করেন। ভগবানকে খুব ডাকতে থাকো। নির্জনে একা বসে তাঁকে ডাকতে হয়।—শুধু কর্ম কল্লেই হবে না। ভগবৎভাব আশ্রয় কোরে কর্ম কত্তে হবে।—ব্রহ্মচর্যপরায়ণ মনুষ্যজীবনে অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হয়।—গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে, শুধু মন্ত্রতন্ত্রে কিছু হয় না।—ধ্যানের সময় এরূপ ভাববে—সংসার যেন মরুভূমি। তুমি যেন সেই মরুভূমির মধ্যে রয়েছ, শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে গাছতলা পেলে যেমন আনন্দ হয়, সেইরূপ তোমার ইষ্টরূপ গাছতলায় বসে প্রাণমন শীতল হবে। শান্তি অনুভব করবে।”——স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ হইতে।

“এক ঠাকুরের নামে মানুষ শান্তি কি, সুখ কি, আনন্দ কি বস্তু জানতে পারবে। মঙ্গলময়ের নামে সকল অমঙ্গল দূর হবে। মানুষ দেবতা হবে। জীব শিব হবে, বিশ্ব আনন্দে উন্মাদ হবে। খুব নিষ্ঠা করে প্রভুর সেবা পূজা করে যাও। মূর্খ পণ্ডিত হবে—ঠাকুরের নামের বলে। অসাধু সাধু হবে, অপবিত্র পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করবে, রামকৃষ্ণ নাম গ্রহণে।”—স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাংশ।

“কৃপা ব্যতিরেকে সাধনা দ্বারা কেহ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তবে, আন্তরিকভাবে সাধনাদি করিলে তাঁহার কৃপার উদয় হইয়া থাকে। ভগবানই গুরু।—প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, তাঁহাতে তোমরা একেবারে মগ্ন হইয়া যাও এবং মানবজন্ম ধারণ সার্থক কর ইহাই আমার প্রার্থনা।”—স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রাংশ।

“আগে ঠাকুর প্রণাম করে তারপর আমাদের—‘তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি’—তাঁর আলোকে সব আলোকিত। ‘তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং’—তিনি প্রকাশিত আছেন বলে সব প্রকাশিত আছে।—তিনিই আবার সচ্চিদানন্দ।”—স্বামী শিবানন্দের বাণী।

“অন্য দেশে মা শতহস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে! তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তান সকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত, ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদন-বিরহিত, রোগে জর্জরিত, তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শতদোষে দোষী কর! অন্যের পদাঘাতপীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক—কিন্তু দোষ কার?…জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন?—তিনি বলিপ্রিয়া। প্রতি কার্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থসুখত্যাগে আত্মবলিদানে, তাঁহার তর্পণ কর, তাঁহাকে প্রসন্ন কর, দেখিবে,

শক্তিরূপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি পুনরায় ফিরিয়া চাহিবেন!—আর তুমি, হে শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতা! তুমিও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও বীরেশ্বর শ্রীবিবেকানন্দ-প্রচারিত মহাসত্যসকল যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই অপারমহিম অপ্রতিহত-প্রভাব গুরুশক্তির কথা ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারে দৃঢ়বদ্ধপরিকর হইয়া—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'-রূপ অভয়বাণী উচ্চারণে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার কর! নবযুগে তোমাতে নবশক্তি সঞ্চারিত হউক—প্রকাশিত হউক?—ধৈর্য ধর, পবিত্রভাবে নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহারই অনন্যশরণ হইয়া থাক—তোমাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরুর এখনও অনেক লীলা প্রকটিত হইবে। দেখিতেছ না কি—অন্তর্জগতে, ধর্মজগতে তোমার সন্তান এখনও রাজা?"—স্বামী সারদানন্দের 'ভারতে শক্তিপূজা'র অংশবিশেষ।

"শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক সাক্ষাৎ শিষ্যই তাঁহার স্থূল দেহাবশেষের পর তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। যদি তাঁকে দর্শন করবার জন্য তোমার প্রকৃত ব্যাকুলতা থাকে, তিনি নিশ্চিতই ঐ সাধ পূর্ণ করিবেন। ঈশ্বরের আকার সমূহ কেবল শব্দগত রূপক নহে। ঐগুলি সত্য।……পুরী যাইতেছি (মাদ্রাজ হইতে)—আমাদের সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আনিতে। তাঁহার ন্যায় মহান ব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করেন তাহাই পবিত্র হইয়া যায় এবং পবিত্রতার শক্তি লাভ করে। তিনি বক্তৃতা দিতে আসিতেছেন না, যাঁহারা প্রয়োজন বোধ এবং যাজ্ঞা করেন, তাঁদের তিনি অধ্যাত্মধর্ম বিলাইতে আসিতেছেন। সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতায় খুব বেশী কাজ হয় না……এই সেই মানুষ যিনি সন্তপ্ত হৃদয়ে আশীর্বাদ-ধারা প্রবাহিত করিতে পারেন, যিনি ধর্ম দিতে পারেন এবং মানুষকে ঈশ্বরের নিকট হাত ধরিয়া উপস্থিত করিতে পারেন।"—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্রাংশ (অনুবাদ)

"ভোগ যতই বাড়াবে, ততই বাড়বে। আর যতই কমাবে ততই কমবে। ভোগ যত করবে, ততই অশান্তি বাড়বে। ভোগ-প্রবৃত্তি কখনই শান্তি দিতে পারে না। সুখ দিতে পারে না। ভোগ হতে যত মন নিবৃত্ত হবে, ততই সুখ পাবে। এ ছাড়া শান্তির উপায় নাই।"—ভোগসর্বস্ব বর্তমান যুগের মানবের প্রতি স্বামী অদ্ভুতানন্দের সাবধানবাণী।

অখণ্ডানন্দ—মনে রেখো আমাদের গুরু ছিলেন ন্যাংটো। পরমগুরুও তাই। তাঁর পাঞ্জাব আখড়ায় ৫ শো লাঙ্গা সাধু। এগুলো ভাবলে বাবুয়ানা আসবে না।